দুর্যোগ ও পুঁজির উত্থানঃ পাথরপ্রাতিমায় নতুন কৃষি ব্যবস্থা

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the Degree of Doctorate of Philosophy in Arts at Jadavpur University, Kolkata

By

Pintu Das

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta (CSSSC)

Jadavpur University

Kolkata – 700032

2025

Certified that the Thesis entitled

দুর্যোগ ও পুঁজির উত্থানঃ পাথরপ্রতিমায় নতুন কৃষি ব্যাবস্থা Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of **Manabi Majumdar**, Formar Professor of Political Science, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta (CSSSC) West Bengal, India and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor: Manabi Majumdar

Dated: 30.06.2025

Professor (Former)
CENTRE FOR STUDIES IN
SOCIAL SCIENCES, CALCUTTA

Candidate: Pintu Das

Dated: 30/06/25

কৃতজ্ঞতা

গবেষণার এই দীর্ঘ পথ চলায় আমি একা ছিলাম না। নানা সময়ে নানা মানুষের সহানুভূতি, সাহায্য ও অনুপ্রেরণা আমাকে এই যাত্রায় এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যদিও এই ছোট পরিসরে সবার নাম করা সম্ভব নয়, তবে যাঁরা আমার পাশে দাঁড়িয়ে গবেষণার পথকে আলোকিত করেছেন, তাঁদের কয়েকজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি।

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা মানবী মজুমদার এবং সহকারী তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা প্রিয়া সঙ্গমেশ্বরণ। মানবী ম্যাডামের সহানুভূতিশীল ও নিরন্তর পরামর্শে আমি বারবার পথের সন্ধান পেয়েছি। তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও সহযোগিতা আমার গবেষণার কাজে সাহস ও ভরসা জুগিয়েছে। প্রিয়া ম্যাম আমাকে গবেষণার এক অমূল্য শিক্ষা দিয়েছেন— তিনি প্রায়শই বলতেন 'কতগুলি উত্তর খোঁজার চেয়ে একটি ভালো প্রশ্ন তোলা অনেক বেশি জরুরি'। তাছাড়া ড. ঋতজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্য আমাকে ঋণী করেছে। তাঁদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহায়তা ছাড়া এই সন্দর্ভ সম্ভব হত না।

এই সন্দর্ভ তো দূরের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোনোও অসম্ভব হতো যদি আমার পরিবার পাশে না থাকত। কিন্তু পরিবার ছিল আমার সবচেয়ে বড় ভরসা। প্রথমে আমার মা, বাবা, দাদা, বৌদি, দিদি, স্ত্রী রুপশ্রী, শাশুড়ি মা এবং আত্মীয়-পরিজনের ভালোবাসা, সাহচর্য প্রতিটি পদক্ষেপে নিরন্তর উৎসাহ আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আমার যৌথ পরিবারের আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা দরকার তারা হলেন জ্যাঠামশাই, উদয় এবং জ্যাঠতুতো ভাই মহেশ দাস- শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ, বিশ্বাস আর পাশে থাকার মানসিকতা আমাকে বারবার নতুন করে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর বন্ধুত্ব ও অনুপ্রেরণা আমার পথ চলাকে আরও সহজ করেছে। এই পরিবারের ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না, শুধু চেষ্টা করে যেতে পারি যেন তাঁদের বিশ্বাস ও ভালোবাসার মর্যাদা রাখতে পারি।

আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্রে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন মইদুল স্যার, তৃণা দি, প্রাচী ম্যাম—তাদের

প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণী। আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কবিতা দি, নন্দিতা ম্যাম, গ্রন্থাগারের সঞ্চিতা দি, তাপস দা, মানা দি- যাঁদের আন্তরিকতা ও সাহায্য আমার মানসিক শক্তিকে দৃঢ় করেছে—তাঁদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা রইল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর গৌতম কুমার বসু, পার্থ প্রতিম বসু ও শিবাশিস চ্যাটার্জি, অনিন্দ্যজ্যোতি মজুমদার- তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা আমাকে অনেক পথ দেখিয়েছে। আমার কর্মক্ষেত্রে প্রিন্সিপ্যাল স্যার ড. নুরুল ইসলাম ও সহকর্মী মনোজিত স্যার, কৃতিমান স্যার, শুদ্ধসত্ত্ব দা, কোয়েল দি, কিরণ, সনাতন, আশিক তাদের সুপরামর্শ আমার গবেষণা কর্মে উন্নতির ছাপ বারেবারে দেখতে পেয়েছি। তাঁরা সবসময় ছোটো ভাইয়ের মতো আমাকে গাইড করেছেন তাই তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অবকাশ নেই।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই সেইসব বন্ধুমণ্ডলীর কাছে যারা বিগত বছরে আমকে নানান ভাবে সহযোগিতা করেছে, যাঁদের সান্নিধ্য আমার গবেষণাকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে। চিরঞ্জিত বিশ্বাস, বিশ্বরূপ, কৌশিক, দেবাশিস দা, রিজাউল, সামসুর(ভাইজান), অরিন্দম, চৈতন্য, মিঠুন, সম্রাট, তাপস, জিসান দা, বিবস্বন, অয়ন, বিশ্বজিৎ প্রসাদ, সুজয়- তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতেই আমার ভাবনার জগৎ প্রসারিত হয়েছে। বিশেষভাবে বলতেই হয় কৌশিক, ইন্তাজুল আলি বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়েছে, সাহস দিয়েছে তাছাড়া অনেক সময় প্রযুক্তিগত বিষয়েও সহযোগিতা পেয়েছি। যাদের সাথে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করেছি ও নানা ভাবে আমার সন্দর্ভটি আরও যৌক্তিক হয়েছে। তাদের অক্লান্ত চেষ্টা কিছুটা হলেও গুরুত্ব বাড়িয়েছে। এ কথা স্বীকার না করলে নয়।

ক্ষেত্র-সমীক্ষা চলাকালীন বহু চেনা-অচেনা মানুষের সহযোগিতা আমি পেয়েছি—আশ্রয়, আহার ও ভালোবাসা—যা ছাড়া এই সমীক্ষা সম্পূর্ণ করা যেত না। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই কয়েক জনের নাম মিতু, কৃষ্ণ দা, সুজিত দা, দেব শঙ্কর, সম্রাট, পার্থ, জগতপতি, সুকুমার, মনোজিত যাদের সহায়তায় ক্ষেত্র-সমীক্ষা অনেক সহজ হয়েছে।

মুখবন্ধ

এই গবেষণাপত্রের উৎস আমার স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে অভিজ্ঞতা, দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার ফল। পাথরপ্রতিমা ব্লক দুর্গম ও প্রতিকূলতা যুক্ত উপকূলবর্তী অঞ্চল। এই এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের জীবনযাপন, কৃষিকাজ এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম বরাবরই আমাকে চিন্তান্বিত করেছে। একদিকে যেমন ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ—ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততার বিস্তার—এই অঞ্চলের কৃষিকে বিপন্ন করে তুলেছে, অন্যদিকে সেই দুর্যোগের বিন্যাসের মধে দিয়েই এক নতুন অর্থনৈতিক শক্তি, নতুন ধরনের পুঁজির প্রবেশ লক্ষ করা গেছে যা কৃষি ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন এনেছে।

এই গবেষণায় আমি দেখার চেষ্টা করেছি—কীভাবে দুর্যোগ শুধু ধ্বংস নয়, বরং পুঁজির প্রসারের পথকে প্রশস্ত করে। কৃষকেরা নিজেদের ভূমি, শ্রম ও জীবিকা হারিয়ে অভিবাসিত হতে বাধ্য হয়েছে, ফলে পুরনো 'উৎপাদন সম্পর্ক' ভেঙে গিয়ে এক নতুন বাস্তবতার জন্ম হয়েছে। এই বাস্তবতা শুধু কৃষি উৎপাদনের পদ্ধতিই নয়, বদলে দিয়েছে কৃষকের আত্মপরিচয়, সামাজিক অবস্থান এবং ক্ষমতার সমীকরণ। গবেষণার পরতে পরতে আমি যেসব মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি তাঁদের কণ্ঠে শোনা গিয়েছে আশা ও ক্ষোভের মিশ্র ধ্বনি। এই গবেষণা সেই কণ্ঠগুলিরই প্রতিধ্বনি। আমি কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে, যাঁরা মুল্যবান সময় দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। এই পত্রে ব্যবহৃত তথ্য, তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে নির্মিত। তবু আমি জানি, এই প্রয়াসে সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা থেকেই গেছে।

গবেষণা এলাকা নিচের ম্যাপে দেখানো হল

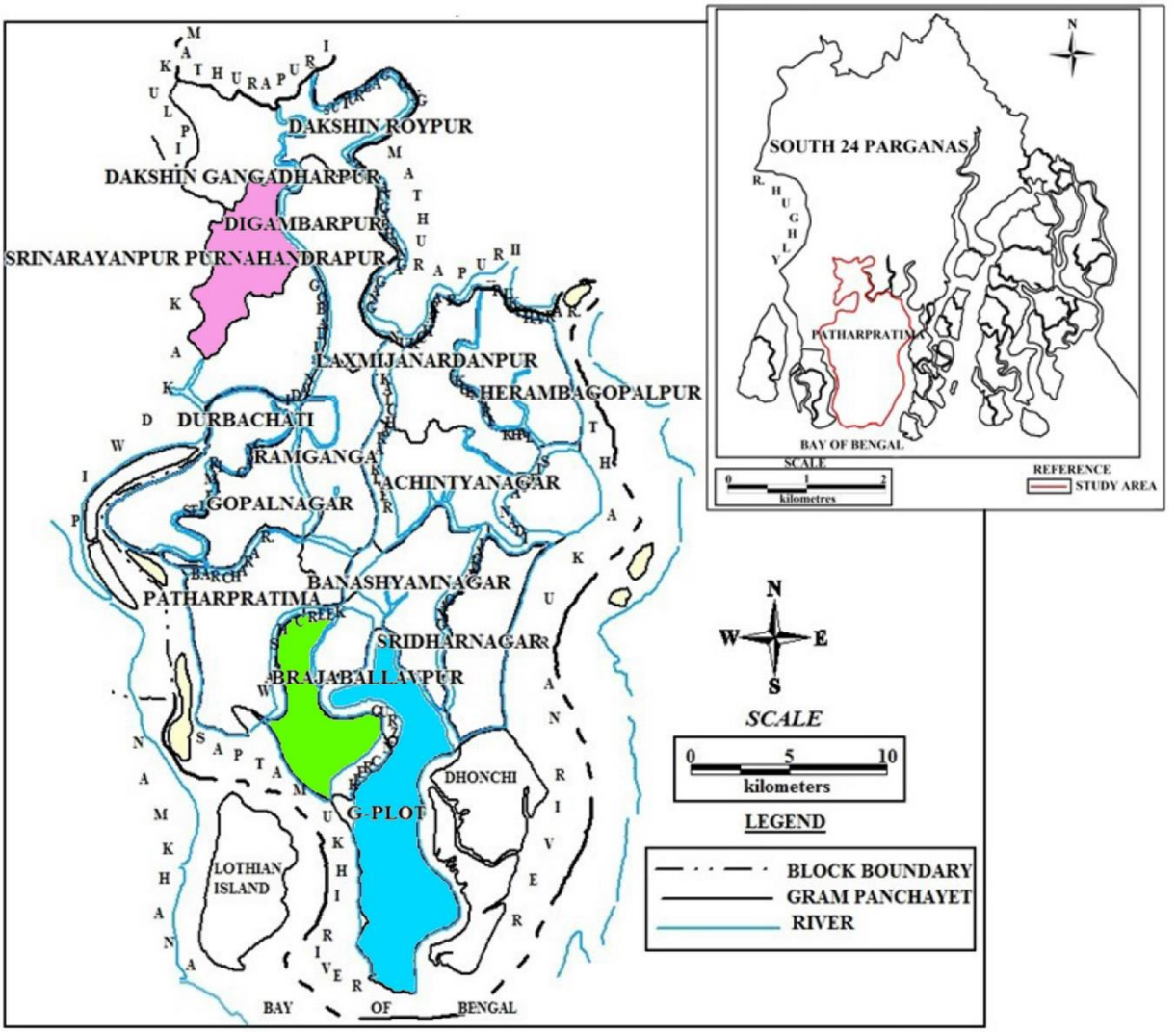

Source: Compiled from Administrative Atlas (WB), DPM, NATMO and Census, 1961

এখানে মূল গবেষণায় তিনটে গ্রাম পঞ্চায়েত ও চারটে মৌজাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে

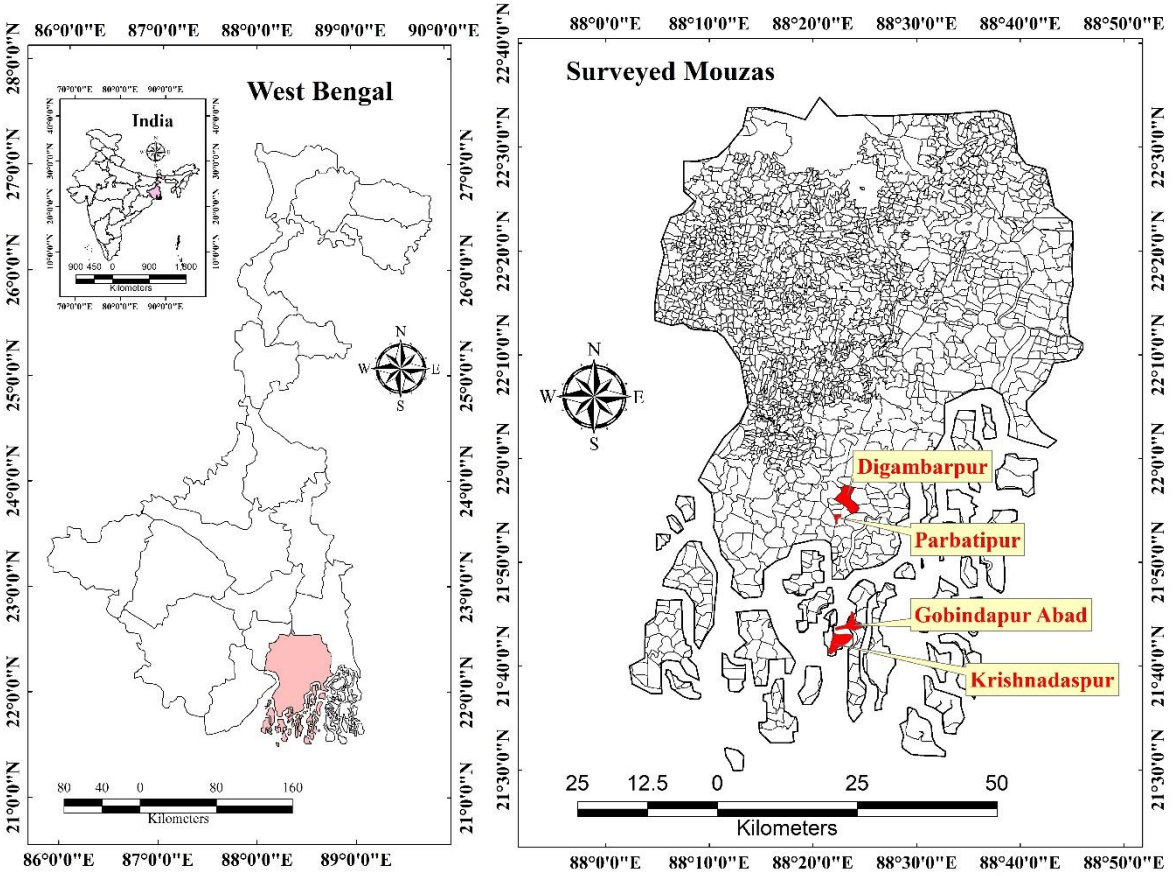

Source: Survey of India and Diva GIS

সংক্ষেপণ

U.N.D.R.R-	United Nation for Disaster Risk Reduction
S.I.D.S-	Small Island Developing States
L.D.C.S-	Least Developed Countries
I.F.R.C-	International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
G.D.P-	Gross Domestic Product
MGNREGA-	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
C.R.G-	Calcutta Research Group
N.G.O-	Non-Governmental Organization
N.S.S-	National Sample Survey
I.T.I-	Industrial Training Institute
C.P.I-(M)	Communist Party of India (Marxist)
T.M.C-	Trinamool Congress
F.G.P.C-	'The Food Grains Policy Committee'
I.A.D-	PIntensive Agriculture District Program
C.A.C.P-	The Commission for Agriculture Cost and Prices
F.C.I -	The Food Corporation of India
M.L.A. –	Member of Legislative Assembly
L.A.D -	Local Area Development
M.P.L.D -	Member of Parliament Local Area Development
B.D.O -	Block Development Officer
D.L.R.O -	District Land and Land Reforms Officer
B.L.R.O -	Block Land and Land Reforms officer
D.R.O -	District Registrar Office

B.S.R.O -	Block Sub-Registrar Office
B.S.R.O -	District Survey Office
S.C -	Scheduled Caste
S.T-	Scheduled Tribes
O.B.C -	Other Backward Classes
EWS -	Economically Weaker Section
U.P.A -	United Progressive Alliance
J.C.B -	Joseph Cyril Bamford Excavators
IDMC-	Internal Displacement Monitoring Centre
A.K.I -	Indo-US Agricultural Knowledge Initiative

সারণিসূচী

পৃষ্ঠা নং

সারণি ১ : আইলা প্রকল্পে দৈনিক মেশিন ও কায়িক শ্রমিকের মোট খরচ সরকারের সাথে ঠিকাদারের চুক্তিনুযায়ী। ১৩০

সারণি ২ : ঠিকাদারের সাথে ব্যক্তিগত মালিকের চুক্তির ক্ষেত্রে খরচ ও লাভ (টাকায়) ১৩২

সারণি ৩ : অকৃষি জীবিকার সাথে যুক্ত থাকা প্রতি পরিবারের গড় শ্রমিকের সংখ্যা ১৪১

সারণি ৪ : আইলার আগে ও পরে ব্যবহৃত কৃষিজ উপকরণ ১৪৮

সারণি ৫ : শস্য উৎপাদনের হার ও খরচ ১৪৯

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

কৃতজ্ঞতা.....iii

মুখবন্ধ.....v

গবেষণা এলাকা.....vi

সংক্ষেপণ.....viii

সারণিসূচী.....x

প্রেক্ষাপটঃ-.....১-১৬

- দুর্যোগের ধারণাঃ-.....২
- পরিবর্তিত অবকাঠামোঃ-.....৮
- উন্নয়নের ধারণাঃ-.....৯

সূচনাঃ-.....১৭-৫০

- গবেষণার গুরুত্বঃ-.....২২
- সাহিত্য পর্যালোচনাঃ-.....২৭
- গবেষণার ফাঁকঃ-.....৪১
- গবেষণা প্রশ্নঃ-.....৪৩
- গবেষণার উদ্দেশ্যঃ-.....৪৪
- গবেষণা পদ্ধতিঃ-.....৪৪
- অধ্যায় বিন্যাসঃ-.....৪৯

প্রথম অধ্যায় : কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি.....৫১-৮২

- কৃষি পরিচিতিঃ-.....৫১
- স্থানীয় অঞ্চলে কৃষি অর্থনীতিঃ-.....৫৩
- আইলা পূর্ববর্তী কৃষি অর্থনীতিঃ-.....৫৪
- সংঘর্ষ ও নির্মাণ:-.....৫৯
- গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামোঃ-.....৬৫

- স্থানীয় ক্ষমতায়ন ও দলীয় রাজনীতি ৭০
- পরিবর্তনের তাগিদ ও কৃষি উৎপাদনঃ- ৭৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : আইলা উত্তর ভূমি রাজনীতি ৮৩-১১৯

- স্থানীয় ভূমির সত্ত্বাঃ- ৮৩
- ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাসঃ-.....৮৫
- পরিবর্তিত ভূমি রাজনীতিঃ- ১০৭
- আমলা তান্ত্রিক পরিবর্তনঃ-.....১১০
- জমির বাজারমূল্যঃ-.....১১২
- সম্পদের ধারণাগত পরিবর্তনঃ-.....১১৪

তৃতীয় অধ্যায় : দুর্যোগ ও পুঁজির উত্থান ১২০-১৬০

- সাবেকী ও আধুনিক পুঁজির সম্পর্কঃ- ১২০
- নদী বাঁধ মেরামত ও প্রযুক্তির প্রবেশঃ-..... ১২৬
- উন্নয়নের চুক্তি ও চুক্তির অস্বচ্ছতা ১৩১
- দুর্যোগ ও শ্রম বাজারঃ- ১৩৯
- নূতন কৃষি ১৪২
- সবুজ বিপ্লব ও সুন্দরবনের কৃষি রূপান্তরঃ-.....১৪৫
- বীজের কালো বাজারিঃ- ১৫০
- রূপান্তরের তাগিদঃ- ১৫৩

উপসংহার.....১৬১-১৬৭

- ব্লকের কৃষি উৎপাদনে যেসব পরিবর্তন গুলো হলঃ- ১৬৪

তথ্যপঞ্জী..... ১৬৮-১৮৩

পরিশিষ্ট.....১৮৪-১৮৭

প্রেক্ষাপটঃ-

[এই গবেষণার মাধ্যমে আমি বুঝতে চাই কিভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পরবর্তী পাথরপ্রতিমায়, সেই দুর্যোগের ফলাফলের সাথে মোকাবিলা করার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে কিছু নতুন ধরনের কর্মপ্রক্রিয়া চালু হয় এবং কিভাবে এই প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে সূচীত হয় কিছু পরিবর্তন। কিভাবে পরিবর্তিত হয় মানুষের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ও সমষ্টিগত অথবা উন্নয়নের সাম্প্রতিক ধারণায়]

"আইলার পরে উন্নয়ন তো হয়েছে, নদী বাঁধ আগের থেকে এখন অনেক ভালো হয়েছে, আইলার চাল পাচ্ছি, সরকার অনেক কিছু দিচ্ছে আমাদের, এগুলো আইলা না হলে আমরা পেতাম না, সব থেকে বড় কথা হল নদীর বাঁধ যদি আগের মতো থাকত, তাহলে আম্ফানের জলোচ্ছাসে সেইদিন সুন্দরবনের লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে যেত, মড়া গুঁড়োনোর লোক থাকতো না, মাছগুলোকে তাও আমরা সবাইমিলে নদীর চরে পুঁতে দিয়েছিলাম, আমাদের বেলায় তাও হতো না, শকুন, চিলে খেত"

আইলা (২০০৯, ২৫ মে) থেকে ইয়াস (২০২১, ২৬ নভেম্বর) পর্যন্ত দুর্যোগ পরবর্তী সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পে নদী বাঁধের মেরামত ও উন্নয়ন সম্পর্কে স্থানীয় সাধারণ মানুষ আরতি বালা দাসের এই সাক্ষাতকাটি নেওয়া হয়েছে ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিক)। আইলা পরবর্তী উন্নয়ন ও সরকার সম্পর্কে স্থানীয় আরতি বালার সহজ সরল এই বক্তব্যের সঙ্গেই হয়ত সুন্দরবনের বেশিরভাগ মানুষ সহমত পোষণ করেন। কিন্তু আরতি বালা উন্নয়ন সম্পর্কে যা বলছেন তার দ্বারা কি স্থানীয় মানুষের স্বক্ষমতার প্রশ্নটি আসেনা? এই প্রেক্ষিতেই বর্তমান সন্দর্ভটিকে উপস্থাপনা করব, আইলা (দুর্যোগ) পরবর্তী সুন্দরবনে উন্নয়নের নতুন বয়ান।

বর্তমান সন্দর্ভের মাধ্যমে আমরা দেখার চেষ্টা করব 'দুর্যোগ' কিভাবে 'পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উত্থানের' ক্ষেত্র তৈরি করে। অর্থাৎ ভিন্নভাবে বললে বিষয়টি দাঁড়ায় এইরূপ, পুঁজিবাদী উত্থানের ক্ষেত্রে দুর্যোগের ভূমিকা কি? আর এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হল সন্দর্ভের মৌলিক বিষয়। তাই এখানে আমরা দুর্যোগের সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বটিকে সীমিতাকারে আলোচনা করব।

এর আগে অধ্যায়টি কিভাবে পড়ব তার একটি বর্ণনা দিলে অধ্যায়নে সুবিধা হবে বলে মনে করি। অধ্যায়টিতে প্রথমে পেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু আমার গবেষণা পত্রের অনুসন্ধান নির্দিষ্ট 'ঘটনা' কেন্দ্রিক, তাই এই অংশটি প্রয়োজনের তুলনায় হয়ত কিঞ্চিৎ বৃহদাকার হয়েছে,। তার পরে আলোচনা করেছি 'সূচনা'র অংশটির যেখানে স্থানীয় অর্থরাজনীতিতে দুর্যোগের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অধ্যায়ের পরবর্তী অংশগুলো গবেষণার নির্দিষ্ট যুক্তি ও বিন্যাস অনুযায়ী আলোচনা হয়েছে।

দুর্যোগের ধারণাঃ-

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দুর্যোগ কেবল প্রাকৃতিক একটি ঘটনা নয়। রাষ্ট্রের জাতীয় অর্থনীতি, আইন প্রণয়ন, (অভ্যন্তরীণ) দলীয় রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে দুর্যোগ আজ এমনই একটি হাতিয়ার, যার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রভাব বিস্তার, আর্থিক বৈষম্য, বিশ্বায়ন, বিশ্বউষ্ণায়ন এই প্রশ্নগুলোর নিবিড় ভাবে যোগ রয়েছে। এবং সর্বোপরি দুর্যোগকে ব্যবহার করে উন্নত বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এই প্রেক্ষিতে আমরা কিছু পণ্ডিতের বক্তব্যগুলোকে বোঝার চেষ্টা করব।

দুর্যোগের একটি সার্বিক ধারণা প্রদান করা হয়েছে আন্তর্জাতিক জাতি সংঘের মাধ্যমে, United Nation for Disaster Risk Reduction (UNDRR) ২০১৭ এর মতে দুর্যোগের সংজ্ঞা এইরূপ , 'The effect of the disaster can be immediate and localized, but is often widespread and could last for a long period of time. The effect may test or exceed the capacity of a community or society to cope using its own resources, and therefore may require assistance from external sources, which could include neighbouring jurisdictions, or those at the national or international levels'. GAR 2025 (Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction) এই তথ্যটি দুর্যোগের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির দিকটি তুলে ধরেছে, তথ্যটিতে বলা হয়েছে, "Disasters are already exerting a substantial macroeconomic toll,

from weather-related events such as floods, storms, drought and extreme heat to major hazards like earthquakes — and this toll is expected to rise with the growing frequency and severity of these events as the climate changes. Without urgent action to close the gap between risk and investment, the financial and economic consequences will become increasingly difficult to manage. When disasters occur repeatedly, economic growth often slows and debt increases. Developing countries, particularly small island developing states (SIDS) and least developed countries (LDCS), face the dual challenge of higher exposure to hazard risk and limited access to resources for risk reduction. In such situations, it becomes increasingly expensive to insure or otherwise transfer risk, and more money is spent on humanitarian responses as disasters are not prevented. But this is not inevitable'.

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) এর মতে দুর্যোগ হল 'Disasters are serious disruptions to the functioning of a community that exceed its capacity to cope using its own resources. Disasters can be caused by natural, man-made and technological hazards, as well as various factors that influence the exposure and vulnerability of a community'. বিশ্বউষ্ণায়নের ফলে ক্রমশ গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রারিক্ত বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর তাপ মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে পৃথিবীর কোথাও অতি বৃষ্টি-ঝড়-বন্যা বা তার সাথে খরাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে প্রকৃতিতে বাস্তুতন্ত্র গুলো ধ্বংস হচ্ছে। IPCC এর Climate Change 2023 Synthesis Report, Section 2, এর তথ্যানুযায়ী, 'Human activities, principally through emissions of greenhouse gases, have unequivocally caused global warming, with global surface temperature reaching 1.1°C above 1850–1900 in 2011–2020. Global greenhouse gas

emissions have continued to increase over 2010–2019, with unequal historical and ongoing contributions arising from unsustainable energy use, land use and land-use change, lifestyles and patterns of consumption and production across regions, between and within countries, and between individuals. Human-caused climate change is already affecting many weather and climate extremes in every region across the globe. This has led to widespread adverse impacts on food and water security, human health and on economies and society and related losses and damages63 to nature and people . Vulnerable communities who have historically contributed the least to current climate change are disproportionately affected. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. সম্প্রতি Susan chakco র বক্তব্য, (২০২৪, ৮ মে) 'More people in countries with low human development index suffer from climate related disaster, *Central America, the Caribbean, Eastern Africa, southern & eastern Asia have highest levels of impacts from climate-related disasters'*। প্রবন্ধে আরও বলেন যে 'Human development index of a country has an impact on how its population is impacted by climate-related disasters, and a new study showed the relationship between the two.' একই ভাবে উচ্চ স্তরের মানব উন্নয়ন দেশ গুলোর সম্পর্কে বলছেন, 'Likewise, the increasing number of the population impacted by climate-related disasters in countries with very high human development was statistically and significantly lower than in countries with high, medium and low human development. The cumulative percentages of the population impacted by climate-related disasters in European countries were notably lower compared to countries in Australia, Africa, North America, Asia and South America, the study found.

Countries in Africa showed an increase in people impacted by climate-related disasters through time, despite a decrease in the number of climate-related disaster events, according to the findings'.[১]

আমরা এই বিষয়ে আরও জানার জন্য কিছু তাত্ত্বিকের ভাষ্য জেনে নেব।

JC Gaillard (২০২২) বলেন দুর্যোগের কোনও সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই। এটি নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যের ওপরে । তিনি দুর্যোগকে সংজ্ঞায়িত করার থেকেও এই প্রশ্নের উৎপত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। লেখক মনে করেন দুর্যোগের ধারণা পশ্চিমা জ্ঞানের কাঠামো থেকে উৎপত্তি হয়েছে। দুর্যোগ নিয়ে অধ্যয়ন করার অর্থ দাঁড়ায় পশ্চিমা জ্ঞান ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা। বস্তুত পক্ষে লেখক গ্রামসি ও ফুকোর ক্ষমতাতত্ত্বে আলোকপাত করে দেখিয়েছেন যে দুর্যোগের ধারণা পশ্চিমা আলোকপ্রাপ্তির ধারণার সাথে প্রবাহিত হয়েছে এবং যাকে প্রমাণিত ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।[২]

লেখক Birsha Ohadedar (২০২৪) ঔপনিবেশিক সরকারের সময়ে পূর্ব ভারতে বিভিন্ন আইন বাস্তবায়িত হবার ফলে কিভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটত তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন বন্যা কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়; বরং, এগুলো রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া দ্বারা গঠিত সামাজিক প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে আবির্ভুত হয়। আইন এই প্রক্রিয়াগুলিকে তৈরি ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি বলেন কিছু আইন, নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সাহায্যে বাস্তবায়িত ঔপনিবেশিকতা এবং পুঁজিবাদ পূর্ব ভারতে বন্যার তীব্রতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।[৩] Virginia García-Acosta (২০২০) তাঁর লেখায়

---

[১] এই তথ্যটি Down To Earth এর অনলাইন মেগাজিন থেকে সংগ্রহ করেছি। https://www.downtoearth.org.in/climate-change/more-people-in-countries-with-low-human-development-index-suffer-from-climate-related-disasters-96040।

[২] Gaillard, J.c. (2022). 'The Invention of Disaster Power and Knowledge in Discourses on Hazard and Vulnerability' New York: Routledge.

[৩] Ohadedar, Birsa. (2024). 'Law, Colonial-Capitalist Floods, and the Production of Injustices in Eastern India: Insights for Climate Adaptation'. Cambridge University Press. PP. 1-3. https://www.cambridge.org/core/journals/transnational-environmental-law/article/law-

ল্যাটিন অ্যামেরিকার দুর্যোগের আলোচনায় নৃতত্ত্বের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি ল্যাটিন অ্যামেরিকার বিভিন্ন দেশের দুর্যোগের ফলাফল আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন দুর্যোগ এমন একটি ঘটনা যার মাধ্যমে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ দুর্যোগ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া।[৪]

এই প্রেক্ষিতে জানা প্রয়োজন স্থানীয় মানুষের দুর্যোগ সম্পর্কে ধারণা কি? এই ক্ষেত্রে স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ তরণী দাসের কথোপকথন তুলে ধরব, সাক্ষাতকারটি নেওয়া হয়েছিল ২০২০ সালের ২০ মার্চ। 'দুর্যোগ আমাদের জীবনের এক অংশ, ১৯৭২-৭৩ সালে নোয়াখালীর একদিনের বন্যায় আমার পরিবারের ৯ জনকে হারিয়েছি। তারপর ১৯৯২ সালে ভারতে আসি, এখানে এসে দেখি নিজেদের আত্মীয়স্বজন সেই নদীর তীরেই বসবাস করছে। ১০-১২ বছর ভালো ছিলাম, আইলা এসে ঘর ভাঙল, তার পরে পর পর দুবার বুলবুল ও ফনি ঝড়ে ধান গেল, আম্ফানের জলোচ্ছ্বাসে পুকুরের মাছ মরল, আর ইয়াস ঝড়ে আবার ঘর ভাঙল । সারাজীবন নদীর সাথে যুদ্ধ করে গেলাম, কি আর করব, নদী তো প্রকৃতিরই দান, প্রকৃতির শক্তির কাছে মানুষ আর কি? সরকার কিছু না করলে মানুষ আর কি করবে? সেখানেও (বাংলাদেশ) কিছু করেনি এখানেও (ভারত) দেখি এক' ।

তরণী দাস এখানে তাঁর জীবন ও জীবিকায় দুর্যোগের প্রভাব বর্ণনা করেছেন। সারাজীবন দুর্যোগের সাথে লড়াই করে এটাকে জীবনের নিয়তি বলেই মনে করেন। যেখানে তাঁর কিছুই করার নেই, প্রকৃতি ও সরকারের ভরসায়ই দিন কাটে। অর্থাৎ সরকার চাইলে দুর্যোগে দুর্ভোগ কমে, কিংবা সরকার চাইলে বাঁধকে শক্তপোক্ত করতে পারে। এখানে তরণী দাসের দুর্যোগের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার বিবরণের সঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে দুর্যোগ ও সরকার সম্পর্কে দুটি রাষ্ট্রের সম্বন্ধে তাঁর একই ধারণার কথা । এই ধারণা হয়ত তথাকথিত বিশেষজ্ঞ জ্ঞান

---

colonialcapitalist-floods-and-the-production-of-injustices-in-eastern-india-insights-for-climate-adaptation/F3D8A13CBF184ABBBD01E449283ACA38

[৪] Acosta, Virginia García. (2019). 'The Anthropology of Disasters in Latin America: State of the Art'. Routledge.

মান্যতা দেয়না। কিন্তু তরণী দাস ঠিকই জানেন যে সরকারের উদাসীনতা ও গাফিলতির জন্যই দুর্যোগে তাঁদের জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে – তা সে যে রাষ্ট্রই হোক না কেন।

ছোট থেকেই দুর্যোগকে 'প্রকৃতির লীলা খেলা' বলে জানি। অন্তত বাড়ি ও গ্রামের বড়োদের কাছ থেকে যা শুনতাম। নদীবাঁধেই যেহেতু বাড়ির এক অংশের সীমানা ছিল, তাই নদীর জল বাড়লে বিশেষ করে বর্ষার পরে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে শাঁড়া শাড়ীর কোটালে প্রায় আশংকায় থাকতাম আর 'ভগবানের নাম স্মরণ' করতাম (বাড়ির বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু এবং মহিলারা নাম সংকীর্তন করতেন)।

জোয়ারে নদীর জল বেড়ে গিয়ে বাঁধ ভেঙে গেলে লবণ জলে কৃষি জমি থেকে বসত বাড়িতে ক্ষয়ক্ষতির আশংকা থাকে। কারণ নদীবাঁধের নিরাপত্তার ওপরে সুন্দরবন বাসীর জীবনের নিরাপত্তা নির্ভর করে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যা দেখা দিলে স্থানীয় মানুষের মনে যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, যে অস্থিরতা তৈরি হয়, যে দারিদ্র দেখা দেয় এখানের জন্য এটাই হল 'দুর্যোগ'। ২০০৯ সালে ২৫ মে আইলা দুর্যোগ হল, ২৬ মে আমার উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হল। ভালো রেজাল্ট করলাম। বিগত বছরে পরীক্ষায় বসলাম না পরের বছরে ভালো রেজাল্ট করে আইন নিয়ে পড়ে উকিল হব বলে। পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে ভালো ফলাফল করলাম। কিন্তু আইন পড়া আর হল না। দুর্যোগে জমি, পুকুর, কারো কারো ঘরবাড়িও সম্পূর্ণ ভেঙে গেল। কারো কারো আংশিক। অগত্যা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো শুরু করি। ধীরে ধীরে বুঝতে শিখি দুর্যোগ কেবল প্রাকৃতিক নয়, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এর নির্দিষ্ট ফর্ম আছে। ধীরে ধীরে বুঝতে শিখি সুন্দরবন বাসীর দারিদ্র ও অভিবাসনের অন্যতম কারণই হল দুর্যোগ। তাই গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি 'দুর্যোগ ও পুঁজির উত্থান' বিষয়ক শিরোনামটিকে। বোঝার চেষ্টা করি দুর্যোগের সাথে উন্নয়ন, আইন কানুন, নীতি, রাজনীতি অর্থনীতি ও সমাজ 'চালিকা শক্তি - এই উপাদান গুলো কিভাবে কাজ করে। সুতরাং দুর্যোগের থেকেও এখানে বেশি প্রয়োজনীয় হল বিশ্লেষণ করা সমাজ ও অর্থনীতিতে দুর্যোগের ভূমিকা কি?

পরিবর্তিত অবকাঠামোঃ-

তাই দুর্যোগ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ বা গবেষণা আমাদের লক্ষ্য নয়, কেবল দুর্যোগকে একটি ‘ঘটনা’ হিসেবে ধরে কিভাবে নিম্ন সুন্দরবনের (বিশেষত উপকূলীয় মৌজাগুলিতে) অঞ্চলগুলোতে স্থানীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তে একটি আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ‘অবকাঠামো’ স্থাপন করে তা দেখা।

কিন্তু পরিবর্তিত নতুন এই অবকাঠামোর প্রভাব সব থেকে বেশি পড়ে স্থানীয় কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থায়, যাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব। এক, এর ফলে দীর্ঘ দিনের প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থার যেমন পরিবর্তন হতে থাকল, দুই, তেমনি প্রচলিত কৃষির শস্যের উৎপাদনের ধরণেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়। উক্ত দুটি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হল তা প্রথমত ক্ষতিগ্রস্থ নদী বাঁধ মেরামতের জন্য সরকারের জমি ‘অধিগ্রহণের’ প্রকল্পকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। কারণ জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তা হল সরকার ক্ষতিপূরণ কাকে দেবে? কিংবা জমির স্বত্বাধিকার কার? কারণ ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পরিবারের জমির মালিকানা বা স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত সঠিক তথ্য না থাকায় অধিগ্রহণের প্রকল্পটি ব্যাপক জটিলতার সম্মুখীন হয়। এই জটিলতার ফলে স্থানীয় মানুষের মনে যেমন আশঙ্কা বাড়ে তেমনি এর থেকে পরিত্রাণের জন্যও সরকারি ভূমি দপ্তরে স্থানীয় মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। সুতরাং এর ফলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে জমি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আইন কানুন, সরকারি আমলা, মোহরি (যারা জমির দলিল লেখে) ইত্যাদির সাথে পরিচিতি হওয়ার ফলে একদিকে যেমন নতুন নতুন বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সম্মুখীন হতে হয় তেমনি জমি যে একটি ‘সম্পদ’ তা সম্পর্কেও নতুন ভাবে ধারণা গড়ে ওঠে। এর ফলে স্থানীয় অঞ্চলে জমিজমার তুলনামূলক ভাবে গুরুত্ব বেড়ে যায়।

একই সাথে লবণাক্ত জমিতে পুরনো পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদন আর হবে না। সরকারি আমলা, বেসরকারি সংস্থা, ও স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমে পুঁজিবাদী এই যুক্তিগুলো প্রচার হতে থাকল। আইলার বছরে বন্যার জল জমিতে প্লাবিত হয়নি এমন কিছু স্থানীয় কৃষক পরিবারকে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস থেকে উচ্চফলনশীল বীজ, সার ও কীটনাশক প্রদান করা হয়। এই বীজ দিয়ে কিছু লবণ জলে প্লাবিত জমিতেও চাষ করার ফলে ধান গাছ

গুলো বেঁচে যেমন ছিল তেমনি কম হলেও উৎপাদন হল। যারা এই বছর চাষ করতে পারল না তাঁরা ভাবল এর পরের বছর তাঁরাও এই বীজ দিয়ে চাষ করবে। হলও তাই, পরের বছর চাষের মরশুমে দেখা যায় স্থানীয় বাজারে নানান প্রকার ধানের বীজ। যার সাথে কৃষকের কোন প্রকার পূর্ব পরিচয় নেই, বেশি উৎপাদনের আশায় চাষি বাজার থেকে এই ধরনের উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল বীজ কিনে চাষ করতে থাকল এবং ক্রমশ মোট উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেল।[৫] এইভাবে কয়েক বছরের মধ্যে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, বীজ, সার ও বিভিন্ন কীটনাশক কোম্পানির এজেন্ট ও খুদ্র ব্যবসায়িকরা মুনাফা অর্জন করতে থাকল। সুন্দরবনের চাষি এখন পুরদস্তুর আধুনিক কৃষকে পরিণত হল। অপরদিকে জমি অধিগ্রহণের কাজটি ও নানান বিতর্ক ও অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও নদী বাঁধের কাজ অনেকটা এগোন গেল। নদীর বাঁধ এখন অনেকটাই শক্তপোক্ত হয়েছে এবং ছোটখাটো যানবাহনও অনায়াসেই চলাফেরা করে। স্থানীয় মানুষ যাকে উন্নয়ন বলে মনে করে। সত্যিই কি উন্নয়ন বিষয়টি এতো সহজ ভাবে বোঝা যায়? তাই স্থানীয় মানুষের উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা ও উন্নয়নের প্রচলিত বিভিন্ন মডেল আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারবো ঠিক উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়।

উন্নয়নের ধারণাঃ-

বর্তমান সন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয় দুর্যোগ পরবর্তী পাথরপ্রতিমা ব্লকের উন্নয়ন ও সেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উত্থানের চালচিত্র বোঝা। এই চালচিত্র বুঝতে হলে আমাদের নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতিক কর্মক্রিয়া বুঝতে হবে। কারণ নয়া উদারবাদী মতাদর্শের দুই প্রবক্তা, মিল্টন ফ্রিডম্যান ও ফ্রেড্রিক হায়েক এদের দুজনের, মূল বক্তব্য হল, রাষ্ট্রীয়

[৫] আইলা পরবর্তী সুন্দরবনে উপকূলীয় মৌজাগুলোতে যে কৃষি উৎপাদন আইলার আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হল, এই তথ্য ও সত্যতা তেমন কোনও গবেষণা ধর্মী প্রবন্ধে ও বইয়ে পেলাম না। এর কারণ একটা সাধারণ যুক্তি হল, লবণ জলে প্লাবিত হলে যে কৃষি উৎপাদন ব্যাপক হারে মার খায় এই যুক্তির ভিত্তিতে বলা হল। কিন্তু আমরা এটা জোর দিয়ে বলতে চাই, যে আইলা পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের এইসব নিম্নবর্তি অঞ্চলে যে ব্যপক হারে কৃষি উৎপাদনকে পুঁজিবাদী মোড়কে পুরে দেওয়া হল, এই কারণেই উৎপাদন বৃদ্ধি হল, তা আমরা সহজে ধরতে পারি না। আমরা বর্তমান সন্দর্ভে এই যুক্তিগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করব।

নিয়ন্ত্রণহীন বাজার, যেমন বিনিয়োগ, বাণিজ্য, শুল্ক ক্ষেত্রে ছাড় ও ভর্তুকি কমানো, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বেসরকারিকরণ, সরকারি ব্যায় হ্রাস করা এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মুক্ত বাজারের প্রতি অনুকুল পরিবেশ তৈরি করাই হল রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য । সুদীপ চৌধুরী ও নিলয় মুখোপাধ্যায় (১৯৭৭ ও ২০১০) 'অন্যঅর্থ' পত্রিকায় 'ফ্রিডম্যান, নোবেলপ্রাইজ ও চিলি' নামক প্রবন্ধে মিল্টন ফ্রিডম্যান এর লেখা 'Capitalism And Freedom' বইয়ের সম্পর্কে আলোচনা করছেন এইভাবে, 'Capitalism And Freedom, গ্রন্থে 'জোর গলায় সওয়াল করেছেন ধনতন্ত্রের অবাধ বিকাশের পক্ষে'। তাঁর মতামত অনেকটা এই ধরণেরঃ বাজারে যদি চাহিদা ও যোগানের খেলায় কোনও রকম বিগ্ন না ঘটানো হয় এবং শুধু গোটা দেশের অর্থনীতির ভিত্তিতে স্থিতিশীল পন্থা (Stabilisation policy) অবলম্বন করা হয় তাহলেই দেশের সম্পদের সর্বোত্তম এবং কাম্য নিয়োগ (allocation) সম্ভব' (ঐ, পৃ; ৩২১)। ঠিক এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে পারি যে Naomi Klein, এর লেখা The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (২০০৭) বইয়ে ফ্রিডম্যানের অর্থনৈতিক এই ধারণার সমালোচনা মূলক আলোচনাটিকে । ক্লেইনের মতে ফ্রিডম্যানের অর্থনৈতিক ফর্মুলা অ্যামেরিকার চিকাগো স্কুল উদ্ভূত, যার প্রভাবে সমসাময়িক বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো তাঁদের দেশের জাতীয় নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে অবাধ মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করে। অনিয়ন্ত্রিত বাজার, বেসরকারিকরণ ইত্যাদি র মাধ্যমে। লেখক বলেন ফ্রিডম্যানের অর্থনৈতিক ধারণার মূল কথা হল, একটি সাবেকি অর্থনৈতিক কাঠামোকে সংস্কারের জন্য একটি ধাক্কা/shock এর প্রয়োজন। লেখক এখানে ধাক্কা কে 'সংকটকালীন অবস্থান' বলে ধরেছেন । একজন ব্যাক্তির মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার সুযোগে, কিংবা সমাজ দেহের এমন কোনও সংকটের প্রেক্ষিতে ফ্রিডম্যানের অর্থনীতিনীতির সুত্র বলে, এই সংকট বা ধাক্কার সুযোগে উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করা, ও নতুন বাজার গড়ে তোলা সম্ভব। কিংবা বাজার দখল করা। ক্লেইন এই সংকট কালীন অবস্থানকে 'দুর্যোগ' বলেছেন। তা প্রাকৃতিক হোক কিংবা মানব সৃষ্ট । অর্থাৎ লেখকের মতে, বিভিন্ন (প্রাকৃতিক কিংবা মানব সৃষ্টি) দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে অনিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার নীতির প্রসার ঘটানো হয়। লেখক যাকে 'দুর্যোগের ফলে পুঁজির উত্থান' বলে মনে করেন। অর্থাৎ দুর্যোগের কারণে কিভাবে নব্য উদারনীতিবাদী অর্থ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা বোঝার চেষ্টা করেছেন।

সুন্দরবনে আইলা দুর্যোগের পরে উন্নয়ন ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষ করে নিম্ন সুন্দরবনের স্থানীয় দীর্ঘ দিনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তর হয়েছে। এই রূপান্তর ক্লেইনের আশংকাকে পুরোপুরি সমর্থন না করলেও বেশিরভাগ যুক্তির সাথে সহমত পোষণ করে, আমার সন্দর্ভের মৌলিক বোঝার বিষয়টিও, "দুর্যোগ ও পুঁজির উত্থানঃ পাথরপ্রতিমায় নতুন কৃষি ব্যবস্থা" এই শিরোনামের মাধ্যমে। তাই এই যুক্তির খাতিরে নব্য উদারনীতি ধারণা কি তা এখানে বোঝা প্রয়োজন। কারণ পুঁজির উত্থানের ক্ষেত্রে দুর্যোগের সম্পর্ক কোথায়, এটা বোঝার জন্য। তার কারণ একজন দায়িত্বশীল গবেষক হিসেবে ১০ বছরের বেশি সময় ধরে উক্ত বিষয়ে চর্চা, ও স্থানীয় একজন মানুষ হিসেবে বিষয় নির্ধারণ, ও তথ্য সংগ্রহ কিংবা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা থেকে বলতে পারি ক্লেইন দুর্যোগের সাথে পুঁজির উত্থানের যে ধারণা পোষণ করেন, আমার সন্দর্ভে ক্ষেত্রেও আমি অনেকটাই সমযুক্তি পোষণ করি। এবং এই যুক্তিকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বোঝার চেষ্টা করেছি Ferguson এর লেখা 'The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho' বইয়ে চর্চিত উন্নয়নের ধারণার মাধ্যমে। এই দুটো বইয়ের চর্চিত তাত্ত্বিক বিষয়গুলো অনেক ক্ষেত্রে আমার সন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে, বিশেষ করে তৃতীয় অধ্যায়ে।

আবার ২০০৯ সালের আইলার পরে সুন্দরবনের ওপর দিয়ে পরপর ৪টি বৃহৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরবর্তী উন্নয়নের প্রবাহ কিন্তু একই খাতে প্রবাহিত হয়নি। যেমন সাগরদ্বীপ ব্লকের কচুবেড়িয়া মৌজা যেটির অবস্থান পূর্ব সাগরের একেবারে নদীর তীরে। তাঁদের ক্ষেত্রে আইলার থেকেও অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ইয়াস ঝড়ে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখি, আইলার ক্ষয়ক্ষতির সাথে ইয়সের তুলনা করে তুল্যমূল্য বিচারে সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে দুটো প্রত্যাঘাত অনেকটাই এক হলেও, তার পরবর্তী উন্নয়নের ধরণ ও কৃষির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আইলা পরবর্তী উন্নয়নের সাথে কয়েকটি ক্ষেত্রে আলাদা ফলাফল হয়েছে। এই বিষয়গুলো সন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয়। এবং এই বিষয় গুলোর ওপর যেহেতু অধ্যায়গুলোতে আলোকপাত হয়েছে তাই এখানে তার আলোচনা সীমিত রাখলাম। সুতরাং এই যুক্তির খাতিরে আমরা বর্তমান প্রচলিত নব্য উদারনীতি অর্থনীতির ভাবনাটিকেও সীমিতকারে আলোচনা করে নেব।

উন্নয়ন হল একটি সচেতন প্রয়াস। একটি বহুমাত্রিক ধারণা। যার মাধ্যমে শুধু একটি দেশের G.D.P (Gross Domestic Product) বা মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি নয়, উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষের স্বক্ষমতা (freedom) ও সক্ষমতার (capability) প্রসারের প্রয়াসকেও গুরুত্ব দিতে হবে। উন্নয়নের এই ধারাকে আমরা যদি কয়েকজন অর্থনীতিবিদের বক্তব্যকে অনুসরণ করে বিশ্লেষণ করি তাহলে উন্নয়ন সম্পর্কে বুঝতে আরও সুবিধা হবে।

কল্যাণ সান্যাল তাঁর লেখা বই 'সাত সতের' তে বলেন ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট নামে একটি অ্যাক্ট তৈরি করা হয়, যার বিষয় ছিল ব্রিটিশ কলোনিগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কি কি করনীয় তার বিচার। সকর্মক ক্রিয়া হিসেবে উন্নয়নকে দেখা এই ব্রিটিশ ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট থেকেই শুরু, যা পরে ১৯৫০ এ একটা সংহত চেহারা পেল (সান্যাল, ২০১১; পৃঃ ৬৯)। আবার অশোক রুদ্র 'ভারত বর্ষের কৃষি অর্থনীতি' (অর্থনীতি গ্রন্থ মালা ২ ২০১৫) বইয়ে বলেন, ১৯৫১ সাল থেকে আমাদের দেশের আর্থিক উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পত্তন করা হয়েছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঠামো। এবং সেই যুগ থেকেই শুরু হয়েছে আমাদের দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার উপর সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বিস্তার (রুদ্র; ২০১৫; পৃঃ ১২৮)।

কিন্তু স্থানীয় মানুষ যাকে উন্নয়ন বলে মনে করেন তাঁরা কি এই উন্নয়নের দ্বারা আদপেও সংপৃক্ত হয়েছেন? যেমন দ্রেজ ও সেন মনে করেন উন্নয়নকে মানুষের মৌলিক 'স্বক্ষমতা' (freedom) ও 'সক্ষমতার' (capability) প্রসার হিসেবে দেখাই যুক্তিসংগত (দ্রেজ ও সেন; ২০১৫)। অর্থাৎ মানুষের স্বক্ষমতা ও সক্ষমতার প্রসারই উন্নয়নের প্রকৃত লক্ষ্য। আয়বৃদ্ধি থেকে সম্পদের প্রসার ঘটে, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে যে সম্পদের ব্যবহার করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক পরিকাঠামো এবং অন্যান্য সম্পদ সৃষ্টি করে সমস্ত নাগরিক জীবন-মানের উন্নতি সাধন করা যায়।[৬] উন্নয়নের অর্থ বুঝতে যদি এই যুক্তি ধরে নিই তাহলে বলতে হয় আইলা উত্তর পাথরপ্রতিমা ব্লকের যে উন্নয়নের কথা আমরা আলোচনা করলাম তার দ্বারা স্থানীয় অঞ্চলের সাধারণ মানুষ আদপেও সংপৃক্ত হয়নি। কারণ উন্নয়ন যদি হয় তাহলে আয় ও জীবনের মানও বাড়বে। নদী বাঁধের উন্নতির ফলে মানুষের নিরাপত্তা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও পরিবর্তিত কৃষির

[৬] দ্রেজ, জ্যাঁ ও অমর্ত্য সেন (২০১৫) ভারত ও উন্নয়ন বঞ্চনা'। ভাষান্তর অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ও কুমার রানা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃঃ ৪ (মুখবন্ধ)।

ব্যবস্থার ফলে তাঁদের আয় ও জীবনের মান কতোটা বৃদ্ধি তা প্রশ্ন-সাপেক্ষ । সুতরাং দ্রেজ ও সেনের 'নিরপেক্ষ' ও 'সার্বিক' উন্নয়নের ধারণা ও Ferguson এর 'রাজনীতি যুক্ত উন্নয়নের' ধারণার মধ্যে তুল্যমূল্য আলোকপাত করলে আমরা সুন্দরবনের আইলা উত্তর উন্নয়নের প্রকৃতি ও ধরণ বুঝতে পারব বলে মনে করি। Ferguson এর লেখা, 'The Anti-Politics Machine "Development" and Bureaucratic Power in Lesotho' বইয়ে লেখক আফ্রিকার একটি স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র 'লেশেথোর' উন্নয়ন কল্পকে বিশ্লেষণ করেছেন। দেশটি ১৯৭৫-৮৪ সময় কালে মোট ২৮ টি দেশ ও ২৭ টি বিশ্বমানের আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন সহায়তা পেয়েছে। ১৯৭৯ সালে সরকারি উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে প্রায় ৬৪ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল, যা দেশটির মোট জনসংখ্যা হিসেবে মাথা পিছু ৪৯ ডলার ছিল। বিশেষত এই উন্নয়ন সাহায্যের উদ্দেশ্য ছিল, দারিদ্র দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই ব্যাপক অর্থে (প্রায় বেশির ভাগ) ২০০ টিরও বেশি 'গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প', 'এলাকা ভিত্তিক উন্নয়নের' পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু এতো উন্নয়ন সহায়তা ও প্রকল্পের পরেও লেসেথোর বিশেষ কোনও উন্নতি হয় নি। যতবারেই উন্নয়ন প্রকল্পগুলো ব্যর্থ হত পুনরায় অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান আবারও কোনও না কোনও প্রকল্প নিয়ে হাজির হত। অথচ এই ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে পরিচালিত করার জন্য লেসেথোর রাজধানি মাসুরে, বৈদেশিক 'বিশেষজ্ঞদের' বিশাল মাপের ভিড় জমে থাকত। এই প্রেক্ষাপটে লেখকের মূল প্রশ্ন হল উন্নয়ন কি? এবং উন্নয়নের যুক্তিগুলো কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন প্রকল্প গুলোর মাধ্যমে। তাঁর প্রশ্ন উন্নত দেশ ও নানান বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলো তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বার বার উন্নয়ন করার চেষ্টা করেও কেন ব্যর্থ হয়? লেখকের মতে এর কারণ হল, এরা বার বার ব্যর্থ হয়েও পুনরায় আবার একই পদ্ধতিতেই উন্নয়নের প্রকল্প গুলোকে পরিচালিত করে। এর কারণ বোঝার জন্য লেখক এখানে সমাজ তাত্ত্বিক Foucault এর 'ক্ষমতা তত্ত্বকে' ব্যবহার করে যুক্তি দেন যে উন্নয়নের তাত্ত্বিক 'বিশেষজ্ঞরা' কিছু অনুমান ও তাদের প্রয়োগকারী ভাষা ও তার ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। এই অনুমান গুলির ভাল এবং খারাপ উভয়ই রয়েছে। উন্নত বিশ্ব যখন তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়নকল্পগুলোকে পরিচালিত করে তা বস্তুত পক্ষে ব্যর্থ প্রকল্প গুলোকে যুক্তির মাধ্যমে পুনরায় সাফল্য হিসেবে প্রচার করে। লেখক মনে করেন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে

কেবল আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করা হয় । তিনি আরও মনে করেন উন্নয়ন তত্ত্ব রাজনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে । অর্থাৎ উন্নত বিশ্ব তাদের উন্নয়নের মডেল গুলোকে উন্নয়নশীল বিশ্বের উপরে রাজনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমে প্রভাব খাটিয়ে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে, তাতে উন্নয়ন কার্যকারিতা হোক বা না হোক। অর্থাৎ উন্নয়নের নানান প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিজস্ব যুক্তি তৈরি করে, এবং এই যুক্তি একই সাথে লেসেথোকে একটি বিশেষ ধরণের জ্ঞানের মডেল হিসেবে গড়ে তোলে, এবং এই বিশেষ মডেলের চারিদিকে জ্ঞানের একটি কাঠামো তৈরি করে আর এই কাঠামোর মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের উন্নয়ন মডেল গুলো সংগঠিত হয়।[৭] Ferguson বিগত শতকের ৭০-৮০ এর দশকে আফ্রিকার একটি ছোট্ট দেশ লেসেথোর 'আধুনিক উন্নয়নের' যে প্রকৃতি বা ধরণ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তার ৪০ বছর পরেও ভারতের সুন্দরবনের ক্ষেত্রে আইলা উত্তর উন্নয়নের ক্ষেত্রেও একই ভাবে প্রযোজ্য।

২০০৯ সালে ২৫ মে আইলার ফলে সুন্দরবনের ৭৭৮ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ নদীবাঁধ ভেঙ্গে প্রায় ১,২৫,৮৭২ হেক্টর কৃষি জমি প্লাবিত হয় (দেখুন, CRG রিপোর্ট, পৃঃ ৭৭)।[৮] ক্ষতিগ্রস্ত নদীবাঁধের মেরামত ও লবণ জলে প্লাবিত বিস্তীর্ণ কৃষি জমির পুনরায় কৃষি উৎপাদনের প্রশ্নে সমগ্র সুন্দরবনে সরকারি ও দেশি বিদেশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প চালু হয়। এই বৃহৎ উন্নয়ন কল্পের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমরা সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। অর্থাৎ Ferguson উন্নয়নের তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে আমরা যেমন বোঝার চেষ্টা করব পাথরপ্রতিমা ব্লকের আইলা উত্তর উন্নয়নের প্রকৃতি ও ধরণ, তেমনি এই উন্নয়নের 'ফলাফলকে' বোঝার চেষ্টা করব Naomi Klein এর লেখা 'The Shock Doctrine, The rise of disaster capitalism' এর মাধ্যমে। এবং বোঝার চেষ্টা করব আইলা উত্তর সুন্দরবনে উন্নয়নের নামে কিভাবে পুঁজিবাদের উত্থান ঘটছে। লেখকের মূল তাত্ত্বিক বক্তব্য হল, দুর্যোগ কারো কারো জন্য যেমন কিছু 'সুযোগের' দরজা খুলে দেয়, তেমনি কারো জন্য আবার সম্পদ

[৭] Ferguson, James (1996): "The Anti-Politics Machine "Development, "Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho", University of Minnesota Press, New York.

[৮] মহানির্বাণ কলকাতা রিসার্চ গ্রুপের Discussion Paper-I, 'The Proposal of Strengthening Embankment in Sundarban: Myth and Reality' নামক রিপোর্ট থেকে তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছে। http://www.mcrg.ac.in/rw%20files/RW35/7.Discussion_Paper1.pdf

সঞ্চয়, ব্যবসায়িক অবকাঠামো গঠনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। ব্যবসায়িক শ্রেণী ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার এই দুর্যোগকে ব্যবহার করে সরাসরি লাভের হিসেব কষে দুর্যোগ পরবর্তী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 'নীতি' গ্রহণ করে। লেখক তাঁর বইয়ে দেখান যে কিভাবে নব্যপুঁজিবাদ দুর্যোগের ফলে সাধারণ মানুষের মনে যে মানসিক দ্বিধা, ধাক্কা বা সঙ্কট তৈরি হয় সেই সংকটকে সুচতুর ভাবে ব্যবহার করে মুক্ত বাজার, অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির যুক্তি তৈরি করে।[৯] আইলা উত্তর সুন্দরবনে কৃষির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঠিক একই চিত্র আমরা দেখতে পাই। ২০০৯ সালের ২৫ মে আইলা দুর্যোগ ঘটে। একই বছর (জুন ও জুলাই) দুর্যোগের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কৃষি ক্ষেত্রে লবণজল সহন কারি বিভিন্ন কোম্পানির বীজ স্থানীয় কিছু চাষিকে ত্রাণ হিসেবে প্রদান করে । এই বছর আশানুরূপ উৎপাদন হওয়ায় পরের মরশুমে চাষের সময় থেকে বাজারে আরও (বিগত বছরের থেকে অনেক বেশি) বিভিন্ন কোম্পানির উচ্চফলনশীল বীজ স্থানীয় বাজারে প্রবেশ করতে থাকে। সাথে বিভিন্ন সার ও কীটনাশক কোম্পানি গুলোও এই বলে প্রচার করতে থাকে যে উক্ত উচ্চফলনশীল বীজের মাধ্যমে চাষ করতে হলে তাদের কোম্পানির সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে নাহলে ফলন কম হবে। এই ভাবে স্থানীয় অঞ্চলে কয়েক বছরের মধ্যে গুরুর নাঙলের পরিবর্তে ব্যাপক হারে পাওয়ারটিলার, ট্রাক্টর, চাষি পরিবারেরা বিগত বছরের বীজ সংরক্ষণ করার পরিবর্তে বাজারের নানান কোম্পানির বীজ, সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে থাকে। ধীরে ধীরে চাষি এখন থেকে চাষের ক্ষেত্রে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার পরিবর্তে আধুনিক নামজাদা বৃহৎ কোম্পানির পরামর্শে চাষ করতে শুরু করে। এর ফলে উৎপাদন বাড়লেও খরচও বাড়ে প্রায় দ্বিগুণ হারে। দিনের শেষে চাষির পকেট ফাকাই থাকে, বিপরীতে সুন্দরবনের লক্ষ লক্ষ চাষিকে উদ্দেশ্য করে আইলা পরবর্তী উচ্চফলনশীল বীজ, সার কীটনাশক কোম্পানির মুনফা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আইলা পরবর্তী পাথরপ্রতিমা ব্লকের কৃষির এই পরিবর্তনকে আমরা দুর্যোগের ফলে পুঁজির উত্থান বলে আখ্যায়িত করছি।

[৯] Klein, Noami (2007): "The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism" Knopf Canada, Canada (first edition).

অর্থাৎ দুর্যোগ পরবর্তী পাথরপ্রতিমা ব্লকের যে উন্নয়ন তা আমরা Ferguson এর 'উন্নয়নের তত্ত্ব' ও Naomi Klein এর দুর্যোগকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে যে নব্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির উত্থান ঘটে তার চালচিত্রের সঙ্গে যুক্তি ও তত্ত্বগত ভাবে মেলাতে পারি।

সূচনাঃ-

কৃষি প্রধান সমাজে ভূমি ব্যবস্থা বা কাঠামোর উপর হয়ত অনেকটাই নির্ভর করে গ্রাম জীবনের জীবিকা ও তার শ্রেণী বিন্যাস। রাষ্ট্র ও ব্যক্তি অথবা সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ। সুন্দরবনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক এই সম্বন্ধ লোকায়ত নিয়ম নীতির দ্বারা পরিচালিত হত। ২০০৯ সালে ২৫ মে সমগ্র সুন্দরবনে 'আইলা' নামে ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর থেকে স্থানীয় মানুষের গতানুগতিক জীবন-যাত্রায় ছেদ পড়ে। দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সরকারি (কৃষিজ) নতুন প্রকল্প ও তা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন, নিয়ম নীতির ফলে রাষ্ট্রের সাথে স্থানীয় মানুষের তৈরি হয় এক নতুন ও ভিন্ন পরিসর। এর ফলে স্থানীয় অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থা পরিচালনা করার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ধীরে হলেও নতুন ভাবে গড়ে ওঠে। নতুন ও ভিন্ন এই পরিসর তৈরির ক্ষেত্রটি ছিল এই রূপ স্থানীয় প্রথাগত কৃষির ক্রম পরিবর্তন। অন্যদিকে উৎপাদন ব্যবস্থায় 'নতুন ও আধুনিক' পদ্ধতির প্রচলন ঘটতে থাকল। একই সময়ে স্থানীয় অঞ্চলে দুর্যোগের কারণে ক্ষতি পূরণের প্রশ্নে সরকার পক্ষ থেকে ভূমি বিষয়ক কিছু 'নতুন নীতি' নির্ধারণ করার ফলে ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে।[১০] ভূমির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইন কানুন, কৃষক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক এইরূপ নানান বিষয়গুলো ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। যা আমি আমার সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। রাষ্ট্রীয় আইন কানুন সঞ্জাত পরিবর্তিত এই প্রভাব স্থানীয় বাজার ব্যবস্থার ওপরে সবথেকে বেশি পড়ে। স্থানীয় কৃষির উৎপাদিত শস্য অধিক মাত্রায় 'পণ্যে' রূপান্তরিত হতে থাকল। অর্থাৎ এই সময় থেকে স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থা কেবলমাত্র পরিবারের প্রয়োজনে নয়, বাজারেও ব্যাপক ভাবে প্রবেশ করল। দুর্যোগ প্রাকৃতিক বা মানবিক এই আলোচনা ও সমালোচনা রয়েছে; কিন্তু আমার এই সন্দর্ভে তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল পরিবর্তিত অর্থ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে উন্নয়নকে কি ভাবে বুঝব আমরা? তাই স্থানীয় অঞ্চলে অর্থ-রাজনীতিতে দুর্যোগের 'প্রভাব ও প্রকৃতি' বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে

[১০] এই তথ্যটি দক্ষিণ ২৪ পরগণার মহাকুমা অফিস Land & Land Reforms দপ্তর থেকে ২০১৮ সালে মে মাসে সংগ্রহ করা হয়েছে। No. 5504-LA 11-147/11(Pt.) Land & Land Reforms Department; Land Acquisition Branch; Writers' Buildings, Block-1V, First Floor, Kolkata- 700001।

উক্ত অঞ্চলের ‘পরিবর্তিত কাঠামোগত পরিবর্তন’ গুলোকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়ে বোঝা ও আলোচনা করা হল আমার সন্দর্ভের মৌলিক বিষয়বস্তু।

কৃষিই যেহেতু গ্রাম জীবনে বেঁচে থাকার ভিত্তি, তাই দুর্যোগ পরবর্তী ‘পরিবর্তনের’ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থার ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আলোচ্য ব্লকটির কৃষির ইতিহাস ও বর্তমান ‘ব্যবস্থার’ ওপর দুর্যোগ এর কীরূপ প্রভাব পড়েছে তার প্রকৃতি আলোচনা করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

আইলার পর থেকে সুন্দরবনে সরকারি প্রচেষ্টায় নদীবাঁধ কিছুটা শক্তপোক্ত হলেও তুলনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েছে অনেক বেশি।[১১] গত কয়েকবছর (২০০৯ - সালের আইলা, ফনি ও বুলবুল - ২০১৯, আমফান - ২০২০, ইয়াস - ২০২১) ক্রমাগত প্রাকৃতিক দুর্যোগে চাষের জমি ও ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে কৃষি তো দূর-অস্ত এই সুন্দরবন নিম্নভূমিতে কতদিন আর বসতি থাকবে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানান প্রশ্ন। সুন্দরবনবাসীর কাছে, কৃষিক্ষেত্রে যে বছর দুর্যোগ হবে না সেবছরে সেটাই তাদের লাভ। স্থানীয় কৃষকদের কথায় বিক্রি যোগ্য ফসল রাখার জন্য প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে কোল্ড স্টোরেজ, উদ্বৃত্ত ফসলের সঠিক দামে বিক্রির সুযোগ বাড়ানো, ফসল বিক্রির জন্য নিকটবর্তী বা শহরের বাজারের সাথে নির্দিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে সরকারি তরফে ক্ষতিপূরণের পূর্বশর্ত থাকলে তবেই সুন্দরবনের কৃষির উন্নতি হতে পারে।[১২] সেখানে বাজার থেকে বীজ কেনার নিয়ম,

---

[১১] এই তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছে U.N.O, Environment Programe, এর ‘Convention on the Conservation of Migration Species of Wild Animals’ The Sundarbans And Climate Change; নামক রিপোর্ট থেকে। https://www.cms.int/sites/default/files/publication/fact_sheet_sundarbans_climate_change.pdf. এবং অন্যান্য আরও এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি ‘Mangroves and biodiversity are being depleted’ প্রবন্ধ থেকে। https://zerocarbon-analytics.org/archives/justice/loss-and-damage-in-the sundarbans#:~:text=Land%20surface%20temperature%20in%20Sundarban,%2C%20crab%2C%20honey%20and%20firewood.

[১২] এই বিষয়ে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘বাংলার ফসল বিমা’ যোজনার মাধ্যমে পাথরপ্রতিমা ব্লকের প্রায় ৬৫ হাজার কৃষক পরিবার ২০২৩ সাল পর্যন্ত শস্যের ক্ষতির জন্য সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। এই তথ্য সংগ্রহ করেছি ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ব্লকের কৃষি দপ্তর থেকে।

সার ঔষধের ব্যবহার, মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা এই রূপ নানান প্রশ্নের উত্তর স্থানীয় কৃষকের কাছে অজানা। সুন্দরবন অঞ্চলের প্রায় ৯০ শতাংশ কৃষক উক্ত প্রশ্নগুলোর সাথে পরিচিত নয়। (অন্তত ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে বলতে হয়)। তবুও বছরের পর বছর ধরে দুর্যোগের সাথে লড়াই করে ক্রমশ উচ্চ ফলনশীল বীজ, প্রযুক্তি, কীটনাশক, আধুনিক কৃষিব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যবহার দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদনও বাড়ছে। অপরদিকে ক্রমশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই অঞ্চলে কৃষকের মনে এক 'ভীতি বা আশঙ্কা' তৈরি করেছে। আমার এই ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখাতে চেয়েছি যে ক্রমাগত দুর্যোগ ও কৃষকের আশঙ্কার সাথে তালমিলিয়ে বিভিন্ন বীজ, সার, কীটনাশক প্রস্তুতকারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির উপস্থিতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ বিশেষ করে দ্বীপাঞ্চল সহ সমগ্র সুন্দরবন এই ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন 'বাজারে' পরিণত হয়েছে। খোলা বাজার থেকে কৃষক বীজ কেনার সময়ে নোটিফায়েড বীজ কিনা, বীজ খারাপ হলে কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দেবে কিনা তা কিছুই জানেনা কৃষক। ব্লকের এক কৃষি আধিকারিকের কথায় 'প্রত্যেক বছর নতুন নতুন বীজ, সার, ওষুধ ও প্রযুক্তি সরবরাহের লাইসেন্সের জন্য স্থানীয় মানুষের মধ্যে (বিশেষত কম বয়সীদের মধ্যে) ঝোঁক বেড়েছে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত এই প্রকার লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান ছিল ১৫৬টি আর বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ২০৫টিতে।[১৩] লাইসেন্স ছাড়াও প্রত্যেক বাজারে খুচরো ব্যবসায়ীদের আনাগোনা চোখে পড়ার মতো। এই ধরনের ব্যবসায়ীদের বেশি লাভের আশায় ক্রমশ কৃষকও উচ্চফলনশীল নতুন বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে। সার ও কীটনাশক ব্যবহার বাড়ছে যথেচ্ছ ভাবে। যার সাথে কৃষকের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তাই কৃষক চাষ করে কোম্পানির এজেন্টদের পরামর্শে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, কোম্পানির এজেন্টদের দায় কি কৃষককে পরামর্শ দেওয়ার? কারণ কৃষকের উন্নতি নয় বরং কোম্পানির ব্যবসার টার্গেট পূরণ করাই হল এই ধরনের এজেন্টদের প্রধান কাজ। স্থানীয় এক এজেন্টের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, তিনি ২০১১ সালে দর্জির কাজ ছেড়ে সার কীটনাশক বিক্রির এজেন্ট হয়েছেন। এতে তাঁর লাভ বেশি। প্রথম বছর ১৭ কুইন্টাল সার সহ মোট ৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার কীটনাশক ও বীজ বিক্রি করে বছরে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা লাভ করেছিলেন। এখন তাঁর ব্যবসা অনেক বেড়েছে, ২০২১-২২

[১৩] ক্ষেত্র সমীক্ষার সময়ে ব্লকের কৃষি দপ্তর থেকে সংরহিত তথ্য। এই তথ্য সংগ্রহ করেছি ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ব্লকের কৃষি দপ্তর থেকে।

সালে লাভ করেছেন মোট ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।[১৪] তাহলে কৃষকের লাভ কোথায়? প্রশ্ন শুনে এক কৃষকের উত্তর, আর কোন রাস্তা নেই, সরকারি সহযোগিতা (আইলা ও খাদ্যসুরক্ষার চাল এবং শস্যবিমা, কৃষক বন্ধু, পি এম কিষাণ, কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি) ও চাষে যা ফসল হয় তা দিয়ে পরিবারের খাওয়ারের যোগান ও অল্পবিস্তর বাজারপত্র হয়ে যায়। তাহলে কৃষক চাষ করে কেন? সহজসরল কৃষকের কাছে এর কোন উত্তর নেই।

কৃষিতে যদি কোন লাভ না থাকে তাহলে স্থানীয় এজেন্টদের এত লাভ কিভাবে আসে? আদানির মতো বহুজাতিক কোম্পানিগুলোইবা কেন কৃষি পণ্যের ব্যবসার সাথে যুক্ত হচ্ছে? ' Syngenta' এর মতো পৃথিবী বিখ্যাত বীজ ও কীটনাশক প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো ভারতীয় কৃষি পণ্যের ব্যবসায় হাত পাকাচ্ছে কেন?[১৫] কৃষকের লাভের গুড় খায় এই ধরনের বহুজাতিক কোম্পানি ও তাদের দালালরা। আর এই ধরনের লাভ আরও বেড়ে যায় তখন, যখন

আইলার পর আলে সবজি চাষ ক্ষেত্র সমীক্ষা

[১৪] এই সাক্ষাতকারটি পাথরপ্রতিমা বাজারে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নেওয়া হয়েছিল। এই বাজারেই উক্ত ব্যাক্তির কৃষি রাসায়নিক (agro chemical) বিক্রয়ের দোকান রয়েছে। এই বিক্রেতারা নিজেদের 'কোম্পানির এজেন্ট' বলতে বেশি সাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কারণ স্থানীয় কৃষি রাসায়নিক বিক্রয় কেন্দ্রগুলোর, কার সরকারি লাইসেন্স আছে বা নেই তার ওপরে নির্ভর করে দৈনিক বেচাকেনা ও দোকানের মান-মর্যাদা। যে বিপণনের লাইসেন্স আছে সেখানে কৃষকের ভিড় জমে বেশি। আবার বড় বড় কোম্পানির কৃষি রাসায়নিক কোম্পানির পণ্যগুলো এই দোকান গুলোতে বেশি পাওয়া যায় । আসলে স্থানীয় অঞ্চলে এই ধারণা তৈরি হয়েছে যে, লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান গুলোই হল কোম্পানির এজেন্ট। আর কোম্পানির এজেন্ট মানে ভালো এই ধারণাও প্রতিষ্ঠিত হল। এই ভাবে'কোম্পানির এজেন্ট ও লাইসেন্স' এই শব্দগুলোর ধারণা স্থানীয় কৃষি উৎপাদন 'ব্যবস্থার' সাথে চর্চা হতে থাকল।

[১৫] Syngenta ২০২৪ সালে ভারতে 'কৃষি-রাসায়নিক পণ্য ' বিক্রি করে ৪০৬.১ মোট কোটি আয় করেছে। https://www.tofler.in/syngenta-india-private limited/company/U24210PN2000PTC135336?utm_source=chatgpt.com; এবং https://www.syngenta.co.in/।

দুর্যোগে কৃষকের মনে 'সংকট' তৈরি হয়। Naomi klein তাঁর লেখা বই 'The shock doctrine, The rise of Disaster Capitalism' এ বলছেন যে নয়া 'উদারনীতিবাদিদের মূল উদ্দেশ্য হল যেকোনো প্রকারে নতুন নতুন বাজার দখল করা। ক্লাইনের মতে অর্থনীতি সংস্কারের জন্য নয়া উদারনীতিবাদিরা সমাজে একটি ঝাঁকুনি চায়। যে ঝাঁকুনিতে মানুষ বাধ্য হবে তাঁদের অর্থনীতির সংস্কারকে মেনে নিতে। ২০০৪ সালে শ্রীলংকা ও ২০০৫ সালে নিউ অরল্যান্স এ হ্যারিকেন ঝড়ে মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পৃথিবীর দুই প্রান্ত মিলে মোট ২.৫ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়। তার থেকেও বেশি মানুষ ঘর ছাড়া হয়েছিল। শ্রীলংকার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে চরে বসবাসকারী মানুষ পরিস্থিতি সামলে যখন বাড়িতে ফিরে আসছে তখন স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন নতুন আইন দেখিয়ে চর থেকে গরীব বসতিকে উচ্ছেদ করে নামি কোম্পানিকে হোটেল, পার্ক তৈরির জন্য অনুমতি দিয়েছে। অর্থাৎ লেখকের মতে নয়া উদারবাদীরা কৌশলে সুনামিকে ব্যবহার করে, তাঁদের নতুন বাজার তৈরি করেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক বা সন্ত্রাসবাদী হামলা এই সময়ে স্থানীয় মানুষ যে আতঙ্কে থাকে সেই আতঙ্কের সুযোগে নয়া উদারনীতিবাদ তার কার্যসিদ্ধি করে'। ঠিক যেমন ২০০৯ সালে আইলার পরে বিপর্যস্ত সুন্দরবনকে পুনর্গঠনের নামে নতুন বাজারে পরিণত করেছে। ফলত সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোও এদের ইচ্ছায় নানান প্রকল্প পরিচালিত করতে থাকে'। সরকার যুক্তি দেখাল এত বড় দুর্যোগ এর পর পুনর্গঠন করতে গেলে মানবিক শ্রমের পরিবর্তে ব্যাপক যন্ত্রের প্রয়োজন। নদীবাঁধ মেরামতে স্থানীয় মানুষের পরিবর্তে বৃহৎ কোম্পানির ড্রেজার মেশিন ব্যবহার হতে থাকল। ফলত কয়েক হাজার স্থানীয় শ্রমিক কাজ হারালেন। চাষের জমিও লবণ জলে প্লাবিত হল। তাই কৃষকের বাড়ির সংরক্ষিত বীজ দিয়ে আর ফসল ফলানো যাবেনা। এর জন্য প্রয়োজন লবণ জল সহনশীল উচ্চ ফলনশীল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উন্নত বীজ। যা বাজার থেকে কিনতে হবে। চাষিও বাজার থেকে নতুন নতুন বীজ, সার কীটনাশক কিনতে থাকল। যদিও নতুন চাষের এই পদ্ধতির সাথে কৃষক একেবারেই পরিচিত নয়। কোম্পানির এজেন্টদের পরামর্শে চলে স্থানীয় অঞ্চলের চাষবাস। অর্থাৎ ক্লাইনেরবক্তব্য হল কোন অঞ্চলে প্রচলিত অর্থনৈতির পরিবর্তে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সুযোগ নিয়ে নয়া উদারবাদ তাদের মতাদর্শ ও নতুন বাজার গড়ে তোলে। তার রূপ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্নও হতে পারে। যেমন লেখক তার বইতে উল্লেখ করেছেন ইরাকে গ্রিন জোন, এশিয়ায় সুনামি ও হ্যরিক্যান ক্যাট্রিনা এর আঘাত সকল কিছুই এক বিশেষ পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে ।

বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে। আমার ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখেছি আইলার আগে কেবল ৭ শতাংশ কৃষক ধান (আমন ও বোরো), আনাজ-শাকসবজির বীজ বাজার থেকে কিনে চাষ করত। আইলার পর থেকে স্থানীয় অঞ্চলে প্রত্যেক কৃষক চাষের যে কোনো বীজ বাজার থেকে কেনে।[১৬] এতে উৎপাদনও বেড়েছে। কিন্তু পাশাপাশি খরচও বেড়েছে দ্বিগুণ। চাষের সময় কমেছে, জমির মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকের শ্রমমূল্য বেড়েছে, তাহলে চাষির লাভ কোথায়? আবারও সেই একই চিত্রঃ চাষি চাষ করে বাড়িতে পরিবারের সাথে থেকে খেয়ে বেঁচেবর্তে থাকে। তাহলে লাভের অংশীদার মূলত হয় কে? আসলে চাষির পরিস্থিতি যা ছিল তাই আছে বলে মনে হয়। মাঝখানে বীজ, সার, কীটনাশক কোম্পানিগুলো কৃষককে নানান ধোঁয়াশায় রেখে নিজেদের লভ্যাংশ গুছিয়ে নেয়। কৃষকের দিন কাটে জীবন যুদ্ধের সংগ্রামেই।

গবেষণার গুরুত্বঃ-

কোনো গবেষণার গুরুত্ব বলতে হলে সেই গবেষণার তাৎপর্যকে বোঝায়। ২০০৯ সালে সুন্দরবনে আইলার ঝড়ের ফলে সমগ্র অঞ্চলটি দুর্যোগ দ্বারা কবলিত হয়। Irrigation & Waterways department, Government of West Bengal এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আইলা ঝড়ের ফলে মোট ১১টি জেলায় ১৯০ জন মানুষের মৃত্যু হয়। সুন্দরবনের ৩১২২ কিলোমিটার নদী বাঁধের মধ্যে আংশিক ও সম্পূর্ণ মিলে মোট ৭৭৮ কিলোমিটার বাঁধের ক্ষতি

[১৬] এই তথ্যটি ২০১৫-১৬ সাল থেকে M.Phil গবেষণা ও বর্তমান Ph.D গবেষণার সময়ে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ক্ষেত্র সমীক্ষার তথ্যের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এখানে আমি ৫০ জন কৃষকের সাথে আলোচনা করেছি, এর মধ্যে ৭% কৃষক যারা আইলার আগে কিছু কিছু বিশেষ করে সব্জির বীজের ক্ষেত্রে তাঁরা বাজার থেকে বীজ কিনে ব্যবহার করতেন। তাছাড়াও গবেষণা কেন্দ্রিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমীক্ষার সময়েও এই বিষয়টি আমি বোঝার চেষ্টা করেছি। স্থানীয় বিভিন্ন বাজারে উপস্থিত হয়ে বীজ ও কৃষি রাসায়নিক দোকানে বেচাকেনা, খোলা বাজারে ছোট কৃষকের সব্জি বিক্রি ও তুলনায় বড় কৃষকদের বাইরে থেকে আসা পাইকারি দোকানে সব্জি বিক্রি করতে দেখেছি। এই মানুষগুলোর সাথে বিভিন্ন সময়ে আলাপ আলোচনায় যে তথ্যগুলো পেয়েছি তা উক্ত যুক্তি কে আরও জোরাল করে।

হয়।[১৭] অর্থাৎ প্রায় ২৫ শতাংশ নদী বাঁধ ভেঙ্গে যায়। যার ফলে হাজার হাজার বসত বাড়ি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ৭৭,৪৮৬ সম্পূর্ণ ও ২৪৫,৯৬৮ একর আংশিক ভাবে কৃষি জমি লবণ জলের দ্বারা প্লাবিত হয় (Banu, 2019)। যার ফলে জীবিকার উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের একাংশ মানুষ নিজের বসত ভিটে ছেড়ে পরিযায়ী জীবন কাটাতে বাধ্য হয়।[১৮] দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের জলসম্পদ দপ্তর দুর্যোগ পরবর্তী বাঁধ মেরামতের জন্য রাজ্য সরকারের অধীন সেচ দপ্তরের মাধ্যমে 'Task force' গঠন করে ৬০১ কিলোমিটার নদীবাঁধ মেরামতের জন্য 'আইলা প্রকল্প' নামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যার জন্য ৫০৩২.০০ কোটি টাকা ধার্য কর হয়। রাজ্যসরকারের তরফ থেকে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন মিলে ১৬টি (বিভিন্ন ত্রাণ সহ) প্রকল্প ও ৫২টি বেসরকারি সংস্থা (NGO) মিলে কোন অঞ্চলে যৌথ ভাবে বা কোন কোন অঞ্চলে একক ভাবে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা পরিচালিত করে (প্রথম দিকে) । আইলার পর ১৫ বছর কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত কয়েকটি প্রকল্প বর্তমান সময়েও পরিচালিত হচ্ছে।

লোকমুখে প্রাচীন কাল থেকে দুর্যোগকে স্থানীয় অঞ্চলের কোন দৈবিক বা ঐশ্বরিক অভিশাপ বলে মনে করা হত। কিন্তু আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক কারণ ও যুক্তির ফলে বোঝা গেল যে দুর্যোগ কোন দৈব বা ঈশ্বরের অভিশাপ নয় বরং তা পরিবেশের ভারসাম্যের অভাবের কারণে ঘটে;

---

[১৭]এই তথ্যটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করেছি https://wbiwd.gov.in/index.php/applications/aila।

[১৮] Down To Earth নামক অনলাইন পত্রিকার ১৫ জুলাই ২০০৯ সালে 'Aila prompts exodus' প্রবন্ধে J. Basu র লেখাটি আলোকপাত করে। আইলা হওয়ার দু মাসের মধ্যে, সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক থেকে অভিবাসনের নানান চিত্র তুলে ধরেন। https://www.downtoearth.org.in/environment/aila-prompts-exodus-3572 । দুর্যোগের ফলে সুন্দরবন থেকে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ এর অভিবাসন হয়েছে তারা কি পরের দিকে ঘরে ফিরে এসেছে? এই তথ্য জানার জন্য Down To Earth এর ২০২১ সালের জুনের ৪ তারিখের পত্রিকার 'Two cyclones and a gas leak: Journey of migrants between urban precariousness and ravaged villages' নামক প্রবন্ধে শ্রেয়া ঘোষ আইলা থেকে আম্ফান পর্যন্ত দুর্যোগের ফলে অভিবাসনের এক করুণ চিত্র অংকন করেন। এবং এই বিষয়ে আরও জানার জন্য 'Question of cities, Forum For nature, people, and Sustainability নামক অনলাইন ছোট পত্রিকায় 'Climate migrants: From cyclone-hit Sundarbans to Kolkata's miserable shanties প্রবন্ধে সুন্দরবনের দুর্যোগের ফলে অভিবাসনের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোক পাত করেছেন। যেটি ২০০২ সালের ১৫ জুলাই প্রকাশিত হয়েছে। https://questionofcities.org/climate-migrants-from-cyclone-hit-sundarbans-to-kolkatas-miserable-shanties/#respond।

ক্রমশ তা (দুর্যোগের ঘটনা) বেড়ে চলেছে। এই দুর্যোগ স্থানীয় অঞ্চলে সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় এক ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। দুর্যোগের এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায় যখন সরকার (দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে) বিষম ভাবে বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়িত করে। আমরা এই বিষয়ে কয়েকটি তাত্ত্বিক প্রবন্ধ ও বইয়ের উল্লেখ করে আমার গবেষণার বিষয়ে তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি।

২০০০ সালে Mike Davis এর লেখা 'Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World' নামক বইয়ের নবম অধ্যায়ে দেখিয়েছেন ঐতিহাসিক কাল থেকে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উন্নয়নের নামে সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলোর দ্বারা পরিকল্পিত অর্থনৈতিক মডেল উন্নয়নশীল দেশর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ফলে এই দেশ গুলো কখনো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পায়না। এবং আধুনিক সমাজ যাকে তৃতীয় বিশ্ব বলে জানে। ১৯৫০ এর দশকে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ভেঙে গেলেও দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতি ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশ গুলোকে যে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল করে রাখে তা বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করেছেন। ভিক্টোরিয়ান সময়ে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে বিভিন্ন যে দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, তিনি সেগুলির বিশ্লেষণ করেন। (দুর্যোগ পরবর্তী সরকারি নানান কমিটি ও কমিশন) এর নানান তথ্য পর্যালোচনা করে বলেন, দুর্যোগ নয় বরং ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্বহীনতা ও অনিচ্ছার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটত। অর্থাৎ ডেভিস দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অর্থ রাজনীতিতে যে প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হয় তার জন্য সরকারি বৈষম্যমূলক নীতিকেই দায়ী করেছেন। তিনি ১৮৭৬-৭৭ ও ১৮৯৯-১৯০০ সালে চিনের শানডং ও ঝিলি তে অতি বর্ষা ও পরের বছর খরার কারণে ব্যাপক খাদ্যের অভাব দেখা দিলে স্থানীয় প্রশাসন যথার্থ নীতি গ্রহণের ফলে প্রায় ১০ লক্ষ কৃষক সুস্থভাবে জীবন যাপনে ফিরে আসতে পারে। আবার অপরদিকে ১৭৪০-৪৩ সালে ইউরোপে আর্কটিক শীত ও গ্রীষ্মকালীন খরার জন্য ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে (দেখুন, Davis, 2000)।

অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন, বাংলায় ১৯৪২-৪৩ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাতে সরকারি হিসেবে ১৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হলেও তা যে কতটা সঠিক তথ্য তা বলা কঠিন। তাঁর মতে ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পিত ভাবে খাদ্যের অসম বণ্টন, বন্যা, ও মায়ানমারে শস্য ক্ষেত্রে রোগের প্রাদুর্ভাব এবং

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চালের রপ্তানির ফলেই বাংলায় এই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অর্থাৎ তিনি মনে করেন ব্রিটিশ সরকারের ভারতবাসীর প্রতি পরিকল্পিত অবজ্ঞা এই দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল (দেখুন, Sen, 1981)।

Sirpa Tenhunen ও তাঁর সহ-গবেষক তাঁদের লেখা প্রবন্ধে দুর্যোগের 'রাজনৈতিক' গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন গোষ্ঠী কিভাবে দুর্যোগেকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করছে তার আলোচনা করেছেন। ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্থানে স্বায়ত্ত শাসনের দাবি ওঠে ঘূর্ণিঝড় 'ভোলা'র তাণ্ডব নিয়ন্ত্রণে প্রশাসকের দুর্বলতাকে প্রশ্ন করে। তাঁরা মনে করেন ভারতের সুন্দরবনে ২০০৯ সালে আইলা ঝড়ের ফলে সমগ্র অঞ্চলটিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভাবে বৃহৎ এক শূন্যতার চিহ্ন রেখে গেছে। যা স্থানীয় অঞ্চলে অর্থরাজনীতির ওপর দীর্ঘকালীন প্রভাব ফেলেছে। লেখকদের অভিমত হল সুন্দরবনের জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট ক্ষমতার পুনর্বন্টন এর সুযোগ গুলির নতুন অনুসন্ধান এর পথ তৈরি করে দিয়েছে (দেখুন; Tenhunen ও অন্যান্যরা; 2023)।

Naomi Klein দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে পুঁজিবাদ কিভাবে বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে নতুন নতুন বাজার দখল করে। তিনি অ্যামেরিকার হ্যারিকেন ক্যাটরিনা, সাদ্দাম বিরোধী ইরাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্যে যুদ্ধ, এশিয়ার সুনামি, ইত্যাদি দুর্যোগের প্রভাবকে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কিভাবে পুঁজি, নিজের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় নীতিগুলোকে ব্যবহার করে। লেখক মনে করেন দুর্যোগের সময়ে মানুষের মনে এক ধরণের সঙ্কটের বাতাবরণ তৈরি হয়। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আধুনিক জনকল্যাণ-কামী রাষ্ট্রগুলো একে ওপরের বিরুদ্ধে নারকীয় ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত। এক ট্রিগারে হাজার হাজার নিরীহ সাধারণ নাগরিকের হত্যালীলা চলে। সমাজব্যবস্থার পারিপার্শ্বিক এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ এক অসহায়তার সম্মুখীন হয়। লেখক যে পরিস্থিতিকে 'সঙ্কট' বলছেন। দুর্যোগের চরিত্র প্রাকৃতিক হোক কিংবা মানব সৃষ্টিই হোক। যে কোনো ধরণের দুর্যোগে মানুষ গভীর দুঃস্বপ্নের সম্মুখীন হয়। আর এই দুঃস্বপ্ন ও সঙ্কটের সময় ও স্থানই হল পুঁজির সুযোগ (দেখুন; Klein; 2007)।

যে কোনো দুর্যোগের ফলাফল সেই অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র পুনর্গঠন করে আলাদা আলাদা ভাবে। আমরা উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বইয়ে

যেতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখি আমার গবেষণার মূল বিষয় অনেকটা সেই একই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আর এখানেই আমার গবেষণার তাৎপর্য বলে মনে করি। আইলা উত্তর সুন্দরবনের সর্বস্বান্ত মানুষ, গভীরভাবে দুর্দশার সম্মুখীন হয়। (নতুন ভাবে) পুনর্গঠনের জন্য রাষ্ট্র হাজির হয় নতুন নতুন রূপ নিয়ে। নতুন এই রূপগুলোর সাথে একদিকে স্থানীয় অঞ্চলের প্রচলিত সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন রীতি, প্রথা, জ্ঞান ও অন্যদিকে স্থানীয় জ্ঞানের সাথে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তৈরি হয় নতুন নতুন অবকাঠামোর। সুন্দরবনের মানুষ হওয়ায় পরিবর্তিত নতুন এই রূপ খুব কাছ থেকে অনুভব করার সুযোগ পেয়েছি। যেহেতু প্রায় ৮০ শতাংশ স্থানীয় মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। নদীর লোনা জলে সেই কৃষি জমি সম্পূর্ণ প্লাবিত হলে জীবিকা বলতে কিছুই আর অবশেষে থাকে না। যদিও Sirpa Tenhunen ও অন্যান্য সহযোগী গবেষকরা দেখিয়েছেন দুর্যোগের পরে সুন্দরবনের কুন্তলি ব্লকে স্থানীয় নদীর চরে (এক প্রকার দখল করে) কিছু স্থানীয় মানুষ নতুন করে ‘ভেড়ির’ মাধ্যমে মাছ চাষ করে জীবিকা উপার্জন করছে। এই ক্ষেত্রে বলা যায় ভেড়িতে মাছ চাষ করে নতুন করে জীবিকা অর্জন করা খুবই অল্প পরিসরেই সম্ভব । কারণ সুন্দরবন অঞ্চলে নতুন করে যে ভেড়ি গুলো তৈরি করা হচ্ছে বস্তুত পক্ষে বলা যায় তা বেআইনি। কারণ নদীর চর দখল করে, গাছ কেটে ভেড়ি তৈরি করা হলেও তার দখল থাকে বেশিরভাগ স্থানীয় শাসক দলের নেতার অধীন। আর সুন্দরবনের চর ঘিরে ভেড়ির তৈরি করার যে বিষয়, তা একটি প্রচলিত বিষয়। এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় কৃষ্ণদাসপুর মৌজার ২ নম্বর বুথে আইলার সময়ে নদীর বাঁধ ভেঙ্গে প্রায় ৮০০ বিঘার ফিসারি (ভেড়ি) বর্তমানে নদীর চরে পরিণত হলেও আজও পর্যন্ত সেই বাঁধ মেরামত করা হয়নি। এর ফলে অন্তত ১৪০ জন ফিসারি জমির মালিক তাঁদের বাৎসরিক নির্দিষ্ট আয় থেকে বিচ্যুত হন । এই বিষয়ে আমি গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে কৃষি উৎপাদন শুরু হলেও যা সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হতে থাকে। তাই নতুন এই রূপগুলোর পরিবর্তিত কাঠামোকে বোঝার জন্য স্থানীয় অঞ্চলের দুর্যোগ পরবর্তী কৃষি ব্যবস্থাকেই আমার গবেষণার মূল উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছি। যা আমার গবেষণার বিভিন্ন অধ্যায়ে তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

সাহিত্য পর্যালোচনাঃ-

সন্দর্ভের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী আমরা সাহিত্য পর্যালোচনা কে দুটি ভাগে ভাগ করেছি। একটি হল সন্দর্ভের সার্বিক পর্যালোচনা অনুযায়ী ও অন্যটি হল সন্দর্ভের তাত্ত্বিক প্রশ্ন ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী। প্রথমে আমরা সন্দর্ভের সার্বিক পর্যালোচনা সাহিত্যকে আলোচনা করব।

কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করতে হলে অবশ্যই পূর্বের গবেষণামূলক প্রবেন্ধের ফলাফলের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন বিষয় ও ভাবনা তৈরি করাটাই একজন গবেষকের মৌলিক উদ্দেশ্য। আমি আমার গবেষণার ক্ষেত্রে বিষয়ের ভাবনা, গবেষণার মান বাড়ানো ও সঠিক দিক নির্দেশের জন্য পূর্বের নির্দিষ্ট কিছু গবেষণা নিয়ে আলোকপাত করছি, যা আমার গবেষণার সাথে প্রাসঙ্গিক, এবং এই পদ্ধতি গবেষণার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক বলেও প্রমাণিত।

সুন্দরবনের ইতিহাস জানতে হলে যে প্রবন্ধটির সম্পর্কে অবশ্যই জানা প্রয়োজন তা হল ‘পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা ১৪০৬’। প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ‘বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড’ থেকে ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটি সুন্দরবনের প্রাচীন থেকে ব্রিটিশ যুগ ও পরবর্তী স্বাধীনতা পরবর্তী কালে সুন্দরবনের প্রত্নতত্ত্ব, নৃতাত্ত্বিক, সংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলো তুলে ধরেছে । সুন্দরবনের জনপদ, জীবনযাত্রা, চাষবাসের ইতিকথা ইতিহাস উক্ত প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

Frederick Eden Pargiter এর লেখা বই “A Revenue History of the Sundarbans” সম্ভবত প্রথম যা অবিভক্ত সুন্দরবনের ঔপনিবেশিক সময়কালের উল্লেখযোগ্য দলিল, বইটি সুন্দরবনের রাজস্বের ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ১৭৬৫ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ২৪ পরগণা সহ বাখরগঞ্জ, খুলনা, যশোরে ঔপনিবেশিক কালে কিভাবে বদ্বীপ অঞ্চলের গঠন হয় ও সুন্দরবনের ভূমি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করা হত ও বিভিন্ন প্রকারের রাজস্বের বন্দবস্ত হত তার উল্লেখ রয়েছে। বইটি রাজস্ব নীতি এবং সুন্দরবনের উপনিবেশ স্থাপনের মধ্যে সম্পর্কও স্থাপনা করে।

W. W.Hunter এর লেখা “A statistical Account of Bengal, District of the South 24 porganas and Sundarbon” volume-1, 1875 সালে বইটি প্রকাশিত হয়।

তিনি সুন্দরবনের ভৌগোলিক সীমানা, জনবসতি, জমি ও সরকারি রাজস্ব, কৃষি ও কৃষিজমি, ভূমি-মালিক ও কৃষি-শ্রমিক সম্পর্ক, সর্বোপরি তৎকালীন সুন্দরবনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলোকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তুলে ধরেছেন। বস্তুত পক্ষে সুন্দরবন বিষয়ক গবেষণার জন্য তাঁর এই দলিল খুবই মুল্যবান। হান্টার মশায়ের কাছে আমি যেভাবে ঋণী তা হল তাঁর বইটির বিষয়ে জানতে পারি আমার পূর্বের 'সাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে। বিশেষত সুন্দরবন-বাসী হিসেবে বাল্য থেকে কৈশোর কেটেছে সুন্দরবনের জল-কাদায়। ছোট বয়সে বাড়ি থেকে, পরবর্তীতে একটু বয়সে বড়দের সাথে অসম আড্ডা-আলোচনায় ও বিগত M.Phil ও বর্তমান Ph.D-এর বিষয়ে গবেষণার কারণে যে পাঠ্যপুস্তক, মৌখিক ইতিহাস, ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্যদিয়ে সুন্দরবন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি তা আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে হান্টার মশায় অনেকটাই চিত্রায়িত করেছিলেন। সুন্দরবন সম্পর্কে জানতে গেলে অবশ্যই বইটির সাথে পরিচয় হলে গবেষণার গুণমান বৃদ্ধি পাবে বলে আমার মনে হয়। কিন্তু সমসাময়িক সুন্দরবন সম্পর্কে চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি গবেষকদের মধ্যে খুব কমই দেখা গেছে। এটির দুটো কারণ হতে পারে। প্রথমত তাঁর লেখনিগুলো ছিল বরাবর সরকারের 'প্রসাশনিক নোট' বইয়ের আদলে। (সরকারি) তথ্যগুলিকে সরলীলিকরণের মাধ্যমে বইয়ের আকারে প্রকাশিত করেছিলেন। এবং দ্বিতীয়ত তাঁর লেখনি গুলিতে রাজনৈতিক দলিল বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পরিবর্তে গভীর সরকারি সংখ্যা তাত্ত্বিক আলোচনার প্রাধান্য রয়েছে। যে কারণে সাধারণের বোধগম্যের ক্ষেত্রে জটিলতার কারণেও তাঁকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকতে পারে। কিন্তু হান্টারের এই বইটিই সম্ভবত সুন্দরবনের ইতিহাস সম্পর্কে প্রথম সরকারি ভাষ্য। যেহেতু হান্টার ছিলেন তৎকালীন ভারত সরকারের Statistics of India বিভাগের Director General পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তাই তাঁর লেখনির মধ্যে সংখ্যাতাত্ত্বিক ও প্রশাসনিক ঝোঁক যে রয়েছে তা স্বীকার করে নিতে হয়।

সুন্দরবন সম্পর্কে প্রথম কোন উল্লেখযোগ্য দলিল বলা যায় হান্টারের এই উল্লেখযোগ্য বইটি। যেখানে রাষ্ট্রীয় সিমানা, ভূ-সংস্থান-সংক্রান্ত, বসতির ইতিহাস, ভুমি-বণ্টন, কৃষি ব্যবস্থা, কলকারখানার ইতিহাস, সরকারি নীতি, জীবিকা, ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু একই ভাবে বলা যায় হান্টার তৎকালীন সুন্দরবনের যে ভৌগোলিক ব্যপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন,

তা বর্তমান সুন্দরবনের তুলনায় অনেকটাই ছোট। বইটিতে তিনি সুন্দরবন সম্পর্কে বলছেন "great metropolitan District of the 24 parganas and the wild seaboard jungles and solitary swamps of the Sundarban" অর্থাৎ সুন্দরবনকে বলছেন মহানগর, বিস্তীর্ণ জঙ্গল ও নির্জন জলাভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেখানে যাদবপুর, সোনারপুর, হরিনাভি, ডায়মন্ড হারবার ও সাগর দ্বীপ পর্যন্ত উল্লিখিত। অর্থাৎ সুন্দরবনের যে অংশকে হান্টার জঙ্গল ও নির্জন জলাভুমি বলে উল্লেখ করেছেন বর্তমানে সেই অঞ্চলগুলিতে বিস্তীর্ণ জনবসতি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ মাত্র ১৫০ বছর আগে পর্যন্ত আমার গবেষণার যে ক্ষেত্র ও যে জনপদের ইতিহাস আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি (হান্টারের সমসাময়িক সময়ে) তার অস্তিত্ব মেলে না। যদিও ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে ক্রমশ রাজস্বের কারণে সরকারি ভাবে বহু নীতির মাধ্যমে বর্তমান সুন্দবনের সীমারেখা চিত্রিত হয়।

F.D Ascoli র, ১৯২১ সালে লেখা বই "A Revenue History of the Sundarban: From 1879 to 1920" এর মাধ্যমে জানতে পারি, সুন্দরবন সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা, বইটিতে উল্লেখ করা হয় কিভাবে সুন্দরবনকে ধাপে ধাপে জঙ্গল পরিষ্কার করে জনবসতি গড়ে তোলা হয়েছে। এবং জানতে পারি ক্রমে ব্রিটিশ সরকার কিভাবে মানচিত্র অংকন করে, বিভিন্ন লটে ভাগ করে জমিদারদের কাছে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তর করা হয়েছিল। এবং এর ফলে ধীরে ধীরে সুন্দরবনে খাজনা নামক প্রতিষ্ঠানটিকে একটি চলমান ব্যবস্থায় পরিণত করেছিল।

গবেষক দীপঙ্কর সাহা (2015) ভারতীয় সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থা চিরাচরিত শস্য চাষের পরিবর্তনশীলতা নিয়ে আলোচনা করেছে। সুন্দরবনের অবস্থান ও জলবায়ুগত কারণে চাষের খুব একটা অনুকূল পরিবেশ নেই। এই চাষবাসের বেশিরভাগ নির্ভর করে বর্ষার বৃষ্টির জলের উপর। পাশাপাশি লবণাক্ত জল দ্বারা বেষ্টিত নিচু ভূমি হওয়ায় চাষবাসের খুব একটা উপযোগী হয়নি। তাই জনগণ ছোট ছোট চাষাবাদের মাধ্যমে জীবিকা ও জীবনযাপন করে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রবল বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে বর্তমানে কৃষি ক্ষেত্র ও কৃষি কর্মকে প্রবল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই সুন্দরবন অঞ্চলে চাষাবাদের যে ভিন্নমুখী প্রবণতা তৈরি হয় তারই ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই গবেষণা পত্রে। এই সুন্দরবন অঞ্চলে ধান চাষ প্রধান হলেও বর্তমানে স্বল্প

সময়ের বিভিন্ন সবজি উৎপাদিত হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেখা হচ্ছে সুন্দরবনের জলবায়ুতে অনুকূল শস্য খুঁজে বের করার। এ বিষয়ে নিমপিঠ (রামকৃষ্ণ মিশন) এর দীর্ঘ গবেষণা পর আন্তর্জাতিক মানের তুলোর চাষ পরীক্ষায় সফল হয়। তা সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদনের উপদেশ হিসাবে দেওয়া হয়। এছাড়াও উচ্চ জমিতে বর্ষাকালীন বিভিন্ন সবজি চাষের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি শীতকালীন শাকসবজি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সুন্দরবনের কৃষকরা ধানের পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদনে আগ্রহী হন। যা এখানে গবেষক তুলে ধরেছেন।

সুন্দরবন অঞ্চলের চাষাবাদের বহুমুখী উৎপাদন শীলতা আমার গবেষণায় যথেষ্ট সাহায্য করবে। আমার গবেষণার সঙ্গে অনেকাংশে এই গবেষণার সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে এই গবেষণা পত্রে সুন্দরবন অঞ্চলের চাষের বহুমুখী দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। আর আমার গবেষণা পত্রের কাজ হল আয়লা পরবর্তী সময়ে ভূমির বহুমুখী ব্যবহার এর আখ্যান তৈরি করা। যা অনেকাংশে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ।

প্রসেঞ্জিত সারখেল ২০১৫ সালে, ভারতে অবস্থিত সুন্দরবন অঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি ও পরিস্থিতি মোকাবিলার চিত্রটি তুলে ধরেছেন। পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের অবস্থানগত কারণে তার নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। তবে ব্রিটিশ আমল থেকে এই সুন্দরবন অঞ্চলের ১০২ দ্বীপের মধ্যে ৫৪ টি দ্বীপে বর্তমানে মানুষ বাসযোগ্য করে তুলেছে। মানুষ বসবাসের পরপরই জীবিকার চাহিদায় জমি চাষবাসের ব্যবহারযোগ্য করে তোলে। যা তৈরি হয়েছিল সুদূর ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে। তবে বর্তমানে দেখা যায় সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো বন্যা পরিস্থিতি। গবেষক এখানে আইলার মতো বন্যা পরিস্থিতি কে উল্লেখ করেছেন যেখানে এতটাই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল যে ওই অঞ্চলে মানুষদের জন্য খাদ্য পশ্চিমবঙ্গের অন্য রাজ্য থেকে সরবরাহ করতে হয়েছিল। আর এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় জন্য নদী বাঁধ মেরামতি পরিকল্পনা না হয়। যেখানে দেখা যায় সরকারের তরফ থেকে MNREGA মতো দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যেখানে সরকারি প্রকল্পের সাথে ওই অঞ্চলের জনগণ ও অংশগ্রহণ করবে। এর পাশাপাশি সরকার ওই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের জীবিকা অর্জনের জন্য জমির বিভিন্ন রকম ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবে গবেষক এখানে

দেখিয়েছেন যে সুন্দরবন সংরক্ষণ ও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার কাজটি সরকার করে থাকেন। বাকি ক্ষেত্রে সরকার ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের কথা বলেন।

এখানে সুন্দরবন অঞ্চলে মূলত বন্যা পরিস্থিতিতে মোকাবেলায় বিশেষ করে নদীবাঁধ সংরক্ষণের ওপর সরকারি উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করা হয় । এর পাশাপাশি ওই অঞ্চলের জমি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের কথা বলা হয় যা আমার গবেষণায় সাহায়তা করবে।

একটি গবেষণা পত্রে গবেষক অনির্বাণ মুখার্জি ও প্রসেঞ্জিত সারখেল, ২০২১, সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় সরকারের জমি অধিগ্রহণ ও তার ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে বিশেষ করে 2009 এর ঘটে যাওয়া আইলা নামক প্রাকৃতিক দুর্যোগ উল্লেখ করেছেন। এই দুর্যোগে সুন্দরবনে পরিকাঠামো ধ্বংসের পাশাপাশি সরকারী যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতির দিকটিও চোখে পড়ে। সরকার তাই যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও বিপর্যয় মোকাবেলায় নদী বাঁধ তৈরির কাজে জমি অধিগ্রহণ শুরু করে। তবে জনগণ তাদের জমি সরকারকে দিতে ইচ্ছুক ছিল না। তবে লেখক তুলে ধরেন জনগণের স্বার্থে সরকার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পর্কে স্থানীয় রাজনৈতিক নেত্রীবর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (MGNREGA) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act এর মতো সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার সাধারণ মানুষের উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এবং পাশাপাশি বহু সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগও গ্রহণ করে। সরকার ২০১০ সালে জমি অধিগ্রহণ আইন সংশোধন করে। আইলা পরবর্তী সময়ে জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি করে। গ্রামীণ অঞ্চলে রাস্তাঘাট ও নদী বাঁধ উন্নয়নে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করেন। গবেষক এখানে সরকারের এই পদক্ষেপগুলিকে তুলে ধরে আলোচনা করেছেন।

এই গবেষণা পত্রে সরকারিভাবে জমি অধিগ্রহণ করে যে গণপরিকাঠামো তৈরীর ধারণা দেওয়া হয়েছে তা আমার গবেষণার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার গবেষণায় আইলা পরবর্তী সময়ে জমির ব্যবহারের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে । তবে এখানে শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগে যোগাযোগ ও নদী বাঁধের জমির ব্যবহারকে তুলে ধরেছেন।

অরচিতেস পাণ্ডার ২০২০ সালের এই গবেষণা পত্রটি ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগ ও তার ফলে মানুষের অভিবাসন নিয়ে আলোচনা করেছে। উল্লেখ করেছে জলবায়ু পরিবর্তনে উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যা হয়। তবে বৃষ্টিপাতের কারণেই বেশিরভাগ বন্যা ঘটছে। আর এই বন্যার ফলে সাধারণ মানুষ কে ইচ্ছা বা বাধ্য হয়ে তার বাসস্থান ত্যাগ করতে হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন ২০০৮ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর প্রায় ৩৬ লক্ষ মানুষ ভিটেছাড়া হয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তন এর কারণে যে দুর্যোগ সংগঠিত হয় তার জন্য জাতীয় স্তরে আলোচনা ও নীতি নির্ধারণ হলেও অভিবাসন মানুষদের বাসস্থান নিয়ে কোন নির্দিষ্ট জাতীয় নীতি গ্রহণ করা হয়নি। এই বিষয়টি তুলে ধরে তিনি উল্লেখ করেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুতন্ত্রের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে তিনি সুন্দরবনের বদ্বীপ অঞ্চল, উড়িষ্যার উপকূলীয় অঞ্চল ও আসামের মজুলী বদ্বীপ নিয়ে ব্যাখ্যা করেন । এই গবেষণাপত্র টি তে মানুষের, দুর্যোগের ফলে, বাসস্থান ত্যাগকে উল্লেখ করা হয়েছে । আমার গবেষণা মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগের যে পর্যায়ক্রম তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ফলে এই গবেষণা পত্রটি আমার গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে দুর্যোগের পরবর্তী যে বাসস্থান ত্যাগ তার আলোচনা আমার গবেষণার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করবে।

একটি গবেষণা পত্রে পার্থ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৬) ভারতের ঔপনিবেশিক শাসন ও কৃষি ক্ষেত্রে তার প্রভাব নিয়ে মূলত আলোচনা করেছেন। বাংলা বলতে সেই সময় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বর্তমান বাংলাদেশকে একত্রে বোঝানো হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন ভারতের যে সমাজতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা ছিল ব্রিটিশ শাসনকালে তা ধীরে ধীরে বুর্জোয়া কৃষি বা পুঁজিবাদী কৃষি তে পরিণত হয়। পুঁজিবাদী কৃষির মূল ধারণাই হলো বাজারকেন্দ্রিক কৃষি কাঠামো গড়ে তোলা। তাই সরকার ও প্রশাসন ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত করে লাভদায়ক ও বাজার কেন্দ্রিক পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু করল। তবে যে জমিদারী প্রথা চলে আসছিল তার কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে সরকার অর্থাৎ ব্রিটিশরা জমিদারদের নির্দিষ্ট খাজনার মাধ্যমে এই কৃষি কাজ সম্পাদনা করত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো জমির মালিকানা পাওয়ার পর জমিদারেরা খাজনা আদায়ে বদ্ধপরিকর ছিল। কৃষকরা পরিণত হলো চাষের শ্রমিকে। তারা তাদের জমি বিক্রি করতে উদ্যত হয়। সরকার ১৯৩৯ সালে নতুন আইন করে জমি বিক্রয় সহজতরও করে দেয়। তারা শোষণের

বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে যা ধীরে ধীরে গণআন্দোলনের রূপ নেয়। অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এসব আন্দোলনকে যুক্ত করে গণ আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করে তোলে। সরকার তা প্রতিহত করার জন্য দুটি পথ অবলম্বন করে। বাংলায় বেশিরভাগ জমিদার ছিলেন হিন্দু আর মুসলিমরা ছিলেন কৃষক । ফলে জমিদারের প্রতি কৃষকের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে এই গণ আন্দোলন গুলির মুখ অন্যদিকে ঘোরাতে চেষ্টা করে। অন্য রাস্তাটি হল সরকারি দমন পীড়ন। এইভাবে সেই সময় কৃষক আন্দোলন ও ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষি কাঠামোর এক বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

ভারতের ঔপনিবেশিক আমলের কৃষক ও কৃষির এবং সরকারের সম্পর্ক সম্বন্ধে যা উল্লেখ করেছেন তা আমার গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

Judy whitehead, (২০১০) বস্তুস্ত পক্ষে লেখক এই পত্রে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, John Locke এর Property তত্ত্বের প্রভাব ভারতবর্ষের Land settlement উপর কতোটা পড়েছে। ভারতের 1793 এর permanent settlement, Ryotwari settlement of Bombay, এবং Indian Forest Acts 1865 ও 1878 আইন গুলিকে ব্যখ্যার মধ্যে দিয়ে লকের Waste land ও value producing land এর মধ্যে category কে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষ তথা তৃতীয় বিশ্বে waste land এর ধারণা হল পতিত বা অনুৎপাদক জমি। অর্থাৎ যেখানে ফসলের উৎপাদন হয় না বা তুলনামূলক ভাবে কম হয়। কিন্তু Locke মনে করেন wasteland ও ফসলের উৎপাদন হতে পারে। এবং এর ফলে সবার উন্নতি সাধন হতে পারে। অর্থাৎ যতো বেশি wasteland কে productive land এ পরিণত করা যাবে, ততো বেশি মানুষের উন্নতি হবে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এসে যায় যে ভুমি-মালিকের থেকেও ভূমী-হীন শ্রমিকের সংখ্যা যেখানে অনেক বেশি, সেখানে বেশি মানুষের উন্নতি কিভাবে হবে? এই প্রশ্ন থেকেই যায়।

আর এই ক্ষেত্রে লেখক ভারতের ১৭৯৩ সালের permanent settlement এর উদ্দেশ্য বা কাঠামোকে ব্যখ্যা করেছেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ বেঙ্গলে প্রথম জামিদারি প্রথার প্রচলন করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এক খাজনা আদায় করা, এবং দুই এর মধ্য দিয়ে wasteland কে productive land এ পরিণত করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে জমিদার শ্রেণী খাজনা আদায়ে তৎপর হলেও জমির উর্বরতা বাড়াতে বা ফসলের উৎপাদন বাড়াতে কোন উৎসাহ দেখাত না।

কেবল যে কোনো উপায়ে খাজনা আদায় করাই হল তাদের মূল লক্ষ্য। ঠিক এখানেই waste শব্দটির অর্থ কিছুটা পরিবর্তন হতে থাকলো। ইংরেজরা মনে করতে থাকলো ভারতের মানুষরা (জমিদাররা) উৎপাদনশীল নয়। অর্থাৎ যে শব্দটি ভূমির জন্য ব্যাবহার করা হত, তা মানুষের সাথে তুলনা হতে থাকলো। লেখকের মতে এই ভাবে জমিদারদের মধ্যদিয়ে waste শব্দটি এখন এখানকার স্থানীয় মানুষদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল।

আলোচনাটির শেষ অংশে লেখক ভারতের tribe দের উদাহরণ তুলে ধরেন। ইংরেজরা এখন tribe দেরও waste ও savage হিসেবে দেখতে থাকলো। কারণ ইংরেজদের মধ্যে ধারণা হাতে থাকলো যারা জমিকে ভালো ভাবে ব্যবহার করতে জানে না তাঁরা wasteful। সুতরাং এঁরা জমিকে যেহেতু ব্যবহার করতে জানে না তাই তাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হতে থাকলো বা সীমিত জমিতে বেঁধে দেওয়া হল। অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে লেখক দেখানোর চেষ্টা করলেন যে কিভাবে waste এই শব্দটি ভারতে ছড়িয়ে পড়ল।

Utsa Patnaik বর্তমান লেখাটির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, উত্তর উদারনৈতিক রাষ্ট্র কাঠামোর সাথে land property এবং surplus extraction ও পুঁজির আদিম সঞ্চয়ের সাথে ভুমি-হীন শ্রমিকের সম্পর্ক। দ্বিতীয় ভাগে তিনি দেখিয়েছেন, মার্ক্সের ভাবনায় rent কি। অর্থাৎ মার্ক্সের absolute ground rent এর সাথে Ricardo এর rentএর তুলনামূলক ধারণা। এবং তৃতীয় ভাগে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে capitalist producers এর মধ্য দিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের প্রসার ঘটেছে।

লেখক kregg Hetherington piragua এর নাগরিক দের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। ১ এলিট, ২ কৃষক ও ৩ indigenous। পারাগুয়ের প্রেসিডেন্ট ১৯৫৭ এর দিকে কৃষক ও indigenous দের মধ্যে কিছু সরকারী waste জমি শর্ত সাপেক্ষে বিলি করেন। শর্ত ছিল এই রূপ, আগামি দশ বছরে কৃষকরা যদি ভালো ভাবে চাষ করে সরকারকে শর্তানুযায়ি কিছু অর্থ প্রদান করে তাহলে সেই জমির titling উক্ত ব্যক্তির নামে প্রদান করা হবে। এইভাবে সাধারণের জমি গুলি titling হয়। পারাগুয়ে ও ব্রাজিল দুটি পাশাপাশি দেশ। ব্রাজিল থেকে পুঁজিবানরা এসে পারাগুয়েতে জমি কিনলে, স্থানীয় মানুষ অভিযোগ করতে শুরু করে যে তোমরা আমাদের জমিকে privatization করে ফেলছ। লেখকের প্রশ্ন হল যে স্থানীয় এবং ব্রাজিলিয়ান উভয়ের মধ্যে

জমির নিজস্ব titling রয়েছে। অর্থাৎ দুটোই private। তাহলে লেখকের প্রশ্ন হল পারাগুয়ের private কথাটির আক্ষরিক অর্থ কি? লেখক উল্লেখ করেন যে পারাগুয়েতে তিন প্রকারের জমির legality রয়েছে। ১) অর্থের বিনিময়ে জমি কিনে ফসল ফলালেও জমির সত্ত্বাধিকার হিসেবে titling না পাওয়া (use right আছে কিন্তু titling নেই)। ২) জমি নিজেরা চাষ করলেও সেই জমি অন্য কারও কাছে বিক্রি করতে না পারা। এবং ৩) সম্পূর্ণ ভাবে জমির সত্ত্বা ধিকার হিসেবে titling পাওয়া। কিন্তু ব্রাজিলিয়ানরা এই দ্বিতীয় নম্বর জমি গুলো কিনে নিত। যার ফলে তাদের মধ্যে জমির পরিমাণ কমে যায়। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র দুটি পথ অবলম্বন করে; কোর্ট বলে এই জমি কৃষকদের কাছে থাকবে, এবং ওপর দিকে ব্রাজিলিয়ানরা পুলিশ নিয়ে এসে কৃষক দের ওপরে অত্যাচার করে। এলিটরা রাষ্ট্রের সব পায় কিন্তু রাজনৈতিক সমাজ যারা তাদেরকে সম্পদ দিলেও তার ব্যবহারের অধিকার দেয় না। এখানে লেখক বলছেন যে এই ধরনের মানুষরা রাষ্ট্রের ফুল সিটিজেন নয়। রাষ্ট্রের সুবিধার্থে এদেরকে কিছু অধিকার দেয় আবার প্রয়োজনে তা কেড়ে নেয়। এটাকে লেখক বলছে সিটিজেন সিপ হওয়ার জন্য একটি মুভমেন্ট বা প্রসেস। লেখকের মতে এই একই title যদি ভদ্রলোক শ্রেণীর হত তাহলে সেখানে পুলিশ যেতেই পারত না। এই ক্ষেত্রে লেখক আরও গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন স্থানীয় কৃষক দের মধ্যে সম্পত্তির ধারণা সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁরা বলে আমার নামে titling থাকলে সেখানে আর কেউ আসতে পারবে না। এবং কি রাষ্ট্রও নয়। তখন এই ক্ষেত্রে লেখক বলছেন যে আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অর্থ হল কোন নাগরিক সে কতোটা রাষ্ট্রের মেশিনারিকে access করতে পারবে তার ওপরে নির্ভর করছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা। অর্থাৎ লেখকের কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অর্থ হল রাষ্ট্রের access কে ব্যবহার করতে পারা বা না পারা। অপর দিকে বলা যায় যে যে ব্যক্তির কাছে যতো বেশি সম্পত্তি রয়েছে তার নিরাপত্তা ততো বেশি।

লেখক অল্পা সাহা ও বরবরা হ্যারিস (২০১১) এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন ভারতবর্ষ ১৯৭০, ৮০ ও ৯০ এর দশকে কিভাবে একটি Agrarian society থেকে Capitalist Economy এর দিকে অগ্রসর হয়ে কেবল মাত্র শিল্প, কলকারখানার কাঁচামালের উৎসে পরিণত হয়েছে। তাঁরা মনে করেন যে ভারতের কৃষিব্যবস্থা বর্তমানে সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে ধরা না গেলেও pre-capitalist বা semi-feudal অবস্থানের মধ্যে দিয়ে

ব্যখ্যা করা যায়। লেখক এই সময়কালে ভারতের কেন্দ্রীয় কমিউনিস্ট পার্টির, Semi-Feudal ও Semi-colonial ব্যবস্থার প্রতিরোধে কৃষক শ্রেণীর পক্ষে মৌলিক কৌশল গুলির উল্লেখ করেছেন। এই ক্ষেত্রে উনিশ শতকের প্রথম দিকে কৃষি-শ্রমিক ও ভূমি-মালিকের মধ্যে সম্পর্কের নিরিখে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রণী ভূমিকা থাকলেও, তা শতকের শেষের দিকে ফিকে হয়ে যায়। যেখানে 'Land to the tiller' বা 'Feudal authority' র বিরুদ্ধে 'Peoples authority' র যে বক্তব্য বা অবস্থান তার ভিত যেন এখন অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে যায়।

বস্তুস্ত পক্ষে, লেখক ভারত, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ গুলির ক্ষেত্রে বলেন যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি এই সব দেশগুলোর ক্ষেত্রে গ্রামের সাথে শহর বা কৃষির সাথে শিল্পের মৌলিক সম্পর্ক গুলিকে পরিবর্তিত করে চলেছে। লেখক এখানে Henry Bernstein(1996) কথা উল্লেখ করে বলেন যে বিশ্বায়িত অর্থনীতির চমক হল উন্নয়ন শীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে GDP কে দেখানো হয় কেবল মাত্র শিল্প কলকারখানার ভিত্তিতে। যেখানে দেশের কৃষি অর্থনীতির উদ্বৃত্ত গুরুত্ব হীন হয়ে পড়ে। তিনি বলেন যে নয়া উদারনীতি বাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হতে পারে উন্নয়ন শীল দেশের অর্থ নৈতিক পরিকাঠামোয় কৃষির অবস্থানটি ঠিক কোথায়। লেখক এখানে বলেন যে চীনের পরে ভারতবর্ষই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির ছাপ প্রবল ভাবে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৮০ দশকের দিক থেকে ভারতের এই নয়া-উদারনীতি ঝোঁক অর্থনীতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময়ে থেকে নির্দিষ্ট কিছু শিল্প ও কলকারখানাকে লক্ষ্য করে (targeted sectors and Incentivised Industry) শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে যুক্ত করা হয়, একটি Expert Market তৈরি করতে। একই সাথে বিশ্বের বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি গুলি private sector তাদের investment করতে থাকে, যে সময় থেকে শিল্প ও কৃষি অর্থনীতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক ব্যাপক বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। অথচ এই সময়ে ভারতের ৬০% এরও বেশি মানুষ কৃষি বা গ্রামের জটিল অর্থনীতির ওপরে নির্ভর। তিনি বলে যে সবুজ বিপ্লব ও কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার যা ১৯৫০ এর দশকে Land Reform এর মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল ।

'তৃতীয় বিশ্বের উৎপত্তি: বাজার, রাষ্ট্র এবং জলবায়ু' Mike davis (2002) এর এই গবেষণা পত্রের গবেষক তৃতীয় বিশ্বের দেশ অর্থাৎ ভারত ও চীন নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখক মূলত এই দুটি দেশের উপনিবেশিক শাসন এর সময় খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তার উল্লেখ করেন।

ভারত ও চীনের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরা দেখা দেয় তা ধীরে ধীরে খাদ্য সংকটের দ্বারাদুর্ভিক্ষে পরিণত হয়। এই দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে লেখক দুটি দেশের দুর্বল পরিস্থিতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন। যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরা আর খরা থেকে খাদ্য সংকট ও সেখান থেকে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় উনি শতকে মধ্যবর্তী সময়ে তার স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেন। তবে উন্নত বিশ্বের দেশগুলি এই দুর্ভিক্ষের জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলির জনসংখ্যা তুলনায় জমির অভাব ও অনুন্নত প্রযুক্তি কাঠামোকে করেছেন। এক্ষেত্রে লেখক আলোচনা করেছেন ব্রিটিশ আমলে ভারত ও চীনের উপনিবেশিক শাসনকালে এই দুর্যোগ মোকাবিলায় অব্যবস্থা ও উদাসীনতা কে দায়ী করেছেন। তিনি এই অবস্থায় চিত্র তার গবেষণা পত্রে তুলে ধরেছেন। যেখানে একদিকে ভারত ও চীনের খরা খাদ্য সংকট অন্যদিকে উন্নত ইউরোপীয় রা খাদ্য দ্রব্যের উপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করতে শুরু করে। পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসনে আন্তর্জাতিক বাজারকেন্দ্রিক শস্য উৎপাদনে ও চাষীদের উৎসাহারে কর প্রদানের বাধ্যবাধকতা দায়ী করেছেন। ভারত ও চীনের সেই সময়ে পরাধীনতার কারণে আধুনিকতার আঁচ খুব একটা লাগেনি। ফলে খরা প্রতিহতে উন্নত শেষ ব্যবস্থা না থাকায় তারও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে যা দিনে আলোচনা করেছেন। লেখক এই দুর্ভিক্ষ কারণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বভারত ও চীনের মত তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি সম্পর্ক ও সংকট নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন তার গবেষণা পত্র।

'সমসাময়িক সাম্রাজ্যবাদ এবং কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্ন' প্রবন্ধ্যে সমির আমিন (২০১২) উন্নয়ন সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বিশ্বের উন্নত উন্নয়ন দেশের মধ্যে যে শোষণ মূলক সম্পর্ক তার ধারণা কিসের ক্ষেত্রে প্রেক্ষিতে এখানে উল্লেখ করেছেন। তিনি অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে কৃষিকে দুটি ভাগে আলাদা করেছেন। একটি হল পুঁজিবাদী কৃষি ব্যবস্থা যেখানে অল্প সংখ্যক মানুষ, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির দ্বারা কৃষি কার্য করা হয়। ফলে এর উৎপাদন ক্ষমতা বেশি ও খরচের পরিমাণ খুবই কম। অন্যদিকে বিশ্বে প্রায় তিন বিলিয়ন কৃষক অনুন্নত প্রযুক্তি ও দুর্বল যন্ত্রপাতি দ্বারা কৃষি কার্য করে। ফলে এখানে উৎপাদন যেমন কম হয় খরচের পরিমাণও বেশি হয়। ফলে উন্নত পুঁজিবাদী কৃষি ব্যবস্থায় বাজারের বেশিরভাগ অংশ একচেটিয়া দখল করে নেয়। পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্য মূল্য কম হওয়ায় তা উৎপাদন করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো। অন্যদিকে শিল্প ও পরিষেবা মূলক পণ্য গুলির বাজার মূল্য বেশি হওয়ায় তা উৎপাদন করে তৃতীয় বিশ্ব দেশগুলো। ফলে পরিষেবা ও শিল্প পণ্য গুলি উন্নত বিশ্বের কাছ থেকে বেশি মূল্যে কিনতে হয়।

সেই তুলনায় কৃষিজাত পণ্য গুলি খুবই কম মূল্যে উন্নত দেশ নেয়। অর্থাৎ উন্নত বিশ্ব কৃষি ক্ষেত্র তৃতীয় বিশ্বকে ক্রমাগত শোষণ করে চলেছে তারই একটি চিত্র তুলে ধরেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সামির আমিন। তিনি উন্নত বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে যে শোষণ মূলক সম্পর্ক রয়েছে তা কৃষি ক্ষেত্রের দিক থেকে আলোচনা করেছেন।

এই গবেষণা পত্রে সামির আমিন সাম্রাজ্যবাদ কে কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছেন তা আমার গবেষণার জন্য উল্লেখযোগ্য। শোষণের যে ব্যাখ্যা তিনি করেছেন তা সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য। তাই আমার গবেষণার ক্ষেত্রে তার ধারণাটি খুবই সামঞ্জস্য ও গুরুত্বপূর্ণ।

উপরিউক্ত সাহিত্য পর্যালোচনা গুলো সন্দর্ভের সার্বিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও তাত্ত্বিক কাঠামোর জন্য আমরা Ferguson উন্নয়ন তত্ত্ব ও Naomi Klein এর নব্য পুঁজিবাদী অর্থনীতি উত্থানের সমালোচনা মূলক তাত্ত্বিক কাঠামোকেই মূলত ব্যবহার করব, যা আগে উল্লেখিত হয়েছে ।

আর একটু বিশদে বলতে গেলে, পাথরপ্রতিমা ব্লকের কৃষির পরিবর্তনকে আমরা যদি তাত্ত্বিক আকারে বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে সব থেকে গ্রহণ যোগ্য মনে হয় কানাডিয়ান সাংবাদিক নোয়ামি ক্লেইনের লেখা ‘The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism’ বই এর তাত্ত্বিক কাঠামো; এর মাধ্যমেই আইলা পরবর্তী স্থানীয় অঞ্চলের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উত্থানকে সহজে অনুমান করা যায়। বইটির মূল আলোচ্য বিষয় হল, কিভাবে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে দুর্যোগ ও তার ফলে তৈরি হওয়া ‘সংকটকের’ সুযোগ নিয়ে নব্য উদারনৈতিক অর্থ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে । মুলত ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘নিউ অরিলেন্সে’ ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্যারিকেন ক্যাট্রিনা ঝড় ও বন্যার পরবর্তী সময়ে মার্কিন সরকারের পুনর্গঠনের ‘ধরণকে’ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন (পুঁজিবাদী) মুক্তবাজার অর্থনীতির কাঠামোর মাধ্যমে। এই দুর্যোগকে (মার্কিন) অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডমান “অর্থনৈতিক সংস্কারের সুযোগ” হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে “Most New Orleans schools are in ruins,” Friedman observed, “as are the homes of the children who have attended them. The children are now scattered all over the country. This is a tragedy. It is also

an opportunity to radically reform the educational system" Friedman's radical idea was that instead of spending a portion of the billions of dollars in reconstruction money on rebuilding and improving New Orleans' existing public school system, the government should provide families with vouchers, which they could spend at private institutions, many run at a profit, that would be subsidized by the state. It was crucial, Friedman wrote, that this fundamental change not be a stopgap but rather a permanent reform" (ক্লেইন, ২০০৭; পৃঃ ৪,৫)। অর্থাৎ ফ্রেডম্যান মনে করেন যে নিউ অরলিন্সের স্কুলগুলোকে দুর্যোগ পরবর্তী সরকারি তত্ত্বাবধানের পরিবর্তে সেগুলো স্থায়ী ভাবে বেসরকারি করা হোক। এবং ছাত্র ছাত্রির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি 'ভাউচার' দেওয়া হোক। যা দিয়ে তাঁরা তাদের সন্তানদের পড়াশুনোর খরচ চালাবেন । ফ্রিডম্যানের মতে এই পরিকল্পনাই একমাত্র 'স্থায়ী সংস্কার'। ফ্রিডম্যানের প্রস্তাব অনুযায়ি জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রশাসন নিউ অরিলেন্সের স্কুল গুলিকে 'চার্টার্ড' স্কুলে পরিণত করার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে (এই) পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়েছে। এই ভাবে মাত্র ১৯ মাসের মধ্যে সরকারি স্কুলের সংখ্যা ১২৩ থেকে মাত্র ৪ টিতে নেমে আসে। বাকি (স্কুল) গুলোকে চার্টার্ড স্কুলে পরিণত করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে আরও প্রাসঙ্গিক যে, ক্লেইন 'The New York Times'এ উল্লিখিত ফ্রেডম্যানের নেতৃত্বাধীন think tank এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভাষ্য তুলে ধরেছেন। তাদের মতে "the nation's preeminent laboratory for the widespread use of charter schools," while the American Enterprise Institute, a Friedmanite think tank, enthused that "Katrina accomplished in a day . . . what Louisiana school reformers couldn't do after years of trying." Public school teachers, meanwhile, watching money allocated for the victims of the flood being diverted to erase a public system and replace it with a private one, were calling Friedman's plan "an educational land grab" (ক্লেইন, ২০০৭; পৃঃ ৫,৬)। ফ্রিডম্যানের মতে রাষ্ট্র পরিচালিত স্কুল ব্যবস্থা হল সমাজতান্ত্রিক ধারণা ও বিনা মুল্যে শিক্ষা প্রদানের অর্থই হল অন্যায্য ভাবে বাজারে হস্তক্ষেপ করা। অর্থাৎ নব্য পুঁজিবাদী ব্যবাস্থাকে পরিচালিত করার জন্য দরকার ছিল একটি ধাক্কা-র (shock)। আর সেই কাঙ্ক্ষিত

সুযোগ হল ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে নিউ অরলান্সের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্যারিকেন ক্যাট্রিনার ধাক্কা। যা বছরের পর বছর লুইসিয়ানের স্কুল গুলোর ওপরে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা মূলক বিভিন্ন সংস্কারেরর পরেও বাস্তবাহিত করা যায়নি। যা হ্যারিকেন ক্যাটরিনার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেই সুযোগকে এনে দিল। অর্থাৎ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নিউ অরলান্সের সরকারি স্কুলের পরিবর্তে চার্টার্ড স্কুলগুলো দেখালো দুর্যোগকে ব্যবহার করে কি ভাবে নব্য উদারনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়; (এটি ছিল) তারই একটি 'পরীক্ষাগার'। অর্থাৎ এই পরীক্ষাগারের অভিজ্ঞতা থেকে নতুন নতুন অঞ্চলে নতুন নতুন ভাবে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে নব্য উদারনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিচালিত করাই হল পুঁজিবাদের মূল উদ্দেশ্য। যাকে ক্লেইন বলেন, "I call these orchestrated raids on the public sphere in the wake of catastrophic events, combined with the treatment of disasters as exciting market opportunities, "disaster capitalism." (ibid;) ক্লেইনের মতে ফ্রিডম্যানের বিভিন্ন অনুসারিদের মধ্যে রয়েছেন কয়েকজন মার্কিন রাষ্ট্রপতি, রাশিয়ান অভিজাত, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, তৃতীয় বিশ্বের কিছু একনায়ক নেতা, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সচিব, পোলিশ অর্থমন্ত্রী, মার্কিন ফেডারেল ব্যাংকের কিছু আধিকারিক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের পরিচালকরা যারা সযত্নে ফ্রিডম্যান পরিচালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিচালিত করেছেন। এইভাবে দুর্যোগের মতো সংকটকের ফলে নাগরিক জীবনে যখন হঠাত করে এক 'কম্পন বা shock' তৈরি হয় তখন নিখুঁত কৌশলের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কিছু অংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দেয়। এবং সঙ্কট কালীন কিছু যুক্তিকে ব্যবহার করে ধীরে ধীরে সমাজ ব্যবস্থায় 'স্থায়ী সংস্কার' হিসেবে প্রোথিত করে।

এর নিদর্শন প্রথম দেখা যায়, গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে চিলিতে। যখন একনায়ক জেনারেল আগাস্টো পিনোশেটের উপদেষ্টা হিসেবে ফ্রিডম্যান নিযুক্ত হয়ে পরামর্শ দেন কিভাবে একটি ধাক্কা বা সংকটকে ব্যবহার করতে হয়। এর পরেই পিনোশেটোর সহিংস অভ্যুত্থানের ফলে একদিকে জনগণ যেমন হতবাক, বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন তেমনি দেশের মুদ্রাস্ফীতিও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এই সুযোগে ফ্রিডম্যানের পরামর্শে পিনাসেটো দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য কর আদায়, মুক্ত বাণিজ্য, সামাজিক ব্যায় হ্রাস, বেসরকারী পরিষেবা প্রদান শুরু করেন । এই ভাবে একে একে ১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড যুদ্ধ, ১৯৮৯ সালে চীনের তিয়ানানমেন স্কয়ারের

গণহত্যা, ১৯৯৩ সালে রাশিয়ায় বরিস ইয়েলৎসিনের সংসদ ভবনে আগুন লাগানোর পরিকল্পনা, ১৯৯৯ সালে বেলগ্রেডে ন্যাটোর আক্রমণ, ২০০১ সালে নিজ (মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্র) দেশে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার পর, ২০০৩ সালে ইরাকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ২০০৪ সালে শ্রীলংকায় সুনামির আঘাতের পরের ব্যবস্থা , ক্লেইনের মতে এই প্রত্যেকটি ঘটনার পরে অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলন ঘটেছিল। উপরিউল্লিখিত এই তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে ২০০৯ সালের ঘটে যাওয়া আইলার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে একই ভাবে স্থানীয় অর্থ রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে দেখি।

অধ্যায়ের শুরুতেই উল্লেখ করেছি আইলা পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনে উন্নয়নের যে ধরণ তা নব্য পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোরই এক রূপ হিসেবে পরিগণিত করা যায়। যা আইলা দুর্যোগের ফলে স্থানীয় মানুষের মনে হঠাৎ যে অভিঘাতের (shock) সৃষ্টি হয় তারই সুযোগে কিছু মুনাফা লোভী বিভিন্ন গোষ্ঠী সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প পরিচালিত করে। আর এই প্রকল্প গুলোর মাধ্যমে স্থানীয় অঞ্চলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কর্মক্রিয়া শুরু হয় । আইলার ক্ষেত্রে যেমন নদী বাঁধের উন্নয়নে প্রকল্পের কথা উল্লেখ করতে পারি। এবং যা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় কৃষি ক্ষেত্রেও পুঁজিবাদী উত্তরণের সঞ্চার করে । তাই আমরা প্রথমে নদীবাঁধের মেরামতের প্রকৃতি বিশ্লেষণের পরে কৃষি ব্যবস্থার সংস্কারের বিষয়ে আলোকপাত করব।

গবেষণার ফাঁকঃ-

উপরিউক্ত সাহিত্য পর্যালোচনা ও আইলা পরবর্তী ভারত ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যে গবেষণা ধর্মী বিশ্লেষণ গুলো হয়েছে, তাতে উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গুলির ফলে কিভাবে কৃষির পুরনো ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি নতুন পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবকাঠামো গঠন হয়েছে, এই সম্পর্কিত তাত্ত্বিক গবেষণার ঘাটতি আছে বলে মনে করি। ২০০৪ সালে সুনামির পরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রীলংকার উপকূলীয় অঞ্চলের স্থানীয় জনবসতিকে উৎখাত করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কিছু বৃহৎ কোম্পানিগুলো হোটেল, রেস্ট্রুরেন্ট এই ধরনের বিনোদনের কেন্দ্র (park) গড়ে তোলার চেষ্টা কে Naomi Klein নব্য পুঁজিবাদী উত্থানের একটি প্রকৃষ্ট

উদাহরণ বলে মনে করেন। তথাপি বলা যায় উপকূলীয় অঞ্চল হলেও কৃষি পরিবর্তনের কোনও উল্লেখ আমরা পাইনা। তা ছাড়া আর কোন সাহিত্য, প্রবন্ধ, কিংবা গবেষণা ধর্মী কোনও পুস্তক বা সাহিত্যে দুর্যোগের পরবর্তী উন্নয়ন কল্পের ফলে স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তিত রূরুপ সম্পর্কে আলোচনার উল্লেখ দেখা যায়নি। যেমন Dayabati Roy এর লেখা 'Disaster, appropriation, and displacement in the Indian sundorbans' নামক প্রবন্ধে বোঝার চেষ্টা করেছেন দুর্যোগ কি? এবং স্থানীয় অর্থরাজনীতি কিভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রভাব ফেলে। কিংবা একটি দুর্যোগের পরিণতি হিসেবে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এই প্রবন্ধটি আমার নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্রকর্মের উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে বোঝা যায় যে দুর্যোগ কী এবং ২০০৯ সালের মে মাসে দক্ষিণ এশিয়ায় ঘূর্ণিঝড় আইলার প্রেক্ষাপটে পূর্ব-বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতি কীভাবে ঘটনাগুলিকে রূপ দিয়েছিল। তিনি দেখার চেষ্টা করেছেন দুর্যোগের পরে ত্রাণের কোণ নির্দিষ্ট form ছিল কিনা। অর্থাৎ ত্রাণের ফলে কি কোনও নতুন বৈষম্যের সূচনা হোল? একই সাথে, বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার একাধিক রূপ বাস্তবায়িত হয়েছিল দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ প্রদানের ক্ষেত্রে। দুর্যোগের গতিশীলতা সম্পর্কে কিভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 'ভালোভাবে পুনর্নির্মাণের' নামে কৌশলগতভাবে দুর্যোগকে ব্যবহার করেছেন তারও আভাস ছিল। এই ভাবে তিনি দেখান কিভাবে এই ঘটনাগুলি দুর্যোগের পরিণতির সাথে যুক্ত। এই প্রবন্ধটি আরও ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের ভাবনা এবং এর বিপরীতে ভূমি ব্যবহারের ধরণ ও সম্পদ আহরণের ধরণগুলিকে গঠন করে। তাছাড়া সোউমেন ঘোষ ও অন্যান্যরা (২০২০) আইলা পরবর্তী গোসাবার কৃষি ব্যবস্থায় কি প্রভাব পড়েছে তার গবেষণা ধর্মী আলোচনা করেছেন। এই ক্ষেত্রে কৃষি জমির লবণ জলের দ্বারা প্লাবিত হওয়ায়, স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থার ওপরে কিরূপ প্রভাব পড়েছে তার পর্যালোচনা করেছে। আন্নু জালাই ও অমিতেশ মুখোপাধ্যায় ২০২০ সালে 'Of Pandemics and Storms in the Sundarbans' নামে প্রবন্ধে দুর্যোগের সাথে স্থানীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক, এবং সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদাসীনতা, নদীবাঁধের রাজনীতি, অভিবাসন, ভূমি অধিগ্রহণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুঁজির উত্থান ও উন্নয়নের রাজনীতি নিয়ে আলোকপাত করেছেন।[১৯] তথাপি কৃষি উৎপাদন, বাজার, এবং উন্নয়নের নির্দিষ্ট ফর্মের চরিত্র ও অবকাঠামোগত

[১৯] https://americanethnologist.org/online-content/collections/intersecting-crises/of-pandemics-and-storms-in-the-sundarbans/

পরিবর্তন এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা গুলোরও প্রয়োজন রয়েছে। এইরূপ কয়েকটি প্রবন্ধ আইলা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় সমাজ-অর্থনীতি, ও কৃষি ক্ষেত্রে কিরূপ প্রভাব পড়েছে তার উল্লেখ করলেও দুর্যোগের ফলে পাথর প্রতিমা তথা সমগ্র সুন্দর বনে কিভাবে পুঁজির উত্থান ঘটছে, এই বিষয়ে গবেষণার উল্লেখ কমই হয়েছে বলে মনে করি। এই প্রেক্ষিতে আমার গবেষণার প্রেক্ষাপট একটি মৌলিক অবদান রাখবে বলে মনে করি।

গবেষণা প্রশ্নঃ-

বর্তমান সন্দর্ভে আমি মোট তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্থাপন করে ও তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।

১) এই ধরণের দ্বীপময় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ঘটনা ছাড়া কি রাষ্ট্রের উপস্থিতি ঘটে না? এই ক্ষেত্রে আমি James Scott এর লেখা বই 'Seeing like A state' এর মাধ্যমে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি আইলা উত্তর সুন্দরবনে ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উপস্থিতি ঘটেছে। এবং কিভাবে রাষ্ট্র একটি সরলীকরণের মাধ্যমে সুন্দরবনের নিজস্ব জটিলতা ও তার সমাধানের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট বিশ্বায়িত তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন কানুন পরিচালনা করছে।

২) দুর্যোগ কবলিত এই ধরণের একটি অঞ্চলে উন্নয়নের নামে ব্যাপক সরকারি প্রকল্প কি সঠিক নীতি?

৩) আইলা উত্তর পাথরপ্রতিমা ব্লকের উন্নয়নের যে প্রকৃতি আমরা দেখছি তা কি সুন্দরবনের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য সঠিক নীতি? নাকি আইলা কে একটি ঘটনা হিসেবে ব্যবহার করে পুঁজির উত্থান ঘটানোই মূল উদ্দেশ্য? এই বিষয়ে Ferguson এর উন্নয়নের তত্ত্ব ও Naomi

Klein এর দুর্যোগের ফলে কিভাবে পুঁজির উত্থান ঘটে তার তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে বর্তমান প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।[২০]

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ-

সুন্দরবনের মধ্যে সব থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে অনুন্নত অঞ্চল হল পাথর প্রতিমা ব্লক। যে কারণে সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উক্ত অঞ্চলটির সম্পর্কে পাঠকের কাছে তুলে ধরার মতো আলোচনা হয়ে উঠতে পারেনি। অঞ্চলটি উপকূলবর্তী ও মূল ভূখণ্ড থেকে পৃথক হওয়ায় আইলা পরবর্তী বিভিন্ন উন্নয়ন কল্পে রাষ্ট্রের ব্যাপক উপস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করব, যে রাষ্ট্র এই ধরণের একটি অনুন্নত অঞ্চলকে কিভাবে দেখে বা রাষ্ট্রের উপস্থিতির মূল উদ্দেশ্য কি? এবং আরও বোঝার চেষ্টা করব যে উন্নত দেশের উন্নয়নের মডেল আদপেও কি সুন্দরবনের মতো একটি তৃতীয় বিশ্বের অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

এই প্রেক্ষাপটে আমার গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো হল

১) সুন্দরবনের উপকূলীয় মৌজাগুলোতে আইলা উত্তর উন্নয়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

২) প্রচলিত উন্নয়ন তত্ত্বের আলোচনা ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা।

৩) উন্নয়নের স্থানীয় ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের তুল্যমূল্য বিশ্লেষণ করে বিকল্প মডেলের অনুধাবন করা।

গবেষণা পদ্ধতিঃ-

কোন একটি অঞ্চলে সাবেকী সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের চরিত্র গবেষণার জন্য অবশ্যই সেই অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিকগত ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজন বলে মনে করি। এই সূত্রে আমি

---

[২০] Ferguson, James.1994. The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho' University of Minnesota Press. ও Klein, Naomi. 2007. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. Picador.

সুন্দরবনের আইলা পরবর্তী উন্নয়নের জরীপে গুণগত (Qualitative) পদ্ধতির ব্যবহার করে একটি নিগুড় ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি।

পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি-প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতে আমার বাড়ি হওয়ায় ক্ষেত্র সমীক্ষার মৌজা-গুলোর সাথে একটা পূর্ব পরিচিতি রয়েছে। অধ্যয়ন ও কর্মজীবনের জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস করলেও নাগরিক হিসেবে এখনো আমি এই গ্রামেরই বাসিন্দা। এই সুবাদে ব্লকের কিছু নিচুস্তরের আমলা ও রাজনীতিবিদের সাথে যোগাযোগ থাকায় তথ্য সংগ্রহ করতে কিছুটা সহযোগিতা পেয়েছি। প্রথমে ব্লকের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা জেনে নেব। পাথরপ্রাতিমা ব্লকে মোট ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯২টি মৌজার মধ্যে প্রায় ৭৩ টি মৌজায় ২০০৯ সালে আইলার কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আমার ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা যায় যেসমস্ত মৌজা আইলার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সমস্ত মৌজায় কৃষি ব্যবস্থা ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক রাজনীতির ওপর দুর্যোগের স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। এই এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা হল কৃষিকাজ। প্রায় ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষ কৃষিকাজে যুক্ত। আদ্র জলবায়ু ও লবণাক্ত মৃত্তিকা হওয়ায় কৃষি উৎপাদন রাজ্যের অন্যান্য (এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কেবল পাহাড়ি অঞ্চল ব্যতীত বাকি সমস্ত সমতলভূমি অঞ্চলের কৃষির সাথে তুলনা বুঝিয়েছি) জেলার থেকে অনেকটা কম। গাঙ্গেয় নিম্নভূমি হিসেবে পরিচিত সুন্দরবন দীর্ঘদিন ধরে পলি জমা এঁটেল ও লবণাক্ত মাটি দ্বারা গঠিত ভূভাগ। ফলত সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষি বলতে বর্ষার জলের দ্বারা সেচিত আমন (জুন-জুলাই থেকে অক্টোবর-নভেম্বর পর্যন্ত) ধানের চাষই বোঝায়। যেহেতু সুন্দরবনের সমগ্র ভূ-ভাগ লবণাক্ত তাই বোরো ও আউশ ধানের চাষ হয়না বললেই চলে।

এইরূপ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে আমার বোঝার বিষয়টি হল পাথরপ্রতিমায় দুর্যোগের ফলে নানা প্রকার কাঠামোর (বিশেষত রাজনীতি-অর্থনীতি) যে পরিবর্তনগুলো ঘটলো, তার সাথে দুর্যোগ পরবর্তী রাষ্ট্রীয় নতুন নিয়ম নীতির সম্পর্ক ঠিক কোথায়? প্রাকৃতিক দুর্যোগ আইলার আগে ও পরে রাষ্ট্রের সাথে স্থানীয় মানুষের সম্পর্ক কেমন ছিল? অর্থাৎ দুর্যোগ যদি না ঘটত তাহলে কি রাষ্ট্রীয় আদলে এই পরিবর্তনগুলো ঘটত না? এই রূপ নানা প্রকার প্রশ্নকে সামনে রেখে আমি আমার গবেষণার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছি। গবেষণার প্রারম্ভে

অবশ্যই পাথরপ্রতিমার ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক অবস্থানের সংক্ষিপ্তকারে ব্যাখ্যা করে নেওয়া প্রয়োজন।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে পাথরপ্রতিমা ব্লকটি ৪৮৪.৪৭ বর্গকিলোমিটার (নামখানা ৩৭০.৬১, সাগর ২৮২.১১)। মূল ভূমিসহ মোট ১২টি ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে একেবারেই বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থান করছে বর্তমান ব্লকটি। মূল ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন এই ১২টি দ্বীপে মানুষের বসতি রয়েছে যথেষ্ট। যার উত্তরে মথুরাপুর ১ ও ২, উত্তর-পূবে রায়দিঘি ব্লক, পূর্বে ম্যানগ্রোভের ঘন জঙ্গল, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে নামখানা, কাকদ্বীপ ও সাগর ব্লক অবস্থান করছে। প্রশাসনিক দিক থেকে পাথরপ্রতিমা ব্লকটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। কাকদ্বীপ মহকুমার অধীনে, পাথরপ্রতিমা, ঢোলাহাট ও গোবর্ধনপুর কোস্টাল পুলিশ থানা নিয়ে পাথরপ্রতিমা ব্লকটি অবস্থান করছে। ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১৮৭টি গ্রাম সংসদ (গ্রাম পরিষদ), ৯২টি মৌজা ও ৮৭টি (বসতি) গ্রাম নিয়ে গঠিত। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পাথরপ্রতিমা ব্লকের মোট জনসংখ্যা হল ৩৩১,৮২১ (নামখানা ১৮২,৮৩০, সাগর, ২১২,০৩৭ মোট জনসংখ্যা)। তার মধ্যে পুরুষ ১৬৯,৪২২ (৫১%) ও মহিলা ১৬২,৪০১ (৪৯%)। জনজাতির হিসেবে তপসিলি জাতি ৭৬,১৬৩ (২২.৯৫%) ও তপসিলি উপজাতির ২৬৪০ (০.৮০) মানুষ এই ব্লকে বসবাস করেন।

আমার গবেষণার সুবিধার্থে পাথরপ্রতিমা ব্লকে আইলা ঝড়ে সম্পূর্ণ ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত এমন ৪টি মৌজার মোট ৩০০ জন উত্তর দাতাদের ছোট, মাঝারি ও বড় কৃষক পরিবারে ভাগ করে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি। এই ব্লকটির প্রায় ৭০% অঞ্চল বিছিন্ন দ্বীপ নিয়ে গঠিত। তাই আমার গবেষণায় সুবিধার জন্য মূল ভূখণ্ড ও বিছিন্ন দ্বীপ থেকে দুটি করে মৌজা নির্ধারণ করেছি। এই মৌজাগুলি হল (বিছিন্ন দ্বীপে) জি-প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণদাসপুর ও ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গোবিন্দপুর সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত মৌজা। মূল ভূমির আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত মৌজাগুলি হল, দিগম্বরপুর গ্রামপঞ্চায়েতের পার্বতীপুর ও হেরম্বগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেরম্বগোপালপুর। সরকারি তথ্য হিসেবে ‘ব্লক কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক’ও ‘ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস’থেকে কৃষি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করেছি। এই ক্ষেত্রসমীক্ষাটি করেছি ২০১৯ সালের মে-জুন থেকে ২০২২ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে আমন ধানের চাষ

পর্যন্ত, তবে একটানা নয়, থেমে থেমে। কারণ এখানে বলে রাখা ভালো, আমার ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়কালে প্রায় বেশিরভাগ সময় অতিমারি কোভিড-১৯ থাকার কারণে সরকারি অফিস ও দূরদূরান্তের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। যে কারণে এই সময়ে আমি স্থানীয় অঞ্চলের ছোট, বড় ও মাঝারি বিভিন্ন বয়সের কৃষকের সাথে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে কথোপকথন ও আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছি। কখন কখন সেই আলোচনা আরও সমৃদ্ধি পেয়েছে কৃষক পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ, বৃদ্ধা (কৃষক) ও গৃহিণীদের সাথে আলাপচারিতায়। কারণ তা না হলে কৃষকের ও কৃষি ব্যবস্থায় 'সমাজ তত্ত্বের' দিকটির ঘাটতি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ কৃষি ব্যবস্থায় বা আরও ভালো করে বললে বলতে হয় কৃষির "উৎপাদন ব্যবস্থায়" কৃষক পরিবারের এই মানুষগুলো হল এক প্রকার 'উৎপাদন সম্পর্কের' বিশেষ উপাদানও। আবার কখনও কখনও স্থানীয় বাজার বা হাটে গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি শস্য কিভাবে পণ্যে রূপান্তরিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় বাজার থেকে অ-প্রাপ্ত তথ্য সম্পূর্ণ করেছি স্থানীয় বা পাশের ব্লকের বৃহৎ বাজারে। সেখানে কথা বলেছি বড় সবজি আড়তের মালিক থেকে ধানের কারবারির সঙ্গে, কখনও বা পৌঁছে গেছি ধান মিলের শ্রমিক ও মালিকের কাছে। কখন পৌঁছে গেছি সবজির নৌকো-গাড়ি-ট্রেনে করে নামখানা থেকে শিয়ালদা স্টেশনের কাছে 'কোলে মার্কেটে'।

এই কোলে মার্কেটে কানপাতলে শোনা/বোঝা যায় উৎপাদন ব্যবস্থা বা উৎপাদন সম্পর্কের একেবারে বাইরে অবস্থানকারী এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী রয়েছে যারা ছোট ছোট হাট বা বৃহৎ বাজার শুধু নয় ব্লক, জেলা ছাড়িয়ে এদের কায়েমি সত্তা চলে রাজ্যের বাইরে ভিন্ রাজ্যেও। এই শ্রেণীর হাতেই রয়েছে কৃষি পণ্য ও বাজারদরের সমগ্র লাটাই। এই শ্রেণীর মুনাফার এতটাই বহর যে কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের শত যোজন দূরে থেকেও কৃষি 'ব্যবস্থা' এদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখেছি সরকারি অফিসে নানান প্রয়োজনীয় নথি নেই। শতাংশের হিসেবে ধরলে ৩০ ভাগও উক্ত অফিসগুলো থেকে সরকারি নথি পাওয়া যায়নি। এইসব প্রয়োজনীয় নথির অভাবের কারণ হিসেবে আধিকারিকরা জানিয়েছেন ক্রমশ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের নানান (জনমোহিনী) কৃষি প্রকল্প ও বিভাগীয় কর্মচারীর অভাবে তারা সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করতে পারেননি।

আমার গবেষণার সুবিধার্থে ক্ষেত্রসমীক্ষার কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে ধরলে বিষয়টি বুঝতে অনেকটাই সুবিধা হবে বলে মনে করি। মোট ১২০টি পরিবারে ৩০০ জনের বেশি কৃষকের সাথে আলাপ আলোচনা করেছি। এই ৩০০ জনের মধ্যে ১৬ জন মহিলা কৃষক। এই মহিলা কৃষকের মধ্যে বেশিরভাগ হয় তাঁদের স্বামী বাড়ির বাইরে জীবিকার স্বার্থে রয়েছেন কিংবা কেউ অসুস্থ বা কেউ মৃত। বাকি ২৮৪ জন কৃষকের মধ্যে সিকি ভাগ রয়েছেন দ্বিতীয় প্রজন্মের কৃষক। বাকিরা প্রথম প্রজন্মের ও তৃতীয় প্রজন্মের কৃষক।

উক্ত ৪টি মৌজায় ক্ষেত্রসমীক্ষার ফল আমি দুটি ভাগে ভাগ করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। এই দুটি ভাগ হল প্রথমত, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের কৃষক এবং দ্বিতীয়ত, মহিলা ও তৃতীয় প্রজন্মের কৃষক। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের কৃষকরা এক প্রকার বাধ্য হয়ে কৃষিকাজ করেন। অর্থাৎ কৃষিতে উৎসাহ কম বললেই চলে। তাদের পারিবারিক যে জমি আছে তাতে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাওয়ার যোগান ও কোন কোন বছর চাষ ভালো হলে উপরি অর্থের যোগান এবং সরকারি (কৃষি) প্রকল্পের সহযোগিতায় কোন প্রকার অভাব অনটনে জীবিকা অতিবাহিত করেন। তুলনামূলক ভাবে মহিলা ও কমবয়সী তৃতীয় প্রজন্মের কৃষকের মধ্যে কিছুটা হলেও কৃষি নিয়ে নতুন নতুন উৎসাহ রয়েছে। উচ্চ ফলনশীল বীজ, নতুন শস্য, বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ফসল চাষ, প্রযুক্তির ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষি বাজারের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন রাস্তা দেখানোর ইচ্ছা এদের মধ্যে রয়েছে। এদের মধ্যে ধান চাষের তুলনায় নতুন সবজি ও ফলের উৎপাদনের প্রতি বেশি ঝোঁক রয়েছে। তবে এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তা হল, তৃতীয় প্রজন্মের নতুন কৃষকদের মধ্যে এই উৎসাহ আশাব্যঞ্জক হলেও তা সীমিত রয়েছে মূলত মূল ভূমির দুটি মৌজার মধ্যে। বিছিন্ন দ্বীপের মৌজাগুলোর ক্ষেত্রে চিত্রটা একেবারেই হতাশার। উক্ত দুটি মৌজাতে (কৃষ্ণ দাসপুর ও গোবিন্দপুর) একজনও তৃতীয় বা নতুন প্রজন্মের কৃষক পেলাম না যারা উৎসাহ নিয়ে চাষ করছে। এই চিত্র সুন্দরবনের সমগ্র (বিছিন্ন) দ্বীপাঞ্চলে দেখা যায়।

এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছি আলিপুর মহকুমা অফিস থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত নানান সরকারি দপ্তর থেকে। কখনো কখনো প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ করতে যেমন ঘুরেছি এক অফিস থেকে অন্য অফিস, তেমনি আবার কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি বন্ধুভাবাপন্ন সরকারি আমলা, কেরানি ও

রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকেও। তাছাড়াও আইলা পরবর্তী উন্নয়ন ও কৃষির রাপান্তরের প্রকৃতিকে বোঝার জন্য স্থানীয় অঞ্চলে ২০১৯ সালের মে-জুন থেকে ২০২২ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাস পর্যন্ত নির্দিষ্ট গঠনমূলক ক্ষেত্রেসমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করলেও, বিভিন্ন সময়ে অসংগঠিত ভাবেও নানান তথ্য সংগ্রহ করেছি, ব্যাক্তিগত ও সমষ্টিগত আলাপ আলোচনায়, প্রশ্নপত্র ও ব্যাক্তিগত উপস্থিতির সময়ে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করেছি। আবার গবেষণা ধর্মী অধ্যয়ন, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন, আইনি নথী, সংবাদ পত্রের প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করেছি।

অধ্যায় বিন্যাসঃ-

সন্দর্ভটি প্রেক্ষাপট, ভূমিকা ও উপসংহার বাদে মূল তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রেক্ষাপটে আমরা আলোকপাত করেছি ঠিক কোন রাজনৈতিক পরিবেশে সুন্দরবন বর্তমান উন্নয়নের একটি মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভূমিকাতে আমরা আলোচনা করেছি সুন্দরবনের পরিচিতি সম্পর্কে। যেখানে পাথরপ্রতিমার প্রশাসনিক গঠন ও স্থানীয় মানুষের বসতি গড়ে তোলার ইতিহাস তুলে ধরেছি।

প্রথম অধ্যায়ে, এর শিরনাম **‘কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি’**। এই অধ্যায়ে তুলে ধরেছি, কিভাবে জঙ্গল কেটে, নদীবাঁধ তৈরি করে কৃষি কাজ গড়ে উঠেছে। এবং দীর্ঘ দিনের সেই প্রথাগত কৃষি সংস্কৃতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা কিভাবে আইলা দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত হয়ে একটি আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অবকাঠামো তৈরি হচ্ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এর শিরোনাম **‘আইলা উত্তর ভূমি রাজনীতি’**। এই অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি, কিভাবে বসতি গড়ে ওঠার সময় থেকে জমির ব্যবহার, জমির আদানপ্রদান ও রাষ্ট্রীয় স্বত্বাধিকারের বিষয় গুলো আইলা পরবর্তী স্থানীয় উন্নয়ন প্রশ্নে পরিবর্তন হয়ে সম্পদের ধারণায় বদল আনছে, এবং রাষ্ট্রের সাথে জমি কেন্দ্রিক আইন কানুন সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন ঘটছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে, এর শিরোনাম **'দুর্যোগ ও পুঁজির উত্থান'**। এই অধ্যায়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করছি আইলা পরবর্তী সময়ে পাথরপ্রতিমার উন্নয়ন প্রকল্পের ফলে কিভাবে পুঁজির উত্থান ঘটছে। এই পুঁজির উত্থানের ক্ষেত্রে আমরা উন্নয়নের দুটি তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করেছি। একটি হল Ferguson এর 'উন্নয়নের তত্ত্ব' ও অপরটি হল Naomi Klein এর 'দুর্যোগ ও পুঁজির উত্থান' তাত্ত্বিক যুক্তিগুলো।

প্রথম অধ্যায়

কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি

কৃষি পরিচিতিঃ-

এই অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি সুন্দরবনের বিশেষভাবে আমার ক্ষেত্রসমীক্ষার গ্রামগুলির কৃষি অর্থনীতির কাঠামো ও তার রূপান্তরের প্রকৃতি নিয়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে ক্রমশ গ্রামীণ ভারতের কৃষি অর্থনীতি তার নিজস্বতা হারাচ্ছে। এই কারণে (ভারতের) আগামী প্রজন্ম কৃষির সাথে আর যুক্ত হতে চাইছে না। কারণ বর্তমানে কৃষি ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য আয়ের সম্ভবনা কম বললেই চলে। ভারতে এই তথ্য সর্বজনবিদিত। Vachaspati Shukla তার লেখা 'How Much do Agricultural Households Earn from Farming'?[২১] প্রবন্ধ্যের মূল আলচ্য বিষয় হল ভারতের কৃষক পরিবার কৃষি থেকে কত আয় করে এবং এই আয়ের বণ্টন কেমন? ২০১৯ সালের ভারতের National Sample Survey (NSS) ৭৭ তম রাউন্ডের তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুক্লার এই লেখার মাধ্যমে আমরা ভারতের কৃষক সমাজের কঙ্কালসার পরিনতি ছবিটি দেখতে পায়। NSS এর তথ্য অনুযায়ী ভারতে একটি কৃষক পরিবার বছরে যদি ৪০০০ টাকার কৃষি উৎপাদন করতে পারে ও সেই পরিবারের যদি একজন ৩৬৫ দিন কৃষি কাজের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে সেই পরিবার হবে কৃষক পরিবার। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে ভারতে ৫৪% পরিবার কৃষি পরিবারের অধীন পড়ে। ৩৮.৮% পরিবারের জীবীকার প্রধান উৎস হল কৃষি। ৩১% পরিবার তাদের মোট আয়ের ৫০% বা তার বেশি কৃষি থেকে পায়। এবং মাত্র ২১% পরিবার সম্পূর্ণ কৃষি কাজের ওপর নির্ভরশীল। ভারতে একটি কৃষক পরিবারের গড় আয় ১০৬৯৫ টাকা (কৃষি ৫২৯৮ ও অকৃষি থেকে ৫৩৯৭ টাকা)। সুতরাং ভারতের গড় আয় দেখে

[২১] The Indian forum. (2024). 'How Much do Agricultural Households Earn from Farming'? https://www.theindiaforum.in/sites/default/files/article_pdf/2024/02/16/1514-1708051412.pdf

যদি মনে করা হয় কৃষি ক্ষেত্রে আয় বেড়েছে তাহলে বিষয়টি ভুল হবে বলে লেকক মনে করেন। কারণ ভারতে কৃষি পরিবারের এই গড় আয় খুবেই বৈসাম্য মূলক। কারণ ভারতে মাত্র ১৩% কৃষক পরিবার মাসে ১০০০০ টাকার কিছুটা বেশি আয় করে। কৃষি ক্ষেত্রে আয়ের এই পরিস্থিতির জন্য কৃষক পরিবারগুলো গ্রামে ক্রমশ অকৃষি কাজে যুক্ত হচ্ছে। তাও অকৃষি ক্ষেত্রে ভারতে ৩৯% কৃষক পরিবার মাসে ৫০০০ টাকার কম, এবং ১৪% পরিবার মাত্র ২০০০ টাকার কম আয় করে। ভারতবর্ষে কৃষির এই হালজে খুবেই করুন তা প্রমান করে (দেখুন; Shukla; ২০২৪)।[২২] কারণ কৃষির সার্বিক বিকাশের পথ ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে ক্রমশ দেশের মোট জি.ডি.পিতে কৃষির অংশ কমছে। সুতরাং সমগ্র সুন্দরবনে কৃষির হালহকীকত যে একই ধারায় বইবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উপরন্তু বলা চলে সমগ্র দেশে কৃষির অবক্ষয়ের এই রূপ ও সুন্দরবনের কৃষির চিত্রটিকে অঙ্কন করলে স্থানীয় অঞ্চলে কৃষি অর্থনীতির আসল বাস্তবতা ফুটে উঠবে বলে আশা রাখি। একদিকে নিচু জমি ও লবণাক্ত মাটি, বিছিন্ন যোগাযোগ (সুন্দরবনের বেশিরভাগ ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি বিছিন্ন দ্বীপে অবস্থান করছে) ও সর্বোপরি প্রতিনিয়ত ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগে’ সুন্দরবনের কৃষি ব্যবস্থাকে প্রত্যহ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সুন্দরবনের একজন মানুষ হওয়ায় ও বিগত প্রায় এক দশক ধরে উক্ত বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনে নানান তথ্য ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। এই অভিজ্ঞতা ও ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্যের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত ‘যুক্তির’ প্রয়োজনে আমি আইলার (২০০৯) আগে অর্থাৎ ২০০০ সাল থেকে বর্তমান (২০২৪) সময়কালকে আমার গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি।

গ্রামীণ ভারতের অর্থনীতি বলতে আমরা বুঝি কৃষিকাজ। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে দেশের মোট উৎপাদনে কৃষি পন্য অংশ ক্রমশ কমছে। ১৯৫০-৫১ সালে কৃষি পণ্যের অংশ ৬০.৫৩% থাকলেও ১৯৮০-৮১ তা দাঁড়ায় ৪২% (দেখুন; রুদ্র; ২০১৫; পৃঃ ১)। এবং বর্তমানে

[২২] সুন্দরবনের ক্ষেত্রে আইলার আগে একটি কৃষক পরিবার অকৃষি ক্ষেত্র থেকে বাৎসরিক যে আয় করত, আইলার পরে তা অনেকটা কমে যায়। কারণ আইলার পরে স্থানীয় অঞ্চলে কৃষক শ্রেণী মানুষের স্থানীয় অঞ্চলের এইরূপ নানান প্রকার অকৃষি জীবীকার কাজ বন্ধ হয়েজায়। যেমন মাটি খননের কাজ ইত্যাদি। এই বিষয়ে আমি গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি।

তা দাঁড়িয়েছে ১৮.৪%।[২৩] এখন প্রশ্ন হল দেশের মোট উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষির অবদান কি করে কমল। কৃষি উৎপাদনে বিশেষত দুধ, ডাল ও পাট উৎপাদনে ভারত বিশ্বের প্রথম সারিতে রয়েছে এবং ধান, গম, তুলা, আখ, সবজি, ফল, চিনা বাদাম, মশলা ইত্যাদি দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে।[২৪] তারপরেও ভারতীয় কৃষির এই দুরবস্থা কেন তা ভাবতে একটু কোথাও গোলমাল ঠেকে। আরও সন্দেহ হয় যখন দেখি দেশের দুই শিল্প গোষ্ঠী আদানি ও আম্বানি উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যের ব্যবসার জন্য তীব্র লড়াই করছে। এখানেই প্রশ্নটি জোরালো হয় কীসের তাগিদে এইরূপ মুনাফা লোভী ব্যবসায়িরা ভারতের কৃষি উৎপাদন ও বাণিজ্যে হাত পাকাতে চাইছে? অবশ্যই আরও বেশি মুনাফার তাগিদে। তাহলে এমন কি ক্ষমতা যেখানে রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় দেশের কৃষি উৎপাদন মার খাচ্ছে আর ব্যাক্তি মালিকানায় এর সুদূরপ্রসারী লাভের আশা দেখছে? এই বিষয়ে যতটা চর্চা করেছি তাতে এটাই মনে হয় কৃষি ব্যবস্থার 'বণ্টন ব্যবস্থায়' আসল ফাঁক রয়েছে বলে মনে হয়। যদিওবা এই গবেষণায় সেই ফাঁক খোঁজা আমার লক্ষ্য নয় কেবল আলোচ্য বিষয়কে আরও সমৃদ্ধি করে তোলার জন্য সমগ্র ভারতের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট বোঝার চেষ্টা করলাম। সুন্দরবনের কৃষি অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সেই কৃষি অর্থনীতির যে রূপান্তর ঘটে তা এক কথায় বোঝা মুশকিল।

কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমাজ কাঠামো বুঝতে গেলে, অবশ্যই সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝা উচিত। তাই আইলা উত্তর পাথরপ্রতিমার পরিবর্তিত অর্থনীতিকে বোঝার জন্য স্থানীয় অঞ্চলের আইলা পূর্ব ও আইলা উত্তর অর্থনীতির ধরণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

স্থানীয় অঞ্চলে কৃষি অর্থনীতিঃ-

আইলা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়। পুনর্গঠনের জন্য সরকার ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে। স্থানীয় অঞ্চলের কৃষক এখন

[২৩] এই তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছে, ভারত সরকারের 'Department of Agriculture fermer welfare' এর At A Glance অধ্যায় থেকে। https://agriwelfare.gov.in/en/Dept

[২৪] এই তথ্যটি সংগ্রহ করেছি FAO India এর at a glance অধ্যায় থেকে। https://www.fao.org/india/fao-in-india/india-at-a-glance/en/?utm_source=chatgpt.com ।

লবণাক্ত জল ও মৃত্তিকা সহনকারী এবং বেশি উৎপাদনের আশায় বিভিন্ন (কৃষিজ) বহুজাতিক কোম্পানির বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবহার করছে। এই বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর নানান প্রকার কৃষিজ দ্রব্যের সাথে স্থানীয় কৃষক পরিচিত হওয়ার ফলে, কৃষক শ্রেণীর মধ্যেও উৎপাদন সম্পর্কে নতুন উৎসাহ দেখা দেয়। কোম্পানির বিভিন্ন প্রকার এজেন্সি, যেমন স্থানীয় কৃষি রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতা ও খুব সামান্য বেতনে নিয়োগ করা স্থানীয় কিছু কর্মী যাদেরকে কোম্পানি সরাসরি নিয়োগ করে। এই এজেন্সি গুলো কৃষকের সাথে দৈনিক যোগাযোগ বজায় রাখে। নতুন নতুন বীজ, সার ও কীটনাশকের দ্বারা উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে কৃষকের নিজস্ব প্রচলিত জ্ঞানের পরিবর্তন হতে থাকে। এই ভাবে ধীরে ধীরে স্থানীয় অঞ্চলের কৃষক শ্রেণীর মধ্যে তাদের পুরনো কৃষি সংস্কৃতির বদল হয়ে, তথাকথিত এক হাইব্রিড (কৃষি) সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটছে। কৃষির নতুন এই রূপকে বিশ্লেষণের জন্য আমাদের আইলা পূর্ব কৃষি অর্থনৈতিকে বোঝা প্রয়োজন।

আইলা পূর্ববর্তী কৃষি অর্থনীতিঃ-

সুন্দরবনের যে ভৌগোলিক অংশ নিয়ে আমার গবেষণা তার অস্তিত্ব খুব বেশিদিন আগের নয়। হান্টার ১৮৭৫ সালে যখন 'A Statistical Account of Bengal' বইটি লিখছেন তখনও সুন্দরবনের নিম্ন অংশের পরিচয় তিনি এই ভাবে দিচ্ছেন "great metropolitan District of the 24 parganas and the wild seaboard jungles and solitary swamps of the Sundarban" অর্থাৎ Great Metropolitan বলতে কলকাতাকে বুঝিয়েছেন। এছাড়াও ২৪ পরগণার পরিচয় দিচ্ছেন এইভাবে যে কলকাতার পাশে রাজপুর, হরিনাভি, বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার হয়ে সাগরদ্বীপ পর্যন্তকে বুঝিয়েছেন। সাগরদ্বীপ ও ডায়মন্ড হারবারের পরিচিতি ছিল ব্রিটিশ সরকারের ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে। সুতানটি, চন্দননগর থেকে ব্যবসায়িক জাহাজ হুগলী নদী হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার আগে সাগরদ্বীপে বিশ্রাম, আরামের জন্য কয়েকদিন থেকে যেত। আবার বাণিজ্য শেষে ফিরে আসার সময়ে একইভাবে সাগর দ্বীপে কয়েকদিন থাকত। অর্থাৎ সাগর দ্বীপের বাণিজ্যিক গুরুত্ব থাকলেও ডায়মন্ড হারবারের প্রশাসনিক দিক থেকে গুরুত্ব ছিল। খাজনা আদায়, দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ ও সরকারি সহায়তা প্রদান, হিসেবপত্র ইত্যাদির জান্য ডায়মন্ড হারবার পরিচিত ছিল। ওপর দিকে রাজপুর, হরিনাভি, বারুইপুর পরিচিত

ছিল সম্ভবত কলকাতার কাছের অঞ্চল হিসেবে। তিনি উল্লেখ করছেন যে ১৮২২-২৩ সালে প্রথম নিম্ন সুন্দরবন অঞ্চলে বর্তমান যেখানে নামখানা, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ এইসব ব্লকগুলিতে জরিপ করে ভৌগোলিক ভাবে বিভাজিত করে বিভিন্ন 'লটে' ভাগ করা হয়েছে। যাকে তিনি বলছেন বিস্তীর্ণ 'বন্য সমুদ্রতীর ও নির্জন জলাভূমি' হিসেবে। ১৭৭০ সালে ক্লড রাসেল (১৭৩২-১৮২০) কলকাতার 'কালেক্টর জেনারেল অফ ২৪ পরগনাস' নিযুক্ত হয়ে কলকাতা সংলগ্ন সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করে নির্দিষ্ট শর্তে জমি লিজের মাধ্যমে বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেছিল; পরবর্তী সময়ে তা পতিত তালুক হিসেবে পরিচিত হয়েছিল। ১৮১৬ সালে স্কট সুন্দরবন অঞ্চলের কমিশনার নিযুক্ত হয়ে ১৯টি পতিতাবাদি তালুককে[২৫] জরীপ করেন। এর পরবর্তী সময় কালে ব্রিটিশ সরকারের বহু নীতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে নিম্ন সুন্দরবনের স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ এই পতিত জমিগুলো ছিল নিচু, স্যাঁতসেঁতে ঘন বনজঙ্গল ও বঙ্গোপসাগরের সংলগ্ন। জন্তু জানোয়ারের উপদ্রব, বন্যা এই ধরনের নানান প্রাকৃতিক সমস্যার কারণে মানুষের বসতি গড়ে উঠতে পারেনি। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় ১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারত বর্ষের প্রথম Census এ প্রাথরপ্রতিমা ও নামখানা ব্লকের কোন উল্লেখ ছিল না। কারণ হিসেবে আন্দাজ করা যেতে পারে ১৮২৬ ও ১৮২৯ সালে ব্রিটিশ সরকার ২৪ পরগণার নিচু, স্যাতস্যেতে জঙ্গলাকীর্ণ অংশের ৩০ টি ব্লক নিয়ে 'বসিরহাট' ও নামখানা' রেঞ্জ নামে একটি 'Forest Division' গঠন করে[২৬]। সম্ভবত ১৯৫১ সালের census Report এর সময়ে এই 'Forest Division' এর আওতায় নামখানা ও পাথরপ্রতিমা ব্লক দুটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তী ১৯৬১ সালের Censusএ পাথরপ্রতিমা ব্লকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং মোট জনসংখ্যা দেখাচ্ছে ১১৩,০৮৯। কিন্তু এই ১৯৬১ সালের Census Reportএ আবার ১৯৫১ সালের জনসংখ্যারও উল্লেখ রয়েছে[২৭]। তাহলে ১৯৫১ সালের জনগণনায় পাথরপ্রতিমা ব্লকের নাম উল্লেখ নেই কেন? কারণ হিসেবে বলা যায় সুন্দরবনের নিম্ন অংশে জলা-জঙ্গল, বিপদসংকুল হওয়ায় সম্ভবত সরকারি ভাবে তেমন তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি কিংবা সরকারি উদাসীনতাকেও এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে। তাই ঔপনিবেশিক সময়কালের ইতিহাস ও তার প্রশাসনিক

---

[২৫] স্কট পতিতাবাদি তালুক বোঝাতে যেইসব জমিকে বুঝিয়েছেন জেগুলি জঙ্গল কেটে উদ্ধার করা হয়েছে।

[২৬] Census 1951, 34 Parganas, District handbook, পৃ- XII-XIII

[২৭] Census 1961, 24 parganas, District Hand book, পৃ-২৭৯

ছাপ নিম্ন সুন্দরবনের গ্রামগুলিতে তেমনভাবে পড়েনি। তথাপি বলা যায় ব্রিটিশ আমলে সুন্দরবনের এই দীর্ঘ ইতিহাসে সুগঠিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা (নিম্ন সুন্দরবনে) গড়ে তুলতে না পারলেও বর্তমান নিম্ন সুন্দরবনের যে জনজাতি মানুষজনের বসবাস তা ওই ঔপনিবেশিক কালের শেষের দিক থেকেই গড়ে উঠেছে।[২৮] ঠিক এই সময় থেকে নিম্ন সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল, ভিন জেলা ও রাজ্য থেকে পরিশ্রমী শ্রমিকদের নিয়ে এসে জঙ্গল কেটে কৃষি জমি ও বসতবাড়ি গড়ে তুলেছে। যেমন ঝাড়খণ্ড, বিহার, পুরুলিয়া থেকে নিম্ন বর্গের ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানুষদের এই কাজে নিয়ে আসা হয়েছিল (দেখুন, জালায়; ২০০৯)। এমনকি ১৭৮৩ সালে যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কেল ২৪ পরগনার কিছু জমি লিজে নেওয়ার পর জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করার জন্য 'ফৌজদারি বন্দীদের ব্যবহার করার অনুমতি পেয়েছিলেন'।[২৯] অর্থাৎ এই গভীর জঙ্গল কেটে কৃষি জমিতে রূপান্তর করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। এর মধ্যে মেদিনীপুর থেকে কিছু সংখ্যক উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ এসে এই জমিগুলো দেখভাল করতে করতে সেই জমির মালিকে পরিণত হল। আরেক শ্রেণীর মানুষ যারা ১৯৫৫-৬০ পরবর্তী সময় বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু শ্রেণীর মানুষ। এই তিন শ্রেণীর মানুষ নিম্ন সুন্দরবনে বসতী গড়ে তোলে। সুতরাং এই অঞ্চলে বসতির ইতিহাস ৭০-১০০ বছরের মধ্যে মিশ্র জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে উঠেছে। এইভাবে ধীরে ধীরে গ্রাম্য সংস্কৃতি, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি গড়ে ওঠে তার নিজস্ব ধারায়।

এই অঞ্চলে ব্রিটিশ সময়ের তেমন ছাপ না থাকলেও এবং মিশ্র জনজাতি হিসেবে গড়ে উঠলেও ভৌগোলিক অবস্থান ও নিজস্ব গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায় স্থানীয় অর্থনীতি ও রাজনীতিতে। ভৌগোলিক অবস্থান এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে আবার এই প্রতিবন্ধকতা স্থানীয় মানুষের জীবিকার এক মাধ্যম হিসেবেও গড়ে

---

[২৮] আমার ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখেছি বর্তমান যে জনবসতি নিম্ন সুন্দরবনে গড়ে উঠেছে এই জনবসতি কোন সময়ে ইংরেজ বা কোন কোন সময়ে জমিদারের জঙ্গল পরিষ্কার ও পতিত জমিকে আবাদিতে পরিণত করার কাজ করেছেন । এইজন্য এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষদের বিভিন্ন সময়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। এদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষ দুর্ভেদ্য এই বন জঙ্গল ছেড়ে চলে গেছেন বা কিছু জনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ও রোগ ভোগের পরে মৃত্যু হয়েছে। বাকিরা প্রতিকূল পরিস্থিতে থেকেও বসতি গড়ে তুলেছেন।

[২৯] গোকুলচন্দ্র দাস, ঔপনিবেশিক আমলে চব্বিশ পরগনার ভূমি ব্যবস্থার বিকাশ, নামক প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা, পৃ; ১২৩-১৩০; ২০১০।

উঠেছে। গ্রামের কাঁচা ও পাকা রাস্তা ও অসংখ্য নদী নালার মাধ্যমেই এই অঞ্চলের মানুষের এক মাত্র পরিবহনের ব্যবস্থা। বসতি এই দ্বীপ গুলোতে ছোটখাটো কাজকর্ম বাজার হাট ইত্যাদির জন্য পায়ে হেঁটে, সাইকেল, মোটর সাইকেল, টোটো গাড়ি ও মেসিন ভ্যানের মাধ্যমে যাতায়াত করলেও তুলনায় একটু বড় অনুষ্ঠানের জন্য বাজার হাট, হাসপাতাল, (পঞ্চায়েত অফিস বাদে) সমস্ত প্রশাসনিক কাজ কর্মের জন্য মেসিন চালিত নৌকাই হল পরিবহনের এক মাত্র মাধ্যম। পাথরপ্রতিমা ব্লকে ১২টি দ্বীপের মধ্যে প্রত্যেকটি থেকে দৈনিক গড়ে ৫-৬টি ফেরি নৌকোর মাধ্যমে প্রায় ১০০০-১৫০০ মানুষ যাতায়াত করে। এই ফেরি নৌকা করে মানুষের যাতায়াতে জীবনের কোনো নিরাপত্তাই থাকে না। নদীর স্রোত, কোথাও জলের ভয়ানক পাক বা কখন ঝড়ের কবলে পড়ে বা কখন অতিরিক্ত মানুষের ভারে অগুনতি মানুষের মৃত্যু হয়েছে যা এই অঞ্চলের নিত্য ঘটনা।[৩০] আবার এই অসংখ্য নদী নালা থেকে বিভিন্ন প্রকার মাছ শিকার করে স্থানীয় বাজার ও আড়তে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করা হয়। শুধু মাছ শিকার নয় বিস্তৃত বন জঙ্গল থেকে মধু ও কাঠ সংগ্রহ করাও ছোটখাটো জীবিকার মধ্যে পড়ে। এটাই এই অঞ্চলের মানুষের কৃষিকাজের পরে স্থানীয় জীবিকা হিসেবে গড়ে উঠেছে যা এই বিপদসংকুল ভৌগোলিক অবস্থানই সৃষ্টি করেছে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত থাকলেও স্বাধীনতার পরেও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ এসে জনবসতি গড়ে তুলছে। এই ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি Census report এর তথ্য তুলে ধরলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। ১৯৬১-৭১ সালে Census report এ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ২৫% এবং ২৪ পরগণার গ্রামীণ বৃদ্ধির হার ২৮% সেখানে পাথরপ্রতিমার (গ্রামীণ) বৃদ্ধির হার ৪২%।

আবার ১৯৭১-৮১ সালের Census report এ সমগ্র রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার ২০% এবং সমগ্র জেলার গ্রামীণ বৃদ্ধির হারও ২০% ছিল সেখানে পাথারপ্রাতিমা ব্লকের বৃদ্ধির হার ২৪%।[৩১] অর্থাৎ পাথরপ্রতিমা ব্লকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কখন কখনো বিগত দশকের

---

[৩০] দৈনিক দ্বীপের মানুষকে বাজার হাট হাসপাতাল প্রশাসনিক কাজের জন্য নৌকায় করে প্রায় ১৫ - ২০ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে হয়। নদীতে নৌকা চলার সময়ে নদীর তলদেশের আকৃতি অনুযায়ী জলের ওপরের ঘূর্ণায়মান স্রোত প্রবাহিত হয়। মানুষ ভর্তি নৌকা যাওয়াআসার রাস্তা যদি এই ধরনের কোন স্রোতে পড়ে যায় তাহলে বিপদ অনিবার্য।

[৩১] Census report 1981, District 24 parganas Statistical Handbook, পৃ-৫১।

থেকে কমলেও রাজ্য ও জেলার থেকে এই বৃদ্ধির হার সবসময় ঊর্ধ্বমুখীই ছিল। জনসংখ্যার এই ঊর্ধ্বমুখী গতি যা প্রমাণ করে বিস্তীর্ণ জলাভূমি হলেও জীবন ও জীবিকা অতিবাহিত করার জন্য নূন্যতম পরিসরের আশায় মানুষ এখানে বসতি গড়ে তুলছে। ঠিক এই সময় থেকেই স্থানীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন, জীবিকা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর একটি প্রেক্ষাপট তৈরি হতে থাকে। এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় বাসিন্দা মনোরঞ্জন দাসের সাক্ষতকার তুলে ধরব। এই সাক্ষাতকারটি নেওয়া হয়েছিল ২০২৩ সালের মার্চ মাসের ১৬ তারিক। তিনি বলেন যে, "আমার যখন বয়স ১৭ তখন আমরা ৫৩ পরিবার মিলে ১৯৫৩ সালে এখানে আসি। বর্তমান আমার বয়স ৮৮। এখানে জঙ্গলে ভর্তি ছিল। যাকে বলা হয় এক কথায় নদীর চর। এই চরকে বাঁধ দিয়ে ঘেরা ও জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করার জন্য কালেক্টর সাহেব আমাদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করেন। বিনিময়ে প্রতি পরিবারকে ১২ বিঘা করে জমি ও প্রতি বিঘা জঙ্গল কাটার জন্য ২.৫ কেজি চাল ও ২.৫ কেজি করে আটা দিয়েছিল। যাকে 'তেসিল রিলিপ' বলা হত। এর মধ্যে জীব-জন্তুর আক্রমণ, খাবার ও খাবার জলের অভাব ও ডাক্তারি চিকিৎসার অভাবে আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন কলেরা, ডাইরিয়া, ম্যালেরিয়াতে মারা গেছে। কেউ কেউ এই ভয়ে এখান থেকে চলে যায়। এই ভাবে ৫-৬ বছর ধরে টানা জঙ্গল পরিষ্কার করার পরে ধান চাষ শুরু করি। প্রথম দিকে না হলেও পরের দিকে ধীরে ধীরে ধানের ফলন হয়েছে। নেহেরু সরকার প্রথমে জমির পাট্টা দেওয়া শুরু করল। এই সুযোগে কংগ্রেসের কিছু স্থানীয় নেতা অনেক জমি করায়ত্ত করল। এর পরে বামেরা এসে সেই জমি উদ্ধার করে বর্গা বসাল। এই বর্গা দেওয়ার সময়ে অনেক জমিকে খাস হিসেবে দেখাল। কিন্তু এই খাস জমি গুলো সি.পি.আই.এমের লোকেরা দখল করত। এর মধ্যে দুই রাজনৈতিক দলের লড়াইও হত। এই ভাবে ধীরে ধীরে স্থানীয় অঞ্চলে মানুষের বসতি যেমন বাড়ল তেমনি হাট-বাজার, স্কুল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে উঠলো। বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থাকলেও আমরা এখানে ভাল আছি"।

অর্থাৎ মনোরঞ্জন দাসের বক্তব্যে উঠে আসে বিভিন্ন প্রতিকূলতা থাকলেও এই অঞ্চলে তিনি ভাল আছেন। এই ভাল থাকাটা হয়তো নূন্যতম জীবনের চাহিদাকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর পরিবারের এখন ৬ জন সদস্য ও ৭ বিঘা চাষের জমি রয়েছে। সারাবছর ধান যা হয় তাতে তাঁর পরিবারের খাবারের চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। এছাড়া সংসারের বাকি খরচ সরকারি প্রকল্পের বিভিন্ন অনুদান,

একশো দিনের কাজ, বর্ষার মরশুমে নিজের জমিতে চাষের পরে অন্যের জমিতে মজুর খেটে দিন কেটে যায়।

আমরা যদি এবার মনোরঞ্জন দাসের এই বক্তব্যের প্রথম অংশে আসি তাহলে তার সারাংশটি দাঁড়ায় এইরূপ। বাংলাদেশ থেকে ১৯৫৩ সালে যখন এই অঞ্চলে আসেন তখনও এখানে নদীর চর ছিল। পরে কখন সরকারি উদ্যোগে বা কখনও নিজেদের উদ্যোগে জঙ্গল কেটে চরের চারধারে বাঁধ দিয়ে বসতি গড়ে তুললো। সেই সময় রাস্তাঘাট, খাদ্যের অভাব, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিল না। এই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদির কারণে অনেক মানুষের মৃত্যুও হয়েছে। পরবর্তী দলীয় রাজনীতির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ১৯৫১ সালে ভারতে যে জনগণনা হয় তাতে পাথরপ্রতিমা ব্লকের উল্লেখ না থাকার কারণ মনোরঞ্জন দাসের সাথে কথোপকথনে আমরা বুঝতে পারলাম। তাই ব্রিটিশ শাসনকালে নিম্ন সুন্দরবনের এই গ্রামগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক কোন শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার পরে এই গ্রামগুলোতে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার ছাপ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ঐতিহাসিকভাবে স্থানীয় অঞ্চলের সমাজতাত্ত্বিক কাঠামোকে বুঝতে হলে তার নিজের ছাঁচেই বুঝতে হবে। বুঝতে হবে তার নিজস্ব অর্থনৈতিক গড়ন, আর এই অর্থনৈতিক গড়ন বুঝতে হলে আমাদের স্থানীয় অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থাকে নিশ্চয় বুঝতে হবে।

সংঘর্ষ ও নির্মাণ:-

কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সেই অঞ্চলের ভূমি কাঠামো নিয়েও আলোকপাত করাটা প্রয়োজন। কিন্তু আমার এই গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে ভূমি বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। তাই এই অধ্যায়ে ভূমি কাঠামো নিয়ে বিশ্লেষণ না করে শুধুমাত্র যুক্তির প্রয়োজনে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখ করব। ১৯৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে যখন বসতি গড়ে উঠছে সেই সময়ে স্থানীয় মানুষের (জীবিকা হিসেবে প্রথমের দিকের সময়) জীবিকা ছিল জঙ্গলের কাঠ কেটে বিক্রি করা। এর পরবর্তী সময়ে মাছ ধরা ও কৃষির মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি আবর্তিত হত। তবে বর্তমান একটি পরিবারের দৈনিক যা আয় ও ব্যয় তার অর্ধেকেরও বেশি আসে কৃষির বাইরে ভিন্ন জীবিকা

থেকে। জীবন ও জীবিকার এই রূপান্তর এবং সেই রূপান্তরের ক্ষেত্রে স্থানীয় অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থার ভূমিকা কী? এই আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে স্থানীয় অঞ্চলের কৃষি ও তার অর্থ রাজনীতির হালহকীকত। (দ্বীপ ভূমি হওয়ায়) প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে জমি ও শস্য নষ্ট হওয়া, লবণ জলের প্রভাব, অনুর্বর মাটি, পর্যাপ্ত মিষ্টি জলের অভাব, কৃষি শস্য সংরক্ষণ করার জন্য কোন হিমঘর না থাকা, পরিবহন ও প্রযুক্তির অভাব সত্তেও এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান জীবিকা হল কৃষিকাজ। অর্থাৎ সহজেই অনুমেয় যে নিরুপায় মানুষ এক প্রকার বাধ্য হয়েই কৃষি কাজকে প্রধান জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে।

মনোরঞ্জন দাসের বক্তব্য ও সরকারি তথ্য প্রমাণ করে যে আমার ক্ষেত্রসমীক্ষার মৌজাগুলোর কৃষি ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ইতিহাস ৭০-১০০ বছরের মধ্যে। সুতরাং উক্ত অঞ্চলে আজকের যে জীবন যাত্রা ও কৃষি ব্যবস্থা তার শুরুর দিকটা কতটা কঠিন ও সংগ্রামের তা সহজে অনুমেয়। এই অঞ্চলের মাটি লবণাক্ত ও ক্ষারীয়। যা কৃষিকাজের জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত। কিন্তু জীবনের তাগিদে মানুষ এখানে থেকেছে গড়ে তুলেছে বসতি। গড়ে উঠেছে স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থা। ক্রমে গ্রামের ভেতরের রাস্তা কাঁচা থেকে কংক্রিট হল, নিচু ও দুর্বল নদীবাঁধ হয়েছে অনেক উঁচু ও শক্তপোক্ত কিংবা কোথাও কংক্রিটের, রাস্তার ধারে বিভিন্ন গাছের সারি যদিও কোন বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই গাছগুলোর অর্ধেকাংশ নষ্ট হয়ে যেত, পুরনো হাট থেকে বাজার ও এখন গ্রামের প্রায় প্রত্যেক (তুলনায় একটু বড় মোড়ে) মোড়ে বিভিন্ন দোকান, প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ও বর্তমানে সাধারণ ডিগ্রি কলেজ থেকে I.T.I (Industrial Training Institute) কলেজ, এবং বিভিন্ন স্কুলে গড়ে উঠেছে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য আবাসিক, একদিন জংগলের লতা-পাতার ঘর যা আজকে কংক্রিটের দালানে পরিণত হয়েছে। একই সময়ে সরকারি বিদ্যুৎ আসার ফলে কমবেশি ৯০% পরিবারে টেলিভীষণ, মোবাইল এবং আনুসঙ্গিক আধুনিক ইলেকট্রনিক্স পণ্যের কদর চোখে পড়ে। অর্থাৎ এক কথায় বলতে হলে নিম্ন সুন্দরবনের গ্রামগুলি বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়া স্পষ্ট ধরা পড়ে। সর্বোপরিবলতে হয়, বর্তমানে যে রাষ্ট্রীয় পরিসর ও আধুনিক জীবন গড়ে উঠল তা একদিনে হয়নি। এই ৭০-১০০ বছরের গ্রামগুলো গড়ে ওঠার ইতিহাস ছিল এইরূপ-জঙ্গল কেটে সেই জঙ্গলেই গাছ-লতা-পাতা দিয়ে ঘর বাঁধা। কিন্তু খাদ্য আসবে কোথা থেকে? সরকারি দান-অনুদান ও বনজঙ্গল খালবিল থেকে শুরু হয় খাবার সংগ্রহ করা। সাপলা

ফুল ও ফল, নদীর চরের নোনা শাক (যা কেবল নোনা জমি বা নদীর চরে জন্মায়) জঙ্গলের করুলা ফল, রাম ফল ইত্যাদিতেই শুরু হল দিন-যাপন।[৩২] প্রথম কয়েকবছর খাবার অভাব দুর্ভিক্ষের পর্যায়ে যায়। দু-তিন দিন না খেয়ে থাকাটা খুব একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। জীবন যুদ্ধের এই লড়াই থেকে পরিত্রাণের দ্রুত চেষ্টা ও নির্দিষ্ট জীবিকায় স্থায়িত্ব হওয়ার জন্য কৃষিকেই বেছে নেয় স্থানীয় মানুষ। চাষের জন্য বলদ ও লাঙল না থাকায় মাটিতে হাল দেওয়ার জন্য জঙ্গলের শক্ত লাঠি, ছোট ছোট কাটা বাঁশের অংশ দিয়ে প্রথমে কর্ষণ করার চেষ্টা করলেও অত্যধিক মাত্রায় গাছের শেকড় ও গুঁড়ির জন্য কয়েক বছর তা সম্ভব হল না। তাই পরের বছর থেকে এই অকর্ষিত জমিতেই ধানের বীজ ছড়িয়ে দিতে থাকল চাষিরা। কম হলেও ধান কিছুটা ঘরে এল। পরিবারগুলোর মুখে অন্তত এই আসা জাগল যে আজ না হলেও আগামী মরশুমে ধান হবে। পরিবারে খাদ্যের অভাব মিটবে। যারা সংগ্রাম করল তাঁরা এই অঞ্চলে টিকে গেল বাকি পরিবার ফিরে গেল তাঁদের নিজের অঞ্চলে বা ভিন্ন কোথাও। চর কে বাঁধ দিয়ে ঘিরে ফেলা, নদীর নোনা জল ভেতরে প্রবেশ করতে না পারা এবং স্থানীয় মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম যা পরবর্তী সময়ে ওই অঞ্চলে বসতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি অবদান রেখেছে বলে মনে করি। যে বছর প্রথম ধানের উৎপাদন হল সেই ধান ‘চোখে দেখাই’ নাকি এক উৎসবের মাত্রা নেয়। পরিবারগুলোর এই আশা জাগল যে ধান যখন হল তখন এই অঞ্চলে কষ্ট হলেও না খেতে পেয়ে তারা মরবে না। এই ভাবে ধীরে ধীরে দ্বীপের সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার হল। ক্রমশ জংগলের লতাপাতা গাছগাছাড়ির পরিবর্তে মাটির দেওয়াল ও ঘরের চাল (কিছুটা ধানের খড় ও হেতাল পাতার সহযোগে) ছাওয়া হল। তাও বর্ষার মরশুমে বৃষ্টির জল ঘরের চাল চুইয়ে ঘরের দেওয়াল, মেঝের মাটি ও বিছানা, জামা-কাপড় ভিজিয়ে দিত।

বসত বাড়ি হল, নিদেন পক্ষে ৩ মাসের খোরাকিও হল।[৩৩] কিন্তু বাকি ৯ মাসের খোরাকি, তেল, নুন, ঝাল, জামাকাপড়, চিকিৎসা ইত্যদির খরচ যোগান দেবে কিভাবে? শুরু হল অন্য লড়াই। এবার ঘরের বাইরে বেরোনোর পালা। নূন্যতম জীবিকার জন্য এই সময়ে স্থানীয় মানুষের

---

[৩২] সেই সময়ে স্থানীয় জঙ্গল থেকে খাবার যা পাওয়া যায় আরকি, যেমন এই করুলা ও রাম ফল। জঙ্গলের এই ফল বেশ সুস্বাদু, এই এলাকার মানুষ ঘরে চাল গম ইত্যাদি না থাকলে বন জংগলের এই ফলেই ক্ষুধা নিবারণ করত।

[৩৩] স্থানীয় অঞ্চলে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ যে কোন খাদ্যকে খোরাকি বলেন।

মধ্যে দুটি রাস্তা খোলা ছিল। এই অঞ্চলের প্রত্যেক পরিবারের কমপক্ষে একজন করে পুরুষ মানুষ হয় জঙ্গলে কাঠের ব্যবসায় (শ্রমিক হিসেবে) যুক্ত হল নাহলে নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূমে চাষের মরশুমে ধান কিংবা পাটের জমিতে শ্রমিকের কাজ করতে হত।[৩৪] তবে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে জীবিকা হিসেবেও কিছুটা তারতম্য ছিল। প্রথমের দিকে সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষ জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেত। কিন্তু ধীরে ধীরে তিন জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে তিন ধরনের জীবিকার উৎস চোখে পড়ে। যেমন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ প্রথম থেকে এখনো জঙ্গলের কাঠ, কাঁকড়া ও মধু সংগ্রহকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছে। অপরদিকে মেদিনীপুর থেকে আগত জনগোষ্ঠীর মানুষ কৃষিকাজ ও গভীর সমুদ্রে ট্রলারের মাধ্যমে মাছ ধরাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতার আগে ও পরে ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর মানুষ এই জঙ্গলের কাঠ কাটা ও উক্ত জেলাগুলোতে চাষের মরশুমে ভাড়াটে শ্রমিক হিসেবে কাজ করাকে জীবিকা বেছে নিত। উল্লেখ্য হল এই যে, সুন্দরবনের সবথেকে কাছের শহর হল কলকাতা। কিন্তু রিক্ত এই মানুষগুলো কলকাতায় না গিয়ে আরও দূরে ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবিকা বেছে নিত। কারণ ৬০-৭০-৮০ এই দশক গুলোতে কলকাতায় নানা প্রকার কলকারখানা, নতুন নতুন সরকারি দপ্তর গড়ে উঠছে। এইরূপ নানান অসংগঠিত ক্ষেত্রেও সহজে ও কম বেতনে শ্রমিকেরও প্রয়োজন ছিল[৩৫]। কিন্তু কলকাতার ১০০-১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই বদ্বীপের মানুষজন কলকাতা পেরিয়ে আরও দূরে নদীয়া, বর্ধমান ও বীরভূমে চাষে মরশুমি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যেত। আবার কেউ গভীর সমুদ্রে ঝুঁকি নিয়ে মাছ ধরতে যেত। কিংবা কেউ জঙ্গলে বাঘের সাথে লড়াই করে জীবিকা অর্জন করত। এর মূল কারণ অনুমান করা যায়, তা হল শহরের জটিল জীবনে এরা অভ্যস্থ ছিল না। কিংবা ছেড়ে আসা পুরনো জীবিকার সাথে বর্তমান জীবিকার মিল থেকে হতে পারে।

---

[৩৪] কাঠের ব্যবসার শ্রমিক বলতে বোঝাতে চেয়েছি স্থানীয় মানুষ দলবেঁধে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে সেই কাঠ জঙ্গল থেকে বের করে নৌকা বোঝাই করে ২-৩ দিন নদীতে হাল ও দাঁড় টেনে কোন দ্বীপে এসে আবার সেই কাঠ গুলো নৌকো থেকে জলকাদার মধ্যে মাথায়-কাঁধে করে বয়ে নদী বাঁধের কাছে কোন কাঠের আড়ৎদারের কাছে বিক্রি করত। এই সামগ্রিক ব্যবস্থায় বেশ পরিশ্রমী ও সাহসী শ্রমিকের প্রয়োজন হত।

[৩৫] এই বিষয়ে আমার ক্ষেত্র সমীক্ষায় উঠে আসে, বসতি গড়ে উঠার পরে স্থানীয় কিছু মানুষ কলকাতায় জীবীকার উদ্দেশ্যে আসলে কিছুদিন কাজকর্ম করার পরে আবার ফিরে গেছে সুন্দরবনে। কেউ কেউ সরকারি চাকরিও ছেড়েছেন। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন শহরের জটিল জীবন ও আদপকায়দার সাথে খাপ খওয়াতে না পেরে ঘরে ফিরেছেন।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ এই কাঠ বলতে তা কোন জ্বালানির জন্য নয়, তা বিক্রি করে কিছু আয় হত। সুন্দরবন বিশেষভাবে যেসব কয়েকটি গাছের জন্য বিখ্যাত তার মধ্যে 'গরান' ও 'হেঁতাল' গাছ অন্যতম। এই গাছগুলো বিশেষত গভীর জঙ্গলে গড়ে উঠত এবং খুবই শক্তপোক্ত ও সহজে (ঘুন) পোকায় আক্রমন করতে পারে না। তাই এই গাছের চাহিদাও খুবই বেশি। এই কাঠ একবার ঘরের কাজে ব্যবহার করতে পারলে অন্তত ৪০-৫০ বছর নষ্ট হয় না। তাই গ্রামের ৪-৫ জন পুরুষ মানুষ দলবদ্ধ হয়ে একজন 'তান্ত্রিক' সহ দুই থেকে তিন দিনের জন্য পালতোলা ছোট নৌকা ব্যবহার করে, নিজেদের দ্বীপ ছেড়ে অনেকটা দূরে বঙ্গোপসাগর হয়ে ভিন্ন কোন দ্বীপের গভীর কোন বাঘের জঙ্গলে দলবদ্ধ হয়ে প্রবেশ করত। জঙ্গলে প্রবেশ করার পরে তান্ত্রিকের কাজ ছিল কাঠ কাটার জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মন্ত্র-তন্ত্রের মাধ্যমে ঘিরে দেওয়া যার সুবাদে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাঘের মুখ বন্ধ করে রাখা (স্থানীয় অঞ্চলে কথিত তন্ত্রের প্রতি এই বিশ্বাসই বাঘের জঙ্গলে কাঠ কাটার জন্য এক মাত্র ভরসা ছিল), যাতে ওই নির্দিষ্ট জায়গায় বাঘ প্রবেশ করতে না পারে ও কাউকে আক্রমণ করতে না পারে । এর ফলে জঙ্গল কাটার সময়ে কাঠুরেরা নিরাপত্তা পেত[৩৬] এই ভাবে কয়েকবার গাছ কাটার পরে নিজেদের প্রয়োজন মিটে গেলে বাকি কাঠগুলো বিক্রি করত। অপরদিকে পরিবারের বাকি পুরুষরা যারা জঙ্গলে যেতে ভয় পেত ও তুলনায় কম সাহসী তারা নদীয়া ও বর্ধমান এসে বিভিন্ন প্রকার চাষের মরশুমে মজুর খেটে কিছুটা অর্থ উপার্জন করত। সুতরাং এই অঞ্চলের পরিবারগুলোর জন্য প্রথম আয়ের কিছুটা উপায় হল।

সময়ের সাথে সাথে এইরূপ বিভিন্ন অস্থায়ী জীবিকা গড়ে উঠল। যেমন স্থানীয় নদী, খালবিল থেকে মাছ ধরে তা কখনো পরিবারের খাওয়ার যোগানের সাথে বেশি অংশ স্থানীয় হাটে বিক্রি করে কিংবা 'শুটকি' করে সংরক্ষিত করা হত। কিংবা নতুন ধান উঠলে সেই কাঁচা ধানের 'চিড়ে' করে তা এগ্রাম ওগ্রাম ঘুরে ঘুরে বিক্রি করত। এই কাজে বেশির ভাগ যুক্ত থাকত পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ও মহিলারা। যেহেতু নতুন বসতি তায় পরিবারের ব্যবহার যোগ্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

---

[৩৬] জঙ্গল কাটার জন্য এই যে তান্ত্রিকের অবস্থান যেখানে তিনি মন্ত্র বলে বাঘের মুখ বন্ধ রাখেন বলে বিশ্বাস, তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা আধুনিক কোন যুক্তিও হইত নেই। কিন্তু স্থানীয় অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘ ৪০-৫০ বছরে এই বিশ্বাসের মাধ্যমে গভীর বাঘের জঙ্গলে কাঠ কাটার জন্য প্রবেশ করত। এর ফলে অন্তত পক্ষে তাদের সাহস হত।

যেমন রান্না ঘরের বাসন পত্র, মাটি কাটার কোদাল, ধান কাটার কাঁচি/কাস্তে, গাছ কাটার কুড়ল, কাঠ কাটার দা, চাল ঝাড়ার কুলো, চাল মাপার গাইতি, উঠোন ঝাঁট দেওয়ার ঝাঁটা এইরূপ নানান নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের চাহিদা গড়ে উঠল। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে যেহেতু বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এসে বসতি গড়ে তুলেছে তাই এদের পরিবারের এই দৈনিক ব্যবহার যোগ্য জিনিস গুলোও ব্যবহারিক আদপ কায়দা অনুযায়ি এদের গঠন ও চাহিদা এক গোষ্ঠীর অন্য গোষ্ঠীর থেকে ভিন্ন, এক গোষ্ঠীর জিনিস অন্য গোষ্ঠী ব্যবহার জানত না। তাই প্রত্যেক গোষ্ঠীর কিছু মানুষপারিবারিক এই সব জিনিস পত্রের ব্যবসা শুরু করল।

মুশকিল হল নতুন বসতি গড়ে ওঠায় এই জিনিস গুলো এখানে পাওয়া যেত না। তাই যে গোষ্ঠী যেই অঞ্চল থেকে এসেছে সেখান থেকেই এই ব্যবহার যোগ্য জিনিস গুলো কিনে এনে এই অঞ্চলে বিক্রি করত। পাশাপাশি খাল-বিল, ডোবা, নিচু জলাশয় থেকে মাছ ধরে স্থানীয় অঞ্চলে বিক্রি করতে শুরু করল। ধীরে ধীরে স্থানীয় অঞ্চলের মানুষ নদীতে ছোট ডিঙি নৌকা দিয়ে জোয়ার-ভাটার সাথে তাল রেখে মাছ ধরা শুরু করল। মাছ ধরার পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে স্থানীয় অঞ্চলে মাছের আড়ৎ তৈরি হল। অর্থাৎ মাছ এখন আর স্থানীয় অঞ্চলের জন্য নয় নিজেদের চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত মাছ আড়ৎদার কিনে নিয়ে বাইরের বাজারে বিক্রি করতে শুরু করল। ক্রমশ আড়ৎও বৃধি পেল এবং মাছ ধরা মানুষের সংখ্যাও বাড়ল। ধীরে ধীরে স্থানীয় অঞ্চলের মানুষ সমুদ্রে বড় ট্রলারের মাধ্যমে গিয়ে মাছ ধরতে শুরু করল আরও বেশি আয়ের জন্য। এই মাছ ধরা ও তার বাণিজ্যিক ক্ষেত্র কিন্তু তৈরি হয়েছে নিজেদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অনুভব থেকে। যদিও এই আড়ৎদার কখনো নিজেদের মধ্য থেকে গড়ে উঠেছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাইরে থেকে এসে অস্থায়ী ভাবে মাছের ব্যবসা বাণিজ্য করা শুরু করে। তবে এযাবৎ সুন্দরবনে যত জনজাতির বসতি গড়ে উঠেছে তার মধ্যে কেবল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেই কাঁকড়া ও মধু সংগ্রহ করে। অর্থাৎ সুন্দরবনের মধু ও কাঁকড়ার বিশ্ববাজারে যে বাণিজ্যিক মুল্য তার অবদান কেবল এই আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষের। বনজঙ্গল থেকে কাঁকড়া ও মধু সংগ্রহের সময়ে প্রতি বছর অগণিত আদিবাসী মানুষের মৃত্যু হয় বাঘ ও কুমিরের আক্রমণে। তাও জঙ্গলকেই জীবিকা হিসেবে, শেষ সম্বল হিসেবে বেছে নেয় এই মানুষ গুলো।

কোন এক নতুন ভূমিতে/চরে যখন জনবসতি গড়ে ওঠে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট হিসেবে নির্দিষ্ট সংস্কৃতিরও প্রচলন হয়। গড়ে ওঠে গঞ্জ-হাট-বাজার, মেলা, পার্বণ ইত্যাদি। বিভিন্ন জনজাতির মিলন কেন্দ্র এই সুন্দরবনে তাই গঞ্জ-হাট-বাজারের ক্ষেত্রে যেমন বৈচিত্র দেখা যায় তেমনি মেলা পার্বণের ক্ষেত্রেও বহু বৈচিত্রের সম্ভার চোখে পড়ে। নিম্ন সুন্দরবনে এই সময় থেকে গ্রামীণ 'ক্ষমতা বিন্যাস' তার নিজস্ব কাঠামো তৈরি করতে থাকে।

এইভাবে এক দিকে যেমন কৃষক তাঁর পরিবার ও জীবনের তাগিদে কায়িক পরিশ্রম ও কঠিন জীবন সংগ্রামে করে চলছে। অপরদিকে সরকারের তরফ থেকে এবার মনোনিবেশ করা হল দ্বীপের মানচিত্র অংকনের ওপর। বিভিন্ন গ্রাম, মৌজা, গ্রামের রাস্তা, সেচের জন্য ড্রেন ব্যবস্থা, রায়তি ও খাস জমির দাগ নাম্বার, জঙ্গল ও চরের পরিমাপের মাধ্যমে মানচিত্র অংকন হল। এই মানচিত্রের মাধ্যমে কোন জমি কার, কোনটা সরকারি জায়গা বা কোনটা ব্যাক্তিগত মালিকানাধীন তা ভাগ হল। জমির নির্দিষ্ট দাগ-নাম্বার, খতিয়ানের মাধ্যমে মালিকানা ঠিক হল। বসতি, জলা ও চাষ এই তিনটি 'শ্রেণিতে' জমিকে ভাগ করা হল। এই ভাবে প্রথম আইন ও নিয়ম নীতির মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষ রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের আওতায় আসে।

গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামোঃ-

ভারতে গ্রাম সমাজের ভিত্তিই হল কৃষি। আর এই কৃষিভিত্তিক চরিত্রের কথা ভাবলে আমাদের মনে পড়ে সামন্ত বা আধা সামন্ত তান্ত্রিক ব্যবস্থা, ব্রিটিশ, জমিদার, জোতদারের শাসন ও শোষণ, দাদন প্রথা, খাজনা ইত্যাদি। অর্থাৎ ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই নির্দিষ্ট বিন্যাসের মধ্য দিয়ে কি নিম্ন সুন্দরবনের কৃষি ব্যবস্থাকে বোঝা যাবে? নাকি তার অন্য কোন ফর্ম রয়েছে? সুন্দরবনের ভূমির বৈশিষ্ট হল এইরূপ, আজ যেখানে রায়ত জমি বা বসতি, কাল সেখানে নদীর চর বা আজ যেখানে চর কাল সেখানে বসতি গড়ে উঠছে। এইরূপ একটি কৃষি ভিত্তিক সমাজকে কি নির্দিষ্ট কাঠামোয় বোঝা সম্ভব? এই বিষয়ে একটি বিতর্ক দিয়ে শুরু করা যাক, ভারতের কৃষি ব্যবস্থায় 'ক্ষমতার বিন্যাসকে' কোন ধারায় বোঝা উচিৎ? বস্তুতপক্ষে এই প্রশ্নকে সামনে রেখে বহু ভারতীয় পণ্ডিত বিভিন্ন প্রকারের মতামত পোষণ

করেছে। অশোক রুদ্র বলেছেন যে, 'মার্কসবাদী ধারণায় আমাদের কৃষি ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত শ্রেণি বিন্যাস সম্পর্কে কিছু ধারণা অবিতর্কিতভাবে গৃহীত হয়ে এসেছে, যা একটি ছকে পরিণত হয়েছে। যে ছকটির মধ্যে আছে পাঁচটি শ্রেণীর স্থান। যেগুলো বেশির ভাগ ইংরেজিতে ব্যবহার করা হয়- landlord, rich peasant, middle peasant, poor peasant ও agricultural labour' হিসেবে। অশোক রুদ্র বলেন যে এই পাঁচটি শব্দের মধ্যে landlord শব্দটি নিয়ে অসুবিধা রয়েছে। landlord প্রতিশব্দ হিসেবে 'জমিদার' কথাটি ব্যবহার করা হয়। স্বাধীনতার আগে যে জমিদারেরা প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে কিছুটা নিজেদের জন্য রেখে বাকিটা সরকারকে প্রদান করত, সেই প্রকার জমিদারী ব্যবস্থা কি এখনো টিকে আছে? কিন্তু এখনো landlord বা জমিদার শব্দটা ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ রুদ্রের মতে এই পাঁচটি শব্দের ভিত্তিতে ভারতের কৃষি ব্যবস্থার শ্রেণি বিন্যাস করাটা ভারতের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাঁর মতে লেনিন নিজের শ্রম ব্যবহার করা বা না করাকে যে গুরুত্ব দিয়েছেন সেই গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমাদের দেশে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ লেনিনের সংজ্ঞা অনুযায়ী ধনী কৃষকদের জোতের আয়তন যে মধ্যকৃষকের জোতের আয়তনের চেয়ে বেশী হবে এবং landlord -এর জোতের আয়তনের চেয়ে কম হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং লেনিন অনুযায়ী সংজ্ঞাটি এমন একটি শ্রেণিবিন্যাস সূচিত করে যার সঙ্গে শ্রেণিগুলির অর্থনৈতিক ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। রুদ্রের মতে, আমাদের দেশে তা চলে না। জাতিপ্রথার দরুন নিজ কায়িক শ্রম নিয়োগ করা আর জোতের আয়তন-এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক জটিল। উচ্চবর্ণম ভুক্ত এইরূপ অনেক কৃষক আছে যারা স্বল্প পরিমাণ জমির মালিক। জমির স্বল্পতা ও আর্থিক দুর্গতি সত্ত্বেও পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তিরা লাঙলে হাত দেয় না, আবার নিজের হাতে ফসল কাটে না। এদের উপর উপরোক্ত শ্রেণিতত্ত্ব প্রয়োগ করলে আমাদের দেশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জমির মালিকদের এক বড় অংশকেই landlord বলে মেনে নিতে হয়। রুদ্র মনে করেন, শ্রেণিতে শ্রেণিতে দ্বন্দ্বের দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতবর্ষের কৃষিতে প্রধানত দুটি শ্রেণী আবিষ্কার করা যায়, তা হল 'জোতদার শ্রেণি' ও 'মজুর শ্রেণি' (রুদ্র, ২০১৫) অর্থাৎ রুদ্রের মতে, ভারতবর্ষের কৃষি কাঠামো আদি-অন্ত কাল থেকে একই ধারায় ও কতগুলো নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতেই পর্যালোচনা করতেই হবে তা কিন্তু নয়। কারণ সমগ্র ভারতে কৃষি বৈচিত্র, ও সময়ের সঙ্গে কৃষির ধরন পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসকের শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত নিয়ম নীতি, ভৌগোলিক অবস্থান ও মাটির

গুণাগুণ ইত্যাদি যা ভারতের কৃষি ব্যবস্থার নিজস্ব গড়ন তৈরি করেছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এই নিজস্ব গড়নের মাধ্যমেই ভারতের কৃষির শ্রেণি সম্পর্কগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

আবার বিনয় ভূষণ চৌধুরী, (১৯৯৬) মনে করেন যে ভারতের কৃষি ব্যবস্থায় গ্রামীণ ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল জমিদার ও জোতদার। যদিও এই জমিদার শ্রেণি উৎপাদন সম্পর্কের সাথে জড়িত নয় তথাপি গ্রামীণ 'অর্থনীতি' এই জমিদার শ্রেণিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। এত সব সত্ত্বেও জোতদার যেভাবে আধিয়ার ও ভাগচাষীর উপর আধিপত্য বিস্তার করত তা জমিদারেরা পারত না। কারণ ভাগ চাষির জমি ও শ্রমের উপরে জোতদারদের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। যেহেতু জমিদার সরাসরি চাষের কাজে যুক্ত থাকত না তাই এই বিষয়ে জমিদারের তেমন ক্ষমতা ছিল না (বিনয় ভূষণ চৌধুরী, ১৯৯৬)। অর্থাৎ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে বাংলার কৃষি সমাজের যে গড়ন দেখছেন তাও জমিদার, জোতদার, ভূস্বামী এই প্রচলিত কৃষি সমাজের কাঠামোর মধ্য দিয়ে। কৃষি সমাজের গঠন ও তার ক্ষমতার ধরণ নিয়ে আরও কয়েকটি প্রবেন্ধের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তানিগুচি, তোগাওয়া, নাকাতানি সম্পাদিত 'গ্রামবাংলা ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতি' বইয়ের (২০০৭) বিভিন্ন প্রবন্ধে গ্রাম বাংলার কৃষি সমাজের গঠন নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন তানিগুচি আলোচনা করেছেন, বাংলায় কৃষি সমাজের গঠনের ক্ষেত্রে জমিদার শ্রেণীর তুলনায় এক 'মধ্যবর্তী শ্রেণি' ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। আবার কাওয়াই বলেন যে, বাংলার কৃষি সমাজে 'শ্রেণীর' কোন ভূমিকা নেই। তিনি বলেন বাংলার কৃষি সমাজের গড়নে জমিদারদের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। অর্থাৎ গ্রামীণ ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল এই জমিদার শ্রেণি। তাকাদা দেখাচ্ছেন, বাংলাদেশের (সেকালের বাংলার) গ্রামের অর্ধেকেরও কম মানুষ কৃষি কাজের সাথে যুক্ত। তাঁদের বেশিরভাগ আয়ের উৎস অ-কৃষিজ (শিনকিচি তানিগুচি, ২০০৭)। অর্থাৎ উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বইয়ে আলোচনা/বিশ্লেষণ যা হয়েছে তা এক কথায় ভারতের কৃষি ব্যবস্থার মুঘল যুগের শেষের দিক থেকে ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতের কৃষি ব্যবস্থার সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা। এই আলোচনা ও তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে কি নিম্ন সুন্দরবনের কৃষি ব্যবস্থাকে বোঝা যায়?

সুন্দরবন অঞ্চলে গ্রামীণ প্রভাব ও ক্ষমতা কাঠামোর প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থসামাজিক গতিশীলতা ও পরিবেশগত বৈশিষ্টের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। নতুন বসতি গড়ে ওঠার পরে ক্রমশ গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে সাবেকি পঞ্চায়েতের মত 'মোড়ল' ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই ব্যবস্থায় একজনই নেতা থাকতেন, যিনি তাঁর নিজের দক্ষতায় ও বৌদ্ধিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই পদের অধিকারি হতেন। মোড়ল ব্যবস্থা কোন সরকারি বা জনগণের সভা-সমিতির দ্বারা নির্ধারিত/নির্বাচিত ছিল না। কিংবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জান্যও তিনি এই পদে আসিন হন না, সম্পূর্ণ নিজের দক্ষতার ও মর্যাদার ওপরে নির্ভর করে গ্রামের মানুষ যতদিন তাঁকে মান্যতা দেবে ততদিনই তিনি এই মর্যাদার অধিকারি হবেন। অপরদিকে বলতে হয় যে এই মোড়ল সার্বিকভাবে তার ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার এর জন্য সদা সচেষ্ট থাকেন। গ্রামের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক জমিজমার বিবাদের সিদ্ধান্ত নিতেন এই মোড়ল। গ্রামের পূজাপার্বণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিবাহ অনুষ্ঠান, সামাজিক শৃঙ্খলা কিংবা, সরকারি নতুন কোন নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি চোখে পড়ত ও পড়ে। অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে নিম্ন সুন্দরবনের কৃষি ব্যবস্থায় গ্রামীণ প্রভাব ও ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল এই মোড়ল ব্যবস্থা। তবে সাবেকি মোড়ল ব্যবস্থায় ক্ষমতার যে প্রকাশ দেখা যায় তা নিম্ন সুন্দরবনের এই অঞ্চলে সেই ভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। কারণ আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ব্যবস্থায় 'পঞ্চায়েতি রাজ' শুরু হতে পুরনো এই খাপ পঞ্চায়েতি বিষয়গুলোর অচিরেই গুরুত্ব হারায়। তথাপি গ্রামের পরিবারগুলোর মধ্যে জমি জায়গা নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে তার নিষ্পত্তি করত মোড়ল। কোন পরিবারের ভিটের সীমানা কতোটা, গ্রামের রাস্তা কার জমির ওপর দিয়ে কতোটা যাবে কতোটা কোন দিকে সরতে হবে, এই কাজগুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই মোড়লের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকত। তাই নিম্ন সুন্দরবনের যে ৪টি মৌজায় ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছি সেই গ্রাম গুলোর ক্ষমতার কাঠামো জমিদার, জোতদার, ভূস্বামী, দাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে মোড়ল ব্যবস্থার মাধ্যমেই পরিচালিত হত। তবে স্থানীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন যন্ত্রণা ও ক্ষমতার জাল বিন্যাসকে বুঝতে হলে স্বাধীনতার পরে দলীয় রাজনীতির মাধ্যমেই তা বোঝা সম্ভব।

এই বিষয়ে প্রথমে বলা ভাল যে, সুন্দরবন অঞ্চলে দলীয় রাজনৈতিক কর্মক্রিয়া ও তার প্রভাব ও ক্ষমতা কিভাবে স্থানীয় কৃষি ব্যস্থার ওপরে পড়েছে। তা আলোচনা করাটা খুবই প্রাসঙ্গিক।

আর এই আলোচনা করতে হলে আমাদের সমগ্র সুন্দরবনকে দুই ভাগে ভাগ করাটা প্রয়োজন। তার কারণ হল, আমার গবেষণার বিষয় ও ক্ষেত্র সমীক্ষা তার সাথে সমগ্র সুন্দরবনের আর্থসামাজিক ও রাজনীতি ধরণ এক নয়। কারণ সুন্দরবন অঞ্চল যেহেতু কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে গড়ে ওঠেনি, তাই তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোয় গড়ে উঠেছে। কিছু অংশ স্বাধীনতার অনেক আগে গড়ে উঠেছে আবার কোন অংশ এখনো গড়ে উঠছে। কোন অংশের রাজনৈতিক ইতিহাস দীর্ঘ, আবার কোন অংশের ইতিহাস সদ্য। কোন অংশে বসতি গড়ে উঠেছে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে আবার কোন অংশে বসতির ইতিহাস জানা নেই। তাই নিম্ন সুন্দরবনের যে অঞ্চল গুলোতে স্বাধীনতার পরে প্রশাসনিক কাঠামো ও রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার চরিত্র উচ্চ সুন্দরবনের মত নয়।

সুন্দরবন নিয়ে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে আশা উদ্দীপনা দেখা গেছে তা ওই উচ্চ সুন্দরবন নিয়েই। তবু বলাযায় ১৯৩২ সালে হ্যামিল্টনের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখা হওয়ার পর থেকে। আসলে হ্যামিল্টন স্কটল্যান্ড থেকে আসা একজন সমবায় ব্যাংকের ব্যবসায়িক ছিলেন এবং সেই সময়ে সরকারের একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর মধ্যে একজন। ১৯০৩ সালে সুন্দরবনের গোসাবা অঞ্চলে সরকারের কাছ থেকে প্রায় ১৫০,০০০ একর জমি কিনে স্কুল, সমবায় ব্যাঙ্ক, ধান মিল ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করছিলেন। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সুন্দরবনের গোসাবা অঞ্চলে আসা। এর পরবর্তী সময়ে বাংলা উপন্যাস ও বহু নামী- দামী চলচ্চিত্র অনুষ্ঠিত হয়েছে সুন্দরবনকে নিয়ে। মনোজ বসুর উপন্যাস 'জলজঙ্গল' (১৯৫১), 'বন কেটে বসত' (১৯৬১), শক্তিপদ রাজগুরু 'নয়াবসত' অবলম্বনে উত্তম কুমার অভিনিত 'অমানুষ' চলচিত্র (১৯৭৫), অমিতাভ ঘোষের 'The Hungry tide' (২০০৭), এইরূপ নানান ছোট বড় প্রবন্ধ, উপন্যাস, চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে ক্যানিং, গোসাবা, সন্দেশ খালি, ধনেখালি নিয়ে। এই অঞ্চলগুলো কলকাতা থেকে ৪০-৫০-৬০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত, যাকে উচ্চ সুন্দরবন হিসেবে ধরা হয়।

বৌদ্ধিক জগতের এই চর্চা দুনিয়ার রোমাঞ্চকর ও ভদ্রলোক শ্রেণী মধ্যে সাড়া জাগালেও প্রান্তের পাথরপ্রতিমা, নামখানা, রায়দিঘি নিয়ে এইরূপ কোন চর্চা চোখে পড়ে না। এর অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে, যেমন হ্যামিল্টন বিদেশি ডাচ ইংরেজ হয়েও সুন্দরবনের

গভীর জঙ্গলে সমবায় ব্যবস্থা ও আবাদ গড়ে তোলা এবং তাঁর সাথে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য এটা যেমন আছে, তেমনি কলকাতার কাছে হওয়ায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য জ্ঞান চর্চার জগতে এই অঞ্চলে ইংরেজদের প্রভাব, জমি ও বসতি গড়ে ওঠার ইতিহাসও উঠে আসে। তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কলকাতার বাবুদের (সম্পন্ন ব্যবসায়ীদের) মাছের 'ভেড়ি'[৩৭] ব্যবসায় একের পর এক স্থানীয় গরীব মানুষের রায়তী-বর্গা জমিতে তৈরি করার কাহিনীও উঠে আসে; (কোথাও ফুসলিয়ে বা কোথাও জোর করে স্থানীয় মাফিয়াদের সহযোগে করা); নোনাজল দিয়ে বাগদা চিংড়ি চাষের স্থানীয় রাজনীতির ক্ষেত্র ও বিবরণ ও (গুহ, ১৯৮৮, ২০১৮) উঠে আসে উক্ত প্রবন্ধদুটি, ও অন্যন্য উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। যেখানে ব্রাত্য থেকে যায় নিম্ন সুন্দরবনের বসতি ও কৃষি ব্যবস্থা গড়ে ওঠার রাজনৈতিক ইতিহাস। তাই ব্রাত্য থেকে যায় এই প্রশ্নগুলোও, 'অপারেশন বর্গা' (১৯৭৯-৮০) নিম্ন সুন্দরবনের কৃষি ব্যবস্থা রূপান্তরের ক্ষেত্রে ঠিক কতটা প্রভাব ফেলেছে? যেখানে ১৯৫০-৬০ সাল নাগাদ বসতি গড়ে উঠছে।[৩৮] যাদের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকার জঙ্গল কেটে নির্দিষ্ট জমি দিয়েছে তাদের পক্ষে এই কম সময়ে কতটা জমিদার হয়ে ওঠা বা জমি করায়ত্ত করে মালিক হওয়ার অবকাশ থাকে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

স্থানীয় ক্ষমতায়ন ও দলীয় রাজনীতি

১৯৭৭ সালে রাজ্যে বাম জোট ক্ষমতায় আসে। প্রাক নির্বাচনী ইস্তেহার অনুযায়ী সরকার রাজ্যে ভূমি সংস্কার শুরু করে। যা 'অপারেশান বর্গা' নামে পরিচিত। এই অপারেসান বর্গা শুধু বাংলায় নয় সমগ্র ভারতে ভূমি সংস্কারের এক উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন হিসেবে পরিচিত লাভ করে। যার সাফল্য ও সমালোচনা এবং বিভিন্ন প্রশ্ন থাকলেও, দেশ-বিদেশের বেশিরভাগ পণ্ডিত

---

[৩৭] এই ভেড়ি শব্দটির সাথে নিম্ন সুন্দরবনের মানুষ খুব একটা পরিচিত নয়। ভেড়ি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে বোঝা গেল যার সম্পর্কে এদের সঠিক ধারনা নেই।

[৩৮] মুলত অপারেশন বর্গা নিয়ে আমি দ্বিতীয় অধ্যায়েও আলোকপাত করেছি। তবে দুটো আলোচনার প্রেক্ষিত ভিন্ন ও রাজনিতিও ভিন্ন। অপারেশন বর্গা নিয়ে বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করেছি কিভাবে সরকারি নীতি দলীয় ক্ষমতার উৎস হতে পারে, এবং বাম সরকারের দীর্ঘ শাসন কালে, (১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত) এই নিতিটি কিভাবে ক্ষমতার চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রামের রাজনৈতিক প্রভাবিত করত। এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অপারেশন বর্গার নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনীতির প্রসঙ্গ।

এই বিষয়ে সহমত পোষণ করেন যে বাম আমলে অপারেশান বর্গার ফলে অন্তত ১৩ লক্ষ কৃষি শ্রমিক বর্গাদারের অধিকার পায়। এমনকি গ্রামীণ দারিদ্রের হার ১৯৭৩-৭৪-এর ৭৩.২ থেকে নেমে ১৯৯৪-৯৫ এসে দাড়ায় ৪০.৮ (মৈত্রীশ ঘটক, ২০২৩)। অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জি ও অন্যান্যরা ১৯৯৮ সালে 'Empowerment and Efficiency: Tenancy Reform in West Bengal', ২০২৩ সালে মৈত্রীশ ঘটকের লেখা 'পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও বামফ্রন্টের কৃষিনীতি-একটি পর্যালোচনা', এই লেখাগুলোতে অপারেশান বর্গার নানান প্রকার তুল্যমূল্য আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, ৮০-৯০ এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের যে গ্রামীণ উন্নয়ন তা অপারেশান বর্গার ফলেই মূলত ঘটেছে । অপরদিকে এই সমসাময়িক সময়ে ভারতের অর্থনীতিতে উদারীকরণ ও কৃষি ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের কথা উল্লেখ করে অপারেশান বর্গার সাফল্য নিয়ে বেশ কিছু পণ্ডিত প্রশ্ন তোলেন। ১৯৯৫ সালে অভিজিৎ সেন ও রঞ্জা সেনগুপ্তের লেখা প্রবন্ধ 'The Recent Growth in Agricultural Output in Eastern India, with Special Reference to the Case of West Bengal', ১৯৯৩ সালে জন হ্যারিস এর লেখা "What is Happening in Rural West Bengal?: Agrarian Reform, Growth and Distribution", ১৯৮৭ সালে জেমস বয়েসের লেখা 'Agrarian impasse in Bengal: Institutional constraints to technological change' লেখা প্রবন্ধে অপারেশান বর্গার সাফল্যকে যে কেউ কেউ অতিরঞ্জিত বলে মনে করেন তার উল্লেখ রয়েছে। তাঁদের মতে অপারেশান বর্গা নিয়ে এই লেখাগুলো খুবই উল্লেখযোগ্য হলেও নিম্ন সুন্দরবনে এর ফলাফল সম্পর্কে জানা যায় না বা আলোচনা হয়নি। তথাপি এটাও এক অর্থে বলা যায় যে অপারেশান বর্গা নীতিটি নিম্ন সুন্দরবনের কৃষি ব্যবস্থার বিশ্লেষণেবিশেষ প্রযোজ্য নয়। বস্তুতপক্ষে পাথরপ্রতিমা ও নামখানা ব্লকের কথা উল্লেখ করতে পারি। আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই দুটো ব্লক ১৯৫১ সাল Census পর্যন্ত Forest Range এর অধীন ছিল। যতটুকু ইতিহাস জানতে পারি এই সময়ে অঞ্চলগুলোতে ধীরে ধীরে জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে উঠছে। যার প্রায় ৮০-৯০% জায়গা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জঙ্গল কেটে আবাদ ভূমিতে পরিণত করা হয়। সুতরাং ১৯৭৯-৮০ সালের মধ্যে ব্যাপক হারে জমিদারি, জোতদার ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব খুবেই কম। তবে কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে 'লাটদারি ব্যবস্থার' আংশিক প্রভাব পড়লেও স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থায় তার তেমন কোন প্রভাব গড়ে ওঠেনি। কারণ লাটদারেরা জমি পেলেও প্রতিকূল পরিবেশের জন্য চাষাবাদ গড়ে তুলতে পারেনি। যে কারণে

লাটদারেরা চাষের ক্ষেত্রে উৎসাহ হারিয়ে স্থানীয় কিছু মানুষের মধ্যে তাদের এই জমিগুলো নাম মাত্র দরে 'ভাগ চাষের' জন্য দিত। যাতে এই অনুর্বর জমিগুলোকে কর্ষিত উর্বর জমিতে রূপান্তরিত করা যায়। আমার ক্ষেত্র সমীক্ষায় এইরূপ তিনজন লাটদারের কথা শুনেছি যারা স্থানীয় অঞ্চলে কোন ভাবেই ক্ষমতা বিন্যাস করতে পারেনি অথবা করতে খুব আগ্রহী হয় নি। ১৯৭৯-৮০ সালের অপারেশান বর্গা নীতি গ্রহণের অনেক আগেই তাদের এই জমিগুলো ভাগ চাষীরা নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছিল। সুতরাং জমিদার-জোততদার ব্যবস্থা গড়ে না ওঠা ও সরকার নতুন বসতির জন্য নির্দিষ্ট (প্রথমে ১২ বিঘা, পরে ৮ বিঘা এবং শেষে ৪ বিঘা করে) জমি প্রদান করায় এই অঞ্চলের বেশির ভাগ পরিবারেই ছিল ক্ষুদ্র চাষি। সুতরাং বাম সরকার যে উদ্দেশ্য নিয়ে অপারেশান বর্গা নীতি গ্রহণ করে তা নিম্ন সুন্দরবনের ক্ষেত্রে ততটা প্রযোজ্য নয়। তবে স্থানীয় অঞ্চলে এর প্রভাব ভিন্ন ভাবে পড়েছিল। এই বিষয়ে বলতে হলে স্থানীয় দলীয় রাজনীতির কথা উল্লেখ করতে হয়। এই অঞ্চলে প্রথম ১৯৬২ সালে লোকসভা ও ১৯৬৭ সালে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় থেকেই দলীয় রাজনীতির প্রভাবে মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক দাবি- দাওয়া ও উন্নয়নের প্রশ্নে স্থানীয় মানুষ ডান ও বাম রাজনৈতিক মতাদর্শে ভাগাভাগি হয়ে যায়। প্রথম দিকে কংগ্রেসের প্রতি জনসমর্থন থাকলেও ক্রমে বাম রাজনীতির প্রতি মানুষের জনসমর্থন বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৭ সালের বিধানসভার নির্বাচন থেকেই বাম ফ্রন্টের জোট SUCI পর পর তিনবার এই অঞ্চলের ক্ষমতা দখল করে। ১৯৭৭ সালে বাম সরকার ক্ষমতায় আসার পরে নির্বাচনী ইস্তেহার অনুযায়ী ভূমী সংস্কারের নীতি গ্রহন করে। এই সময়ে রাজ্যের রাজনীতিতে জমিদারী ব্যবস্থার অবসান ও ভূমি সংস্কারের পক্ষে জনগণ ব্যাপক ভাবে সমর্থন জানায়। যার ফলশ্রুতি হিসেবে 'অপারেশান বর্গার' নামক ভূমি সংস্কারের নীতি গ্রহণ করা হয়। নানান সমালোচনা সত্ত্বেও রাজ্যের সাধরণ মানুষ এর সুফল পেয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে সরকারিভাবে যেমন জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়, পাশাপাশি তৎকালীন CPI(M) (Communist Party of India (Marxist) এর নেতৃত্বে দলের নিচু স্তরের নেতাদের হাতেও এই ক্ষমতা প্রদান (রাজনৈতিক) করা হয়। বিভিন্ন সময়ে দলের উঁচু স্তরের নেতৃত্বের নির্দেশে গ্রামে গ্রামে প্রবল উৎসাহে গরীব মেহনতি মানুষের দল জমি দখলে এক প্রকার সশস্ত্র লড়াই শুরু করে। অপর দিকে জমি হারানোর ভয়ে গ্রামের অন্যান্য পরিবারগুলো কংগ্রেসের পক্ষ নেয়।বাংলার যেসব গ্রামগুলোতে জমিদারের জমি দখল হল পাশাপাশি কিছু কিছু সাধারণ

কংগ্রেসের সমর্থক যারা হয়তো ৫-৬-৭ কিংবা ১০ বিঘা জমির মালিক তাদেরও জমি লুট হল।[৩৯] গ্রামের জমি দখলের এই চিত্র কমবেশি ২০১১ সালের বাম জোট ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত দেখা গেল। এই চিত্র সুন্দরবনের নিম্ন অংশেও বাদ যায়নি। কিন্তু প্রশ্ন হল যেখানে কিছু দিন আগে (১৯৫০-৬০) সরকার জমি বিলি করে পাট্টা দিল, এবং যেখানে বড় জোর ১২-১৫ বিঘার বেশি জমির মালিক প্রায় দেখা যায় না[৪০] সেখানে জমি লুট হল কেন? কিন্তু জমি লুট তো হল সাথে বিরোধীদের প্রতি চলতে থাকল নৃশংস অত্যাচার। বিরোধীদের ঘরবাড়ি পুড়ল, বাড়ি ছাড়া হল একাংশ, গরুর ঘর সহ হালের বলদ পুড়িয়ে মারা হল। পাকা ধানে আগুন দেওয়াও হল, স্কুল, ক্লাব, খেলার মাঠ, বাজারহাট-দোকান বন্ধ হল। দুই পক্ষের খণ্ড খণ্ড লড়াইয়ে মারা পড়ল বেশির ভাগ বিরোধীরাই।[৪১]

এইরূপ দুটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন যা ২০২১-২২ সালে আমার ক্ষেত্র সমীক্ষার সময়ে উঠে এসেছে। এই দুটি ঘটনা পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি-প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণ দাসপুর ও উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ গ্রামের দুজন চাষির সাথে আলাপচারিতার সারাংশ উল্লেখ করলাম। ২০০৪ সাল, স্থানীয় কৃষক বাসুদেব জানা (নাম পরিবর্তন করা হয়েছে তো? নাহলে করতে হবে।) পৈত্রিক সূত্রে মোট তিন বিঘা চাষের জমি পেয়েছিল। কংগ্রেসের সমর্থক হওয়ায় এবং CPI(M) না করার জন্য তাঁর এই জমি তৎকালীন শাসক দলের নেতারা চাষ করতে দেয়নি। তার ব্যাখ্যাটি ছিল এইরূপ 'সিজনে আমি চাষের জন্য হাল করতে গেলে স্থানীয় কয়েকজন নেতা জমিতে নামতে দেয়নি। একদিন সকালে তিন জোড়া হাল নিয়ে এসে একই দিনে মাটি চষে ধান রুয়ে

---

[৩৯] আমি এখানে সচেতন ভাবেই জমি লুট শব্দটি ব্যবহার করেছি। কারণ যেখানে জমি দখল করার কোন কারণ নেই সেখানে এই শব্দটি ব্যবহার করা যায় বলে মনে করি।

[৪০] এখানে বেশী জমির মালিক বলতে এই অঞ্চলে যারা প্রথমে এসেছে তাঁদের সরকার ১২ বিঘা করে জমি দিয়েছে, ক্রমশ জনবসতি বৃদ্ধি পেতে সরকার পরবর্তী সময়ে ৪ বিঘা করে জমি দিতে থাকে। এর মধ্যে কিছু পরিবার এই অঞ্চলে বসবাসের অনুপযোগী মনে করে সরকারি প্রাপ্ত জমি কিছু ছেড়ে দিয়ে ও কিছু কম দামে বিক্রি করে চলে যায়। সুতরাং এই অঞ্চলের বড় কৃষক বলতে ওই অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের ছেড়ে দেওয়া জমি ও নিজেরা সামান্য অর্থের বিনিময়ে কেনা জমিকে ধরা যায়।

[৪১] ১৯৮১ সালে পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি-প্লট গ্রাম পঞ্চায়েত এ কংগ্রেস সমর্থিত যদুনাথ দাস ও যোগেন (মাঝি) দাস দের এইরূপ জমি দখলের লড়াইয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। যার ইতিহাস ক্ষেত্র সমীক্ষার সময়ে স্থানীয় কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ ও তাঁদের পরিবারের সাথে কথোপকথনে এই তথ্যটি সংগ্রহ করেছি।

(জমিতে ধান গাছের চারা বপন করা) দিয়েছে। পরে আমি কেস করতে মারধর করা হয়, ৯ দিন পরে হাসপাতালে থেকে ছাড়া পেলেও স্থানীয় স্তরের শাসক দলের নেতাদের দাপটে পরিবারকে গ্রামে এক-ঘরে করা হয়। কয়েকদিন খাওয়ার জলের জন্যও কল ব্যবহার করতে দেয়নি। এইরূপ নানান ভাবে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চলতে থাকে। তবে বর্তমানে সেই জমির কেসে আমি জিতে যাই। এই কারণে আমি ৪ বছর চাষ করতে পারিনি। পরিবারের খাওয়ার জোটানোর জন্য আমাকে বাড়ির বাইরে কখনো আলুর স্টোর, কখনো ট্রলারে মাছ ধরে জীবন কাটাতে হয়েছে'।

এইরূপ আরও একজন স্থানীয় মানুষ বাদল সামন্ত (নাম পরিবর্তিত) যার সাথে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসের ৩ তারিক সাক্ষাৎকার হয়। তিনি বলেন ২০০১ সালে তাঁর ৫ বিঘা জমির পাকা ধানে তৎকালীন শাসকের স্থানীয় নেতারা আগুন ধরিয়ে দেয়। তাঁর ব্যাখ্যায় 'এলাকায় আমার বাবা কংগ্রেস করত। ২০০১ সালে আমাদের একই দাগে ৫ বিঘা জমির ধান আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। তখন ধান কাটার সময় চলছিল। আমারও ধান কেটে জমিতে শুকনোর জন্য রোদে বিছিয়ে রেখেছিলাম। এই সময়ে স্থানীয় কয়েকজন নেতা জমি জবর দখল করে নেয়।

প্রশ্ন ওঠে, যে সরকার মেহনতি মানুষের পক্ষে, তারা এই অভাবের দিনে কিভাবে পাকা ধানে আগুন দিল। 'সেই সময়ে গ্রামের প্রায় অর্ধেক মানুষের বাড়িতে তিন মাস চাল থাকত না। গ্রামেরেই মানুষ ভিক্ষে করতে বেরত অন্যের বাড়িতে। আমাদের তো ওই পাঁচ বিঘা জমিই পরিবারের এক মাত্র ভরসা, আমরাও তো মেহনতি মানুষ। তাঁর মতে এই ধান গুলো যদি আগুন না দিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যে বিলিও করে দিত তাহলেও মন সান্ত্বনা পেত'।

স্থানীয় আরও কিছু আলাপচারিতায় যে খণ্ড খণ্ড চিত্র উঠে আসে তার প্রেক্ষিতে, এবং অন্তত এই সমীক্ষায় কিছু উত্তরদাতার মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, এটা বলা যায় যে অপারেশান বর্গার পরে গ্রামে গ্রামে জমিদারের জমি অধিগ্রহণের যে কাজ শুরু হয়ক্রমশ তার মূল লক্ষ যেন হয়ে দাঁড়ায় বিরোধী রাজনৈতিক পরিবারের জমি, সে ছোট বা বড় কৃষক যেমনই হোক না কেন। শুরুর দিকে পার্টির উচ্চ পর্যায়ের নেতারা বলতেন জমিতে লাল ঝাণ্ডা পুতে দিতে, জমি কেড়ে নিতে, তিরধনুক নিয়ে জোতদার দের রুখে দিতে । এর ফলে গ্রামে গ্রামে বিরোধীদের জমি জায়গা,

খাল বিল দখল হতে থাকে। এটা চলতে থাকে প্রায় ২০০৫ -০৭ পর্যন্ত, অর্থাৎ যখন থেকে বিরোধী দল হিসেবে TMC (Trinamool Congress) রাজ্যের ক্ষমতার দোরগোড়ায় আসে।

অপারেশান বর্গার ফলে একই সময়ে দুটি ভিন্ন চিত্র ধরা পড়ে। তাহল এক শ্রেণীর গরীব মানুষ জমির মালিক হওয়ার আশায় বুক বাঁধল। অপর দিকে আরেক শ্রেণীর মানুষ জমি ও ভিটে হারা হতে থাকল। নিম্ন সুন্দরবনে এই দুই শ্রেণী মানুষের লড়াইয়ের ফলে স্থানীয় রাজনীতি ক্রমশ হিংসাত্মক হয়ে পড়ে। সুতরাং এটা বলা যায় যে অপারেশান বর্গার সাফল্য ও সমস্যা দুটোই থাকলেও নিম্ন সুন্দরবনে তার বাস্তবিক কার্যকারিতা কতটা রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বরং বলা যায় অপারেশান বর্গার সরাসরি প্রভাব না থাকলেও এর পরোক্ষ প্রভাবেই গ্রামীণ রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামো গড়ে উঠেছে। পঞ্চায়েতিরাজ ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, বাংলায় বাম সরকারের ভূমি সংস্কার, ৬০-৭০ এর দশকে কৃষি ক্ষেত্রে 'সবুজ বিপ্লব' ও সর্বোপরি ৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে অর্থনৈতিক উদারিকরণের ফলে ভারতের গ্রাম সমাজে পরিবর্তন হতে থাকে। গ্রামীণ সমাজ ও তার অর্থনৈতিক কাঠামো নতুন ভাবে গড়ে ওঠে।

অর্থাৎ উপকূলীয় নিম্ন সুন্দরবনের কৃষির গড়ণ বুঝতে হলে চিরাচরিত কৃষির তাত্ত্বিক কাঠামো এখানে চলে না। তুলনায় মোড়ল ব্যবস্থা ও পরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ (নতুন) অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারকারি পরিবার, বিভিন্ন পরিবেশগত স্থানীয় সমস্যা, বিভিন্ন স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতাদের ভূমিকা ও দলীয় রাজনীতি এই অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সম্মিলিত ভাবে অবদান রাখে।

পরিবর্তনের তাগিদ ও কৃষি উৎপাদনঃ-

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কৃষিই ছিল ভারতের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু গ্রাম ভারতের কৃষির এই চিত্র বর্তমান সময়ে অনেকটায় ফিকে হয়ে পড়েছে। ক্রমশ কৃষি কাজ ছেড়ে মানুষ ভিন্ন জীবিকায় প্রবেশ করছে। GDP (Gross Domestic Product) এর ক্ষেত্রেও কৃষির অবদান কমছে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা, আধুনিক জীবন যাপন, কম আয়, অত্যাধিক পরিশ্রম ও সময় বেশির প্রয়োজন এই সব নানান কারণে মানুষ আজ আর চাষি হতে চায় না। যদিও অর্থনৈতিক

উন্নয়নের তথাকথিত যুক্তিতে কোন দেশের GDP এর ক্ষেত্রে কৃষির অবদান যতটা কম থাকে সেই দেশ ততটাই উন্নত। এবং অপর যুক্তি হল উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী কাজে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে কৃষিতে নিযুক্ত কর্মীদের অংশও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।[৪২] সুতরাং উল্টোভাবে ভাবলে বিষয়টি দাঁড়ায় এইরূপ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বড় শর্তই হল কৃষির গুরুত্ব হ্রাস? তাহলে প্রশ্নটি দাঁড়ায় উন্নত দেশে যদি কৃষিক্ষেত্রে খুব কমেই শ্রমিক ব্যবহার করে বেশি উৎপাদন হয় তাহলে ভারত তথা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য নয় কেন? নাকি পুঁজিবাদী 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল'-এর ধরনই এমন যে, কৃষি শ্রমিকের দল যেন এক প্রকার বাধ্য হয় শিল্পক্ষেত্রে কম বেতনে কাজ করতে। অথবা কৃষিকাজে যুক্ত মানুষের জমি চাই, শ্রম চাই না । অর্থাৎ আমরা এখানে বলতেই পারি আধুনিক রাষ্ট্র তার নাগরিককে শিল্প বা পরিষেবা ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে না পারার কারণে এক বৃহত্তর অংশকে কৃষি ক্ষেত্রে 'Reserve Army' হিসেবে রেখে দেয়। অথচ রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় এই যে মডেল যেখানে একটি রাষ্ট্র যতটা উন্নত, ঠিক ততটাই বা আরও বেশী করে, যেন কৃষির সাথে যুক্ত মানুষের দলকে দারিদ্র্যের গভীরে প্রবেশ করাবে? তা হলেও অন্তত উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর ক্ষেত্রে এটা হয় না। আসলে এই যে বক্তব্য 'যে দেশের মোট উৎপাদনে কৃষির অবদান যতটা কম বা যে দেশের কৃষিক্ষেত্রে যতটা কম দক্ষ শ্রমিক যুক্ত থাকে সেই দেশ ততটাই উন্নত' এই তাত্ত্বিক কাঠামোটি আজকের সময়ে একটু গোলমেলে বলেই মনে হয়। যদি এই ভাবে বলা হয়, যে দেশে মোট শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে যত কম দক্ষ শ্রমিক যুক্ত সেই দেশ তত বেশী অনুন্নত। অর্থাৎ আমার মতে এই তাত্ত্বিক কাঠামোটি নতুন ভাবে ভাবা উচিত। কারণ পৃথিবীর ধনী দরিদ্র সমস্ত দেশেই মোট উৎপাদনে কৃষির অবদান কমছে। ক্রমশ কৃষি ক্ষেত্র থেকে শ্রমিক দলে দলে শহরের বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রে জীবিকা নির্বাহ করছে। তুলনায় ক্রমশ দেশের মোট উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জমির পরিমাণ কমছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধির ফলে ক্রমশ কৃষি উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। গ্রামের ভেতরেই অ-কৃষি কাজের মাধ্যমে জীবিকা অন্বেষণ করার সংখ্যা বাড়ছে।

[৪২] ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি, অশোক রুদ্র, পৃ -১

অর্থাৎ এক কথায় বলতে হলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষির অভ্যন্তরের বিভিন্ন অনুমোদিত যুক্তি ও বিধিগুলোকেও পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। যেমন আগেই উল্লেখ করেছি যে, নিম্ন সুন্দরবনের কৃষি ব্যবস্থাকে বুঝতে হলে পুরোনো চালিত কৃষি তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে সম্ভব নয়। তেমনি এই উক্ত যুক্তিও বর্তমান কৃষি ব্যবস্থাকে বোঝার জন্য কতটা তাৎপর্য রয়েছে তা একটু ভেবে দেখা দরকার। এর পরেও, কৃষি ব্যবস্থা তার নিজের ভেতর থেকেই ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলো দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, প্রথমত রাষ্ট্রীয় আইন কানুনের দ্বারা, সরকারি অপদার্থতার ফলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ও দ্বিতীয়ত কৃষির নিজস্ব সত্ত্বা যা কৃষক সমাজ নিজেই পরিবর্তন করে চলেছে। এইরূপ নানা কারণ থাকলেও বিশেষত ১৯৫৫ সালের 'ভূমি সংস্কার', ৬০-৭০ এর দশকের 'সবুজ বিপ্লব' এবং ৯০ এর দশকে জাতীয় স্তরে 'বাজার অর্থনীতির' নীতি গ্রহণের ফলে ভারতীয় গ্রাম সমাজে ভাঙ্গা ও গড়া সমান্তরাল ভাবে চলেছে। ১) ভূমি সংস্কারের ফলে জমির মালিক পরিবর্তন হল। ২) সবুজ বিপ্লবের ফলে খাদ্য স্বনির্ভর ও উৎপাদন বৃদ্ধি হল। ৩) ৯০ এর দশকে থেকে কৃষি উৎপাদন ব্যাপক ভাবে বাজারমুখি হল।

এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারি আইন ও নীতি ঠিক কতটা ভূমিকা রয়েছে তাও আলোচনা করা প্রয়োজন। কতগুলো আইনের সমষ্টির মাধ্যমে একটি দেশের কৃষি নীতি গ্রহণ করা হয়। সেই কৃষি নীতির মাধ্যমে একটি দেশের সম্পদের সুষম বণ্টন ও খাদ্য নিরাপত্তা যেমন গড়ে তোলা যায় তেমনি গ্রামীণ সমাজে নির্ভর যোগ্য জীবিকা গড়া ওঠার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঔপনিবেশিক সময়ে ব্রিটিশ অপশাসনের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক দৈন্য এক চরম শিখরে পৌঁছায়। সম্পদের অসম বণ্টন ও ভারতবাসীর প্রতি পরিকল্পিত অবজ্ঞাই ছিল ইংরেজ শাসকের শাসন নীতি। জমি থেকে কর আদায়ের জন্য জমিদারী, মহলওয়ারী, রায়তী, এক সালা ও দশ সালা নীতি গ্রহন করে। এর ফলে দেশের সমস্ত কৃষি জমি নির্দিষ্ট কিছু ইংরেজ দালাল ভুঁইফোড়দের হাতে চলে আসে। বস্তুত পক্ষে এর পর থেকেই ভারতবাসীর জীবনে চূড়ান্ত দারিদ্র্য নেমে আসে। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক কালের জমিদারী প্রথার বিন্যাস ঘটিয়ে উদ্বৃত্ত জমি সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে বণ্টন করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে ভূমি সংস্কার ও নতুন নীতি গ্রহণ যা এক মাত্র পদ্ধতি, যেখানে দ্রুত কৃষি জমির বণ্টন, খাদ্যের মান

ও মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব। এই বিষয়ে ১৯৪৭ সালে প্রথম (FGPC) 'The Food Grains Policy Committee' গঠিত হয়, যার মধ্য দিয়ে খাদ্যের মূল্য নির্ধারণ ও সুষম বণ্টন করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালে জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য স্বাধীন ভারতে প্রথম ভূমি সংস্কার শুরু করা হয়। এই সময়ে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, অসম, বোম্বাই এই রাজ্যগুলোতে ভূমি সংস্কারের কাজ শুরু হলেও কংগ্রেস সমর্থিত জমিদারদের দ্বারা বাধা এলো বেশি[৪৩]। যাই হোক, দীর্ঘ প্রতিরোধ ও আইনি জটিলতা ইত্যাদির পরেও ভূমি সংস্কার হল এবং প্রায় ২ কোটি প্রাক্তন প্রজা যারা এখন জমির মালিকে পরিণত হয়েছে।[৪৪] এর পরবর্তী সময়ে ভূমি বিষয়ক আরও ছোট বড় কিছু নীতি গ্রহণ করা হয়, যেমন 1960 সালে Intensive Agriculture District Program (IADP)। আমেরিকান কোম্পানি Ford এর সহযোগিতায় ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রথমে কয়েকটি জেলাকে বেছে নেওয়া হয়। যেখানে উন্নত কৃষি কাঠামো, সেচ ব্যবস্থা, জমির উর্বরতা এই ধরনের কয়েকটি বিষয়কে সামনে রেখে প্রকল্পটি পরিচালিত করা হয়। এর ফলে ভারতে বৈজ্ঞানিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষির উন্নতিকল্পে এই প্রকল্প পরীক্ষামূলক ভাবে পরিচালিত করা হয়। এর পরবর্তী সময়ে ১৯৬৫ সালে The Commission for Agriculture Cost and Prices (CACP) গঠন করা হয়। এবং এর মাধ্যমে কৃষি শস্যের নূন্যতম সমর্থন মূল্য MPS (Minimum Support Price) নির্ধারণ করার কথা সুপারিশ করা হয় ও একই বছরে The Food Corporation of India (FCI) গঠনের মাধ্যমে খাদ্যের গুণমান, সুষম বণ্টন ও এই ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধ ইত্যাদি ছিল এর মূল লক্ষ্য। ঠিক এর পরের বছর ১৯৬৬ সালে ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে সবথেকে বিতর্কিত 'সবুজ বিপ্লবের' নীতি গ্রহণ করা হয়। এই নীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল অগণিত ক্ষুধার্ত ভারতবাসীর দ্রুত খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি করা। এর ফলে কৃষি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে, প্রযুক্তি, উচ্চফলনশীল বীজ, কীটনাশক ও সারের ব্যবহার, বিদ্যুতায়ন, কৃষিঋণ প্রদান করা, সেচ ব্যবস্থা, মৃত্তিকা পরীক্ষা ও কৃষি জ্ঞানের সম্প্রচারণ ইত্যাদির মান উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এর ফলে ভারত চিরক্লিস্ট, ভুখা দেশ থেকে খাদ্যে স্বনির্ভর দেশে পরিণত হয়েছে। এর সুফলও পাওয়া গেল দ্রুত। ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে ১৯৭০-

[৪৩] ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০, বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি পৃঃ ৪৪৭।

[৪৪] তদেব

৭১ সালের মধ্যে ভারতে খাদ্য শস্য বৃদ্ধি পেল প্রায় ৩৫ %। খাদ্যে স্বনির্ভর হওয়ার পর ভারত সরকার দুধ, মাছ মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে ১৯৮২ সালে 'National Bank for Agriculture and Rural Development (NABRD)' গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষি পরিবারগুলোকে সহজে কৃষিঋণ প্রদানের মধ্য দিয়ে ফিসারি, পোল্ট্রি, গরু ও ছাগল ইত্যাদি প্রতিপালন করে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। এই ভাবে নানান সময়ে কৃষির উন্নতি কল্পে সরকার বিভিন্ন নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বর্তমান ভারত বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য শস্য রপ্তানির দেশে পরিণত হয়েছে। ৯০ এর দশকে ভারত সরকার সার্বিক উন্নয়ন কল্পে 'বাজার অর্থনীতির' পরিকল্পনা গ্রহণ করে। নতুন এই অর্থনীতির পরিকল্পনার ফলে ভারতীয় অর্থ-রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। যার ফলে শুধু কৃষি ক্ষেত্রে নয় সামগ্রিক উন্নয়নে এর প্রভাব উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা রাখে।

এই অর্থনৈতিক সংস্কার নিম্ন সুন্দরবনের কৃষি ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়েছে। ভারতে কৃষি পরিবর্তনের এইরূপ নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কিরূপ প্রভাব পড়েছে, তা সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করব। কয়েকটি নমুনার মাধ্যমে আমরা তা বোঝার চেষ্টা করব। ৬০-৭০ এর দশকের সবুজ বিপ্লব, ৯০ এর দশকে বাজার অর্থনীতি ও সর্বোপরি ২০০৯ সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আইলার প্রভাবে স্থানীয় কৃষি ক্ষেত্রে কিরূপ প্রভাব পড়েছে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৯৬৬ সালে সবুজ বিপ্লবের নীতি গ্রহণ করা হয়। তারপর থেকে প্রায় বর্তমান সময় পর্যন্ত কৃষি ক্ষেত্রে নানান প্রকল্প গ্রহণ করে চলছে। কিন্তু এটা বলা কঠিন, ঠিক কোন সময় পর্যন্ত এই সবুজ বিপ্লবের সময় কাল ধরা যায়। তবে আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়কে ধরে নিয়ে আলোচনা করতে পারি। কারণ ভারতের পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম উত্তর প্রদেশের উর্বর জমি ছাড়া অন্য কোথাও সবুজ বিপ্লবের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নি। এই অঞ্চলগুলোতে সবুজ বিপ্লবের ভালো ফল হওয়ায় জাতীয় স্তরে তার আনুসঙ্গিক আরও বিভিন্ন নীতি পরবর্তী সময়কালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রহণ করা হয়। তথাপি আমার ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের প্রভাব কেমন ছিল? তা বোঝার চেষ্টা করি। তাতে যা বুঝলাম তা হল, ১৯৭৪ সালের 'Minikit Programme for Rice, Wheat and coarse Cereals' এবং ১৯৮২ সালে NABARD এই দুটো প্রকল্পের কিছু কিছু নমুনা স্থানীয় কৃষক দের কথোপকথনের মাধ্যমে উঠে এসেছে।

স্থানীয় কৃষকদের মতে ১৯৯৫-৯৬ সালের পর থেকে এই অঞ্চলে মিনিকিট ধানের চাষ শুরু হয়েছিল। সরকারি কোন উৎসাহ বা নির্দিষ্ট প্রকল্পের দ্বারা কৃষকরা এই ধানের চাষ শুরু করেনি। বরং বীরভূম, নদীয়া, বর্ধমান এই সব অঞ্চলে মিনিকিট ধানের ফলন ভালো হত বলে সুন্দরবনের কৃষকও বাজার থেকে বীজ কিনে চাষ করেছিল। বেঁটে গাছ, ফলন ভালো, কম সময়ে উৎপাদন ইত্যাদির জন্য কৃষক এই বীজের মাধ্যমে চাষ শুরু করে। কিন্তু অচিরেই এই ধানের চাষের ক্ষেত্রে কৃষকরা কিছু সমস্যায় পড়ে। বিশেষ করে নিম্ন সুন্দরবনের ক্ষেত্রে এই মিনিকিট ধানের চাষই প্রথম যেখানে বাজার থেকে উচ্চফলনশীল বীজ কিনে এনে কৃষক চাষ করে। কিন্তু এই বীজের সাথে পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় রোগ প্রতিরোধ, সার প্রয়োগ, ইত্যাদির সাথে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলত ফলন ভালো হত না। তাই অচিরে মিনিকিট ধানের চাষ বন্ধ হয়ে যায়। NABARD সবুজ বিপ্লবের আরও একটি প্রকল্প যা একেই সময়ে সুন্দরবনে আংশিক প্রভাব ফেলে ছিল। এই প্রকল্পটি দুইভাবে পরিচালিত করা হয়েছিল। এক সরাসরি পোল্ট্রি ব্যবসায় উৎসাহ দেওয়া এবং দুই ছোট ছোট কৃষি ঋণ প্রদান করে কৃষি শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। তবে এই প্রকল্পটি সরকারের দ্বারা প্রচারিত ও স্থানীয় মানুষদের উৎসাহ প্রদান করেছিল। প্রথমত, ১৯৯৫-২০০০ সালের মধ্যে পোলট্রি চাষের ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। মহিলারা তা প্রতিপালন করে পরিবারের দৈনন্দিন খাওয়ার ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাজারহাটও পরিচালনা করত। দ্বিতীয়ত, কৃষি শস্যের উৎপাদন ও খাদ্যের গুনমান বৃদ্ধির জন্য কৃষি ঋণের কথাও বলা হয়েছিল। তবে আমার ক্ষেত্রসমীক্ষায় অন্তত একজনকেও পাওয়া যায়নি যে কৃষিঋণ নিয়ে চাষ করেছে[৪৫]। তাছাড়া নিম্ন সুন্দরবনের ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের আর তেমন কোন প্রভাব পড়েছে বলে স্থানীয় মানুষ মনে করতে পারছে না বা কোন সরকারি তথ্যও পাওয়া যায়নি। ৯০ এর দশকের বাজার অর্থনীতির প্রভাবও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপলব্ধি করা যায়। আমার ক্ষেত্র সমীক্ষার চারটি মৌজায় এই সময় থেকে কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার দেখা যায়। তার মধ্যে মূলভূমির ও বদ্বীপ এর ফলাফল যদিও ভিন্ন, এই ভিন্ন ফলাফলগুলো পরবর্তী অধ্যায়ে আলোকপাত করব তাই

[৪৫] এর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত এমনিতেই লোনা জলের প্রভাবে উৎপাদন কম, আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে যে কোনও সময়ে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হতে পারে। ব্যাংকের জটিলতা, এবং লোণের পরিমান এতটায় কম যে কৃষক এর মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে বিশেষ সুবিধা না হওয়ার কারণে স্থানীয় অঞ্চলে কৃষি লোণ তেমন সাড়া ফেলেনি।

এখানে বিশদে বিশ্লেষণ করব না। মৌজার কিছু কিছু জমি আছে যেগুলো তুলনায় উর্বর। সুন্দরবনের মাটির (গুণাগুণের) বৈশিষ্ট একটু আলাদা। একই গ্রামে কোন কোন জমি উর্বর এবং এটা একনাগাড়ে কয়েক বিঘা হতে পারে বা কোথাও কোথাও একটি সমগ্র গ্রামও হতে পারে। আবার তারপরেই এঁটেল ও অনুর্বর মাটি হওয়ায় কৃষি উৎপাদন কম হয়। যেসব জমির মালিকের এইরূপ উর্বর কিছু জায়গা ছিল সেখানে প্রথম প্রথম উচ্চশীল বীজের চাষ শুরু হয়। উচ্চশীল বীজের সাথে সাথে প্রযুক্তি, সার, কীটনাশকের ব্যবহারও বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে সার, কীটনাশক, কৃষি সরঞ্জাম বিক্রির দোকান। নিম্ন সুন্দরবনের এইভাবে কৃষির পরিবর্তন হতে থাকে। ২০০৯ সালের আইলার আগে পর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকে। কিন্তু আইলা দুর্যোগের পর থেকে এই পরিবর্তনের ধারা ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে।

এই পরিবর্তন গুলোকে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য আমরা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘Democresy and Economic Transformation in India’ প্রবন্ধের উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেন ১৯৬০ এর দশকের পর থেকে এশিয়ার দেশগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে এমন কিছু নীতি গ্রহণ করেছে যা আফ্রিকান দেশগুলোর থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন ও ভারতের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি যা বিশ্বের দুটি সর্বাধিক জনবহুল কৃষিপ্রধান দেশকে এক করে, সামাজিক পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়াকে গতিশীল করেছে যা মানব ইতিহাসে তার ক্রমপর্যায়াঙ্কিত মাপ ও গতির নিরিখে নজিরবিহীন অবস্থানে উঠে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় সমাজে ক্ষমতার মৌলিক কাঠামোর প্রশ্নে, বিশেষ করে কৃষকদের অবস্থানকে নতুন করে পুনর্বিবেচনা করার অবকাশ রয়েছে। চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন যে, তিনি এটা মনে করেন না পুঁজিবাদী অর্থনীতি কৃষক সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভেঙ্গে দিচ্ছে বা সর্বহারা কৃষকে পরিণত করছে। বিপরীতে তিনি মত দেন যে, ভারতে এখন পুঁজিবাদী শিল্প বিকাশের যে রূপগুলি চলছে তা কৃষক শ্রেণীর জন্য জায়গা করে দেবে যা সম্পূর্ণ নতুন ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে। নির্বাচনী গণতন্ত্রের শর্তে উদ্ভূত এই রূপগুলির বিশ্লেষণের জন্য নতুন ধারণাগত গবেষণার প্রয়োজন।[৪৬] বিগত কয়েক দশকে ভারতের কৃষি সমাজের এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক দীপঙ্কর গুপ্তের মতামত আলোচনা করার চেষ্টা করব। তিনি ভারতের গ্রাম সমাজের সাংস্কৃতিক

[৪৬] Partha Chattopadhyay, Democracy and Economic Transformation in India, EPW, P-53

পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কৃষির রূপান্তরের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, আমাদের বুদ্ধিজীবিরা এখনো এক বদ্ধ ধারণার মধ্য দিয়ে কৃষি ব্যবস্থার ব্যখ্যা করে চলেছেন। শুধু অর্থনীতি নয় সাংস্কৃতিক ভাবেও ভারতের গ্রাম এক ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছে। আর এই পরিবর্তনগুলো হচ্ছে বিশেষত কৃষির রূপান্তরের কারণে। এই রূপান্তরকে বোঝার জন্য আমাদের 'পুরনো বদ্ধ' চিন্তা ধারণা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এই রূপান্তরকে আরও বেশি করে বোঝা উচিত তার কারণ হল ভবিষ্যতের কৃষির উন্নয়ন ও পরিকল্পনার জন্য।[৪৭] তাঁর মতে গ্রামের ভৌগোলিক আকৃতি এক থাকলেও তার সমাজ তাত্ত্বিক বাস্তবতা ক্রমশ পরিবর্তন হয়েছে।

[৪৭] দীপঙ্কর গুপ্ত, ভারতের গ্রামঃ কোন পথে? অবভাস, এপ্রিল-সেপ্টম্বর, ২০০৭, পৃ ১০৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

আইলা উত্তর ভূমি রাজনীতি

স্থানীয় ভূমির সত্ত্বাঃ-

দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সরকারি ও বেসরকারি ভাবে নানান প্রকার পুনর্গঠন মূলক প্রকল্প শুরু হয়, যা আমি পূর্বের অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি। তাই এখানে তার বিস্তারিত উল্লেখ না করে বর্তমান অধ্যায়ের মূল বিষয়ে প্রবেশ করব। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে যতগুলো প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত নদী বাঁধ মেরামতকে কেন্দ্র করে সরকার ও স্থানীয় মানুষ উভয় পক্ষ এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কারণ ক্ষতিগ্রস্ত নদী বাঁধ মেরামতের জন্য ব্যাপক পরিমাণ জমির প্রয়োজন ছিল। সরকার সিধান্ত নেয় স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করে বাঁধ মেরামতের প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ শুরু হলে কতগুলো মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এবং এই মৌলিক প্রশ্নগুলো রাষ্ট্র ও স্থানীয় পরিবারগুলোর কাছে যেমন ‘নতুন ও ভিন্ন’ অভিজ্ঞতা, তেমনি সুন্দরবনের বসতি, প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থা ও এই সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের সাথে স্থানীয় মানুষের সম্পর্ক, এই রূপ নানান জটিল সমস্যার উৎস ও বটে। প্রথমত এই ক্ষেত্রে যে অনিবার্য প্রশ্ন গুলো উঠে আসে তা হল সরকার “ক্ষতিপূরণ” কাকে দেবে এবং কিভাবে দেবে? জমির মালিক কে? ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখেছি (বিশেষ করে নিম্ন সুন্দরবনে) এই ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে সুন্দরবনের প্রত্যেক (বড়, মাঝারি ও ছোট কৃষক যাদের নামে কিছু জমি আছে) পরিবার নতুন করে তাঁদের জমির সঠিক ‘নথিভুক্তি’ (জমির রেজিস্ট্রি) করণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করেছে। কারণ ক্ষতিপূরণের প্রথম ‘শর্ত’ ছিল পরিবারগুলোকে নির্দিষ্ট জমির জন্য নির্দিষ্ট পর্চা ও দলিল দেখাতে হবে ও বকেয়া খাজনা পূরণ করতে হবে।উক্ত পরিবারগুলোর কাছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর কোনটাই ছিল না।[৪৮]

[৪৮] ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখেছি সুন্দরবন বাসী বেশির ভাগ পরিবারে জমির (সরকারের কাছে) সঠিক নথী নেই। স্থানীয় মানুষ এর আগে পর্যন্ত জানত যে জমির দলিলই হল মালিকানার মূল নথী। জমির পর্চা, দাগ নম্বর

কেন ছিল না? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের স্থানীয় পরিবারগুলোর মধ্যে জমির নির্দিষ্ট নথিভুক্তিকরণ, খাজনা প্রদান ও জমি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আইন কানুন সম্পর্কে নতুন আশংকা ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। অর্থাৎ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উন্নয়নের যুক্তিতে নতুন করে রাষ্ট্রের উপস্থিতির ফলে স্থানীয় অঞ্চলের 'প্রচলিত জ্ঞানের' সাথে রাষ্ট্রীয় 'বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের' দ্বন্দ্বতৈরি করে এক 'নতুন ভাষ্য'। আর এই ভাষ্য তৈরি করে সুন্দরবন সম্পর্কে নতুন 'পরিচিতি'।

প্রশ্ন হোল, দুর্যোগের ফলে রাষ্ট্রের উপস্থিতি ও নতুন এই ভূমি বিষয়ক পরিচিতির সাথে স্থানীয় মানুষ কতোটা আত্মস্থ হতে পারছে? উক্ত প্রকল্পের ফলে স্থানীয় অঞ্চলে জমির 'মূল্য' এর ক্ষেত্রে কি কোন প্রভাব পড়েছে? নতুন করে খাজনা ব্যবস্থার প্রচলন, ভূমি বিষয়ক প্রভাব বিস্তারকারী নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা, ভূমি কেন্দ্রিক নতুন রাজনীতি অর্থাৎ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সুন্দরবন অঞ্চলে ভূমি ব্যবস্থায় নতুন করে যে পরিবর্তন গুলো ঘটছে - তার অবকাঠামোর 'ফর্ম' বোঝাটাই বর্তমান অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়।

কৃষি ব্যবস্থার মৌলিক উপাদানই হল ভূমি। এবং স্থানীয় অঞ্চলের 'ভূমি ও ভূমি কাঠামোর' অন্তর্নিহিত সম্পর্ককে 'ভূমি ব্যবস্থা' বলে। ভূমির অর্থনৈতিক মুল্যের পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরে মানুষ এর সাথে জড়িত থাকে। খাদ্য উৎপাদন, দারিদ্র বিমোচন, জলবায়ু পরিবর্তন, শিল্প কলকারখানা এইরূপ নানান দিক থেকে ভূমির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যদিও ধীরে ধীরে জমির উৎপাদন মুল্য কমে যাওয়ার[৪৯] ফলে কৃষি ক্ষেত্র থেকে মানুষ ভিন্ন জীবিকায় প্রবেশ করছে।[৫০] আবার দেখা যাচ্ছে গ্রামের মানুষ শুধু যে ভিন্ন জীবীকার জন্য শহরে পাড়ি দিচ্ছে তা নয়। বর্তমানে গ্রামেই এই রূপ নানান জীবিকা গড়ে উঠেছে যেখানে কৃষি ছাড়াও পরিবারগুলো জীবিকা নির্বাহ করছে।[৫১]

ইত্যাদির জটিলতা, জমি বেচা কেনার সঠিক সরকারি নিয়ম নীতির অস্বচ্ছতা ও সর্বোপরি উক্ত বিষয়ে রাষ্ট্রীয় উদাসীনতার কারণে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব রয়েছে।

[৪৯] কৃষি ব্যবস্থার সামগ্রিক ভাবে গুরুত্ব কমার অর্থ বোঝাতে উৎপাদন 'মুল্য কমে যাওয়ার' শব্দটি ব্যবহার করেছি।

[৫০] Mkhize, Binswanger, The Stunted Structural Transformation of the Indian Economy Agriculture, Manufacturing and the Rural Non-Farm Sector, 2013, পৃঃ ৭। এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে দীপঙ্কর গুপ্তের লেখা, ভারতের গ্রামঃ কোন পথে?, ২০০৭, অবভাস, পৃঃ ১১৯

[৫১] তদেব।

আইলা বিপর্যয়ের (২০০৯) পরে বিগত প্রায় ১৪ বছর খুব কাছ থেকে নিম্ন সুন্দরবনের জমির হালহকীকত অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সরকারি ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে ভূমির স্বত্বাধিকার নিয়ে যে প্রশ্ন গুলো ওঠে তার সঠিক যুক্তিভিত্তিক আলোচনা করতে হলে সরকারি তথ্যের থেকেও ক্ষেত্রসমীক্ষা এই ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োজন। কারণ যেসব ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো বেশির ভাগ ব-দ্বীপ অঞ্চল নিয়ে গঠিত তাদের প্রত্যেকটিতে ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। স্থানীয় অঞ্চলের একজন সাধারণ নাগরিক হওয়ায় এই পরিবর্তন গুলোকে দীর্ঘ সময় ধরে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। এই অনুধাবনের পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে হয়েছে। কখনো একজন সমাজ বিজ্ঞানীর ভূমিকায় নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও যুক্তি ভিত্তিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। তেমনি আবার চায়ের আড্ডায়, স্থানীয় বাজার, পাড়ার মোড়ে গল্পের আসর, কখন চাষিদের সাথে কিংবা কখনো স্থানীয় ভূমি দপ্তরের সরকারি কর্মীর সাথে ব্যাক্তিগত আড্ডায় বোঝার চেষ্টা করেছি এই পরিবর্তনের নির্দিষ্ট ‘ফর্ম’-কে। এবং কোন অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থার সম্পর্কে বুঝতে হলে তার চলমান অবস্থা (ব্যবস্থা) সম্পর্কেও বোঝা উচিৎ। তাই সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করেছি। এই যুক্তির খাতিরে সন্দর্ভের বর্তমান অধ্যায়ে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করব। ভূমির এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্থানীয় অঞ্চলে আমলাতান্ত্রিকতা ও সম্পদের ধারণাগত পরিবর্তন, এছাড়াও যেমন স্বত্বাধিকার বিষয়ে জটিলতা ও তার ফলাফল, কিংবা আইলার পরে সম্পদ হিসেবে ভূমির গুরুত্ব, জমির মালিকের সংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রম মুল্য বৃদ্ধি, কৃষি ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকের বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি কৃষি সংস্কৃতির পরিবর্তন ইতাদি এই অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। এই প্রেক্ষিতে আমরা পাথরপ্রতিমা ব্লকের ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাসে আলোকপাত করার পরে অধ্যায়ের মূল বিষয়ে বিশ্লেষণ করলে আলোচনাটি যুক্তি সঙ্গত হবে বলে মনে করি।

ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাসঃ-

কোন অঞ্চলে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন বুঝতে হলে অঞ্চলটির ভূমি কাঠামোর ইতিহাস সম্পর্কে অনুধাবন না করলে রাষ্ট্রের সাথে কৃষক ও জমির অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক বোঝা অসমাপ্ত থেকে যায়। ভারতের নিম্ন সুন্দরবনের বসতি গড়ে ওঠার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা

ও সরকারি তথ্য অনুযায়ী নিম্ন সুন্দরবনে ১০০ থেকে ১২০-৩০ বছর মধ্যেই বসতি গড়ে উঠেছে (দেখুন, S, O' Malley; 1914; Ascoli; 1921/2002; Pargiter 1934/2020)। ঔপনিবেশিক কালে ব্রিটিশরা অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের জন্য বর্তমানের মেদিনিপুর, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড থেকে (সহজে ও সস্তায়) শ্রমিক নিয়ে এসে লবণাক্ত অনাবাদি জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করেছে (দেখুন, Jalais; 2011; Mukhopadhyay; 2017)। এই ভাবে ক্রমশ আবাদি জমিতে পরিণত হওয়ার পরে ব্রিটিশরা সেই জমিকে জমিদারদের কাছে বিভিন্ন লিজের মাধ্যমে প্রদান করে। কিন্তু যেহেতু এখানকার জমি খুবই অনুর্বর এবং জঙ্গল পরিষ্কার হলেও খাল, ডোবা ও লবণ জলের প্রাধান্যে উৎপাদন একেবারেই কম হতো। যে কারণে অনেক জমিদার এই জমি গুলো হয় পুরপুরি ছেড়ে দিত, আর না হয় স্থানীয় কোন কৃষক পরিবারকে নামমাত্র চুক্তিতে চাষ করার দায়িত্ব দিত। পরবর্তী সময়ে জমিদাররদের পক্ষ থেকে জমির তদারকির অভাবে এই সম্পদগুলো ধীরে ধীরে চাষি পরিবারের হয়ে যেত। তাই নিম্ন সুন্দরবনে জমিদারী ব্যবস্থা সম্পর্কে তেমন কোন ইতিহাস পাওয়া যায়না।

পাশাপাশি আমরা এই জেলার ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন কৃষি ব্যবস্থার ওপরে কতোটা প্রভাব ফেলেছে তাও একটু দেখে নেব। 'তেভাগা আন্দোলনের' কেন্দ্রস্থল থেকে পাথরপ্রতিমা ব্লকের দূরত্ব বড়জোর ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার এর মধ্যে হবে। ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তে কাকদ্বীপ ও নামখানা ব্লকে 'তেভাগা' আন্দোলন স্থানীয় অঞ্চলের কৃষি রাজনীতির উপর যে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ, লালগঞ্জ, উকিলের হাট গ্রামের কৃষক পরিবার গুলির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম স্মরণীয়, যা আধা-সামন্ত তান্ত্রিক (Semi fudal) কৃষি ব্যবস্থার অন্তিম জমানার (এক ব্যাপক পরিবর্তনের) 'ভিত' তৈরি হয়েছিল বলা যায় (দেখুন কুণাল চট্টোপাধ্যায়, ২০১০; পৃ; ৩৩, সুমিত সরকার, ১৯৯৩ পৃ; ৩৭৯?)।

অবিভক্ত বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহের ফলে ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্গাদারি (ভাগচাষী) আইন লাগু করে। ১৯৬৬ সালে পুনরায় খেয়াবাদে (সোনারপুর ব্লক, অবিভক্ত চব্বিশপরগণা) কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। অবশেষে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের 'ভূমি সংস্কারের' ফলে 'প্রজাস্বত্ব' আইন লাগু হয়।

‘ঐতিহাসিক ও সংগঠিত এই কৃষক আন্দোলন (তেভাগা) ও বাম সরকারের অপারেশন বর্গা’ নীতির প্রভাব রাজ্য তথা সমগ্র দেশেই পড়েছে। অথচ পাথরপ্রতিমা (বিশেষ করে ব্লকের নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী জায়গাগুলো) ব্লকে এই আন্দোলনের সুস্পষ্ট প্রভাব চোখে পড়ে না। এই অস্পষ্টতার কারণ সরকারের ঘোষিত নীতি ‘অপারেশন বর্গা’ মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে। অপারেশন বর্গার মূল রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল ‘জমিদারদের কাছ থেকে জমি নিয়ে সরকার “প্রজা ও ভূমিহীন”দের মধ্যে তা বিলি করবে’। পাথরপ্রাতিমা ব্লকেও ১৪৬৬০.১৪ একর ভেস্টেড জমির মধ্যে ৮৬০৪.২২ (ভেস্টেড) জমিকে ১৩,২৬৮ জন কৃষকদের মধ্যে পাট্টা দেওয়া হয়েছিল।[৫২] কিন্তু এখানে প্রশ্ন করা প্রয়োজন, ‘প্রজা ও ভূমি হীন এবং বর্গা ও পাট্টা দার’ কি এক?[৫৩] অপারেশন বর্গার ফলাফল ও এর ফলে পরিবর্তিত রাজনৈতিক চরিত্রগুলোকে আলোচনা করতে গেলে এই প্রশ্নগুলোকে আমাদের গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করাটা উচিৎ বলে মনে করি। এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল পাথরপ্রতিমা ব্লকের বিলি করা এই জমিগুলো কি জমিদারেরা চাষ করত? জমিগুলো কি তাদের দখলে ছিল? কিংবা মোট কত শতাংশ জমি ভেস্টেড জমি যেগুলো হয়ত চাষ হতোনা, না হয় বেনামি ছিল? কিংবা এই ভেস্টেড জমি গুলোর মধ্যে ঠিক কতোটা পরিমাণ কৃষি যোগ্য? এই প্রশ্ন গুলো এখানে খুবেই প্রাসঙ্গিক। কারণ এই প্রশ্ন গুলোর মধ্যেই ব্লকের ভূমি কাঠামোর আসল চরিত্র লুকিয়ে রয়েছে। কারণ এখানে অপারেশন বর্গার বয়ানটি

---

[৫২] পাথরপ্রাতি ব্লকে তৎকালীন বাম সরকারের আমলে ‘অপারেশন বর্গা নীতির’ ফলে ১৪৬৬০.১৪ একর ভেস্টেড জমির মধ্যে ৮৬০৪.২২ জমিকে ১৩,২৬৮ জন কৃষকদের মধ্যে পাট্টা দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ ব্লকের মোট ভেস্টেড জমির মধ্যে ৫৮.৬৯ % জমিকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। বাকি ৬,০৫৫.৯২ একর জমি সম্ভবত বর্তমান সরকারের অধিন রয়েছে। এই তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছে District Human Development Repprt; ২০০৯; অধ্যায় ৩, ৩.৪; Land Reforms, পৃ; ৩২-৩৪ থেকে।

[৫৩] ঔপনিবেশিক সময় থেকে স্বাধীনতা উত্তর ভারত তথা বাংলায় কৃষি ব্যবস্থার নানান আইন কানুনের বৈশিষ্ট দেখলে বোঝা যায় প্রজা শব্দটি একটু প্রাচীন যা পরবর্তী সময়ে নানান আইনের মাধ্যমে পরিবর্তন হয়ে বর্গা নামি পরিচিত পাচ্ছে। অর্থাৎ জমির সাথে তাঁর একটা নির্দিষ্ট ‘ভাগ’ রয়েছে। ওপর দিকে ভূমি হীন যারা জমির সাথে কোন প্রকার ভাগের অংশী ছিল না তাঁরা কেবল কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমের বিনিময়য়ে নির্দিষ্ট অর্থ পেত। পরবর্তীতে সময়ে তাঁদের মধ্যে অনেকেই অপারেশন বর্গার ফলে ‘পাট্টা দারে’ পরিণত হয়েছে। যাদেরকে যখন খুসি জমি থেকে উচ্ছেদ করা যায়। পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘ভূমি ও ভূমি সংস্কার সেকাল একাল’ ২০০৭।

(Discourse) অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়েছে।[৫৪] অর্থাৎ এখানে মূল প্রশ্ন হল বর্গা ও পাট্টা দারের মধ্যে। কারণ বর্গাদার হল ভাগচাষি ও পাট্টা দার হল 'সরকারি জমিকে নির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে ব্যবহার করার অধিকার' করাকে বোঝায়। স্থানীয় অঞ্চলে যাকে 'দখলী স্বত্বাধিকার' বলে। এই ক্ষেত্রে সমর সেন স্মারক বক্তৃতায় প্রনব বর্ধনের একটি বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ, তাহল 'পশ্চিমবাংলায় ভূমি সংস্কারের জন্যই অনেকটা উৎপাদন বেড়েছে। বিশেষ করে বর্গাদারি ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য। পাট্টা যেটা ভূমিহীনকে জমি দেওয়া, সেটাতে উৎপাদনশীলতা খুব একটা বাড়েনি, তার কারণ হচ্ছে পাট্টাতে ভূমির পরিমাণ খুবেই ছোট এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো অনুর্বর জমি, ফেলে রাখা জমি, অনাবাদি জমি, যার ফলে ওখান থেকে উৎপাদনশীলতা বিশেষ বাড়েনি' (দেখুন, বর্ধন; ২০১৩; পৃ ২২) । অর্থাৎ বর্ধনের এই বক্তব্য ও সরকারি তথ্য মিলে যা বোঝা যায় তাহল, প্রথমত, পাথরপ্রতিমা ব্লকে অপারেশন বর্গার ফলে ১৩,২৬৮ জন কৃষকে পাট্টা দেওয়া হল, কিন্তু বর্গা নয়। এই ক্ষেত্রে এটাও বোঝা গেল পাথরপ্রতিমা ব্লকে জমিদারী ব্যবস্থা বা বড় কৃষকের প্রাধান্য ছিলনা, তাই দীর্ঘ দিনের ভাগচাষী ব্যবস্থাও এখানে গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, অপারেশন বর্গার ফলে পাথরপ্রতিমা ব্লকের যেহেতু ভূমি হীনরায় পাট্টা পেয়েছে এই ক্ষেত্রে বর্ধনের যুক্তি অনুযায়ী বলা যায় যে অনুর্বর, অণুউৎপাদিত ভূমি বলেই সরকার সুন্দরবনের এইসব নিম্ন ভূমির ক্ষেত্রে গুরুত্ব কম দিত। ঠিক এই ক্ষেত্রেই উপরিউল্লিখিত প্রশ্নগুলোর তাৎপর্য রয়েছে। যেমন এখানে অপারেশন বর্গার সময়ে জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সরকারের সাথে কোণ গোষ্ঠীকে তিব্র সংঘাতে জড়াতে হয়নি। তাছাড়া ভূমির বেশ কিছু অংশ জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায় এই ব্লকের প্রায় ৮,৬০৩.৪২ একর জমি ভেস্টেড ছিল। সুতরাং এই ভেস্টেড জমি গুলোকে বর্গা দিতেও সরকারকে কোণ বেগ পেতে হয়নি। সুতরাং অপারেশন বর্গার ক্ষেত্রে জমি হস্তান্তরের কাজটি 'মসৃণ' ভাবেই হয়েছে। সম্ভবত এই মসৃণতার কারণে, জমি বিষয়ক কৃষকের অধিকার, রাষ্ট্রীয় আইন কানুন, সঠিক নথিপত্র ইত্যাদির এই অঞ্চলে বিশেষ অভাব প্রমাণ করে যে তেভাগা আন্দোলন ও অপারেশন বর্গার প্রভাব কতোটা পড়েছে এবং তা সন্তোষজনক কিনা এই প্রশ্ন অধরায় থেকে যায়।

[৫৪] আমি এখানে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ভিন্ন বলতে বোঝাতে চেয়েছি, সুন্দরবন ব্যাতিত রাজ্যের যেসব জেলাগুলোতে দীর্ঘ সময়ের জমিদারী ব্যবস্থা ছিল, কিংবা যে অঞ্চলের জমির দীর্ঘ দিনের একটি রাজনৈতিক ইতিহাস আছে সেই জেলা বা অঞ্চলের সাথে তুলনার ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি।

প্রনব বর্ধন ২০১৩ সালের 'সমর সেন স্মারক' বক্তৃতায়উল্লেখ করেন, বাম আমলে ভূমি সংস্কার নিয়ে কিছু ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায়, যে অঞ্চলে বিভিন্ন দলের মধ্যে 'রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা' বেশি হয়েছে সেই অঞ্চলে ভূমি সংস্কারও ভালো হয়েছে (দেখুন, বর্ধন; ২০১৩; পৃঃ ২৬)। এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ভাগ চাষিদের অধিকার রক্ষার্থে। মোট উৎপাদিত শস্যের তিনভাগের দাবিতে। আন্দোলন পৌছাল সশস্ত্র ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে তেভাগা কৃষক আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৭৭ সালে অপারেশন বর্গা নীতি গ্রহণ হল। ঐতিহাসিক তেভাগা কৃষক আন্দোলনের প্রভাবে সরকার কৃষক স্বার্থে নানান নিয়ম নীতিও গ্রহণ করে। তাই আমরা এটা আশা করতে পারি যে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে ও চলমান আন্দোলনের প্রভাবে (সেই অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থায়) রাষ্ট্র ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে একটি স্বচ্ছ বোঝাপড়া গড়ে উঠবে।[৫৫] এই ক্ষেত্রে তা কতোটা হয়েছে? অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে উন্নয়ন (কোন অঞ্চলের) কে তরান্বিত করে তা প্রমাণিত। কিন্তু কিছু প্রশ্ন তাও থেকে যায়। ধরা যাক কোন অঞ্চলে দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের ফলে ভূমি সংস্কার ভালো হয়েছে তাহলে তো সেই অঞ্চলের অন্যান্য ক্ষেত্রেও উন্নতি হওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যায়, যে পঞ্চায়েতে বিরোধীরা ক্ষমতা দখল করে সেই পঞ্চায়েতে উন্নয়ন মুলক কাজকর্ম স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। এটা যে শুধু গ্রামের রাজনীতিতে হয় তা নয়। কলকাতা শহরেও এইরূপ বহু ওয়ার্ড রয়েছে যেখানে বিরোধীরা জেতার ফলে শাসক দল ওই নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের উন্নয়ন মুলক পরিষেবা বন্ধ করে দেয়। আরও বলা যায় দীর্ঘ ৩ দশকের বাম জমানার অবসানে অন্যতম ভূমিকা রেখেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৭৩ টি জেলা পরিষদের আসনের মধ্যে CPI(M) পেয়েছিল ৩১ টি আসন, ত্রণমূল কংগ্রেস (TMC) ৩৪ টি সিটে জয়লাভ করে।[৫৬] শতাংশের হিসেবে সব থেকে এই জেলাতেই TMC বেশি ভোট পেয়েছিল। এই হিসেবে বলা যায় রাজনৈতিক

[৫৫] আমি এখানে বলতে চাইছি, ভূমি বিষয়ক রাষ্ট্রের যে নিয়ম কানুন যেমন দলিল, পর্চা, খাজনা, সীমানা এই বিষয় গুলো সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকার কথা এখানে উল্লেখ করছি। অর্থাৎ স্থানীয় মানুষের জমি কেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় আইন কানুন, কিংবা জমি কেন্দ্রিক অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের বর্তমান যা ধারণা তা আরও বেশি থাকাটাই তো দস্তুর। কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সরকারি তথ্যে তার ভিন্নতা প্রমান করছে।

[৫৬] https://www.youtube.com/watch?v=HqMDgZ6Gq7Y ।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে জেলার উন্নয়ন ভালো হওয়ার কথা। কিন্তু তার পরের বছর ২০০৯ সালে মে মাসে আইলা দুর্যোগের ফলে সুন্দরবনের ব্যাপক অংশে নদীবাঁধ ভাঙার কারণ হিসেবে বাম সরকারের অপশাসনকে দায়ী করে জেলা জুড়ে বাম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ তিব্র খোব প্রকাশ করতে দেখা যায়। এই বিষয়ে মানবি মজুমদারের লেখা 'Democracy in Praxis: Two Non-Left Gram Panchayats in West Bengal' প্রবন্ধটিকে উল্লেখ করতে পারি। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মাসে। এই প্রবন্ধের মূল বিষয় হল পশ্চিমবঙ্গের দুটি অ-বামশাসিত গ্রাম পঞ্চায়েতে 'স্থানীয় রাজনীতির ধারণা ও অনুশীলন' সম্পর্কে বোঝা। এই মৌজাগুলি হল দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ ব্লকের জগৎপুর ও পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর-২ ব্লকের চাটমা। প্রবন্ধে উল্লিখিত দুটি গ্রামের মানুষের দুটো বক্তব্য তুলে ধরব, জগৎপুর মৌজার ক্ষেত্রে বক্তব্যটি হল, 'Our conversation with the secondary school teacher who happens to be a Congress party leader gives an idea of perception held by this "opposition" GP. This School is run by a board consisting of non left factions. Hence, it is facing a lot of discrimination, he alleges. While all the secondary school in the district got building grant of Rs 1.4 lakh, this schools was deprived of the same. The member of Parliament local area development (MPLD) and member of the legislative assembly local area development (MLALAD) funds too are allegedly allotted on the basis party affiliation. Five teachers have retired from this school has 900 students and only 13 full time teacher three para-teacher. There are as many as 150 students in some classes. The only source of drinking water in the school is a tube well which has been out of service last three months. The block development officer (BDO) was informed as the tube well resinking fund had to be released by him. But till date the tube well is not repaired'. একই ভাবে আমরা চাতমা মৌজার প্রধানের বক্তব্যও তুলে ধরব, 'To mention once again, although the present panchayat board is dominated by the TMC/Congress combine, the state, zp and block level domination of the CPI(M) led left coalition continues; this is

the main reason the pradhan claims why he and his GP face biased treatment from the supralocal agencies. In comparison to other GPS in the block, this one receives lesser grant, making it difficult to carry out various developmental activities. Projects worth Rs 2 lakh and above are supposed to be vetted at the ps level. Unfortunately, now even relatively small projects are brought under the command of the panchayat samiti. No suballotment of work to his GP is taking place. In this way the activities of GPS under the control of political opponents are stalled by higher-tier panchay-ats. This also suggests that since many important developmental policies and decisions still remain centralised, GP level political competition alone may not generate adequate democratic pressure for inclusive growth'. সুতরাং আমার আগের বক্তব্য ও প্রবন্ধে উল্লিখিত উক্ত দুজন ব্যাক্তির বক্তব্য থেকে এই ধরনা আসতে পারি কি, রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকলে যে উন্নয়ন হবে তা ভারতবর্ষের (কিছুটা কেরালা ও তামিলনাড়ু ব্যাতিত) গণতান্ত্রিক পরিসরের ক্ষেত্রে বলাটা বোধয় কঠিন। কারণ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে থেকে ইন্টাল্যাকচুয়াল ভদ্র বাঙালির জীবনে এই সৌভাগ্য হইনি যে একটা নির্বাচনও রক্তপাত হীন ভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে, ক্রমশ তা বেড়েছে বৈকি।[৫৭] শুধু তায় নায় স্থানীয় সরকারের কাছে মানুষের দৈনিক যে দাবিদাওয়ার ক্ষেত্রেগুলোর কথা যদি উল্লখ করি তাহলেও একই চিত্র ধরা পরে। যেমন শাসক দলের নেতাদের সাথে স্থানীয় গ্রামের মানুষের দৈনিক যোগাযোগ হওয়ার যে মাধ্যম যেমন সরকারি বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের অনুদানের ক্ষেত্রে, ভোটার, রেশন, আধার কার্ডের সংশোধন, বিভিন্ন জাতিগত পরিচয় পত্র (S.C, S.T, O.B.C, E.W.S ইত্যাদি) খাজনা প্রদান, কৃষির নানান অনুদান ও ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিরোধী পরিবারের মানুষেরা এই পরিষেবাগুলো থেকে যে নানান ভাবে বঞ্চিত হন তা আমারা অবগত। সুতরাং শুধু কোণ বুথ, M.L.A, কিংবা M.P এলাকায় বিরোধীরা জয়ী হলে সেই ক্ষেত্রে শুধু সরকারি উন্নয়নের প্রকল্পের অসহযোগিতা আবদ্ধ থাকে না, যে এলাকায় শাসক দল জয়ী হয়

[৫৭] https://www.eimuhurte.com/panchayet-election-2023/death-toll-of-several-panchayat-election-in-bengal/#google_vignette

এবং সেই এলাকার যেসব মানুষেরা শাসক দলে ভোট প্রদান করেনি সেই পরিবারকেও প্রকল্পগুলো থেকে বঞ্চিত করা হয়। অর্থাৎ আমরা এখানে গণতন্ত্রের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা ও সম্মান রেখেই বলতে পারি যে যে গণতান্ত্রিক পরিসরকে শাসক দল (কোণ কোণ ক্ষেত্রে বিরোধী দলের ক্ষেত্রেও) ব্যবহার করে নির্বাচনে যথেচ্ছ হিংস্রতার (পশ্চিম বঙ্গের ক্ষেত্রে) ও ধর্ম, জাতের ভিত্তিতে (উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, দিল্লী, বিহার ইত্যাদি রাজ্যের ক্ষেত্রে বলা যায়) নির্বাচন বৈতরণীর পার হওয়ার (বলতে গেলে) বিনাবাধায় সহজ ও সস্তা অনুশীলন চলে সেখানে উন্নয়নের মানদণ্ড রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটু সরলি করন বলেই মনে হয়।

ক্ষেত্র সমীক্ষায় উন্নয়ন সম্পর্কে আরও কিছু তথ্যের জন্য স্থানীয় কয়েকজন মানুষের সাথে সাক্ষাতের কিছু নমুনা তুলে ধরব যারা, অভিজ্ঞতা ও অনুমানের মাধ্যমে বলছেন এর দুটো কারণ হতে পারে, এক বনজঙ্গল, ডোবা, খালবিল, নদীনালা এমনকি কোন কোন (তখনও) জমিতে নদীর লোনা জল দ্বারা দৈনিক প্লাবিতও হত। এইসব কারণ গুলোর জন্য বেশির ভাগ জমি আনাবাদি হয়ে পড়ে থাকত। তাই সরকার ও স্থানীয় পরিবারগুলোর পক্ষে জমিজমা নিয়ে কিছুটা অনুৎসাহ গড়ে উঠেছিল। এবং দুই নম্বর কারণ হল, এখানে সরকারের পক্ষে উন্নয়ন করা সম্ভব নয়; নদীর এত ভাঙ্গন, পর পর ঝড় বৃষ্টি বাড়ছে, আমরা ছোটবেলায় এতো ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা দেখেনি সরকার আর কত দেবে আমাদের,।[৫৮] তার মধ্যে এখানে একজনের বক্তব্য বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়, সরকার ও উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর ধারণা হল, "সরকার আমাদের কেন দেখবে? এখানে সরকারের কোন ইন্টারেস্ট নেই, আয়-ইনকাম নেই, তাও আইলা হয়েছে বলে (সরকারের) কিছু কাজকর্ম দেখছি"।[৫৯] অর্থাৎ স্থানীয় মানুষ জনের উক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এটা

---

[৫৮] এই কথা গুলো বলার সময়ে স্থানীয় কিছু মানুষ এর মনের ভাবনা যেন এইরূপে প্রকাশ পাচ্ছিল, সরকারের করুণা, দয়া ইত্যাদিতে তাঁরা বেঁচে আছেন। আসলে রাষ্ট্র যা চায় তা পূরণ করার সব থেকে 'নরম মাটি' হল প্রান্তিক এই জনবসতিগুলো। সহজে এদের (নাগরিক জীবনের) অধিকারকে অস্বীকার করা যায়। এদের সহজে রাষ্ট্রীয় 'অনুগত শ্রেণিতে' পরিণত করা যায়। তাই এই মানুষজন আইলা পরবর্তী উন্নয়ন কল্পে নিজেদের নূন্যতম অধিকারের ভাগি হয়ে (আইলা পরবর্তী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কিছু ত্রান তহবিল পেয়ে) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে।

[৫৯] এখানে উক্ত ব্যাক্তি উন্নয়ন সম্পর্কে বক্তব্যে বলেন যে আইলা হয়েছে বলে 'কিছু কাজ' দেখছি। অর্থাৎ স্থানীয় ব্যাক্তি (সরকারি) 'কিছু কাজকে' দুর্যোগ পরবর্তী উন্নয়ন বলে মনে করেন। কিন্তু সরকারি কিছু কাজ আর সার্বিক উন্নয়ন যে এক নয় তা হয়ত তাঁর ধারণা নেই।

অনুমান করা যায় যে, দুর্যোগ পরবর্তী উন্নয়নে তাঁদের অংশীদারিত্ব ঠিক কোথায়? কিংবা এই উন্নয়ন তাঁদের জীবনের মান ও নিরাপত্তায় কি ভূমিকা নেবে? অথচ এই মানুষগুলোই হল রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের 'সাবজেক্ট'।[৬০] এই প্রসঙ্গে আমি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা, 'ক্ষমতা প্রসঙ্গে দুই প্রেক্ষিতঃ গ্রামসি ও মিশেল ফুকো' প্রবন্ধের উল্লেখ করব। যেটি পারভেজ হোসেন এর সম্পাদনা, ২০০৭ সালে প্রকাশিত 'মিশেল ফুকো পাঠ ও বিবেচনা' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধ্যে পশ্চিমা মার্ক্সবাদী দার্শনিক গ্রামসির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারণা ও উত্তর আধুনিকতাবাদী তত্ত্বের পথিকৃৎ (পল) মিশেল ফুকোর ক্ষমতা তত্ত্বকে আলোচনা করেছেন আধুনিক রাষ্ট্রীয় খক্ষতার বয়ানের প্রেক্ষিতে। লেখকে এখানে প্রথমে গ্রামসির ক্ষমতা তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। 'গ্রামসির' মতে 'সাবলটার্ন' শ্রেণীর অবস্থান (রাষ্ট্রের অধীন) বোঝাতে কৃষক শ্রেণীর 'অধীনতা' ও একই সাথে কৃষকের রাজনৈতিক 'পরিচিতির ও রাজনৈতিক জ্ঞানে'র বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ায় ইতালীয় সমাজে পুঁজিবাদের উত্থানের পটভূমিতে সামন্ত শ্রেণীর 'প্রভুত্ব' ও কৃষক শ্রেণীর 'অধীনতার' দিকটি বিশেষ ভাবে গ্রামসি তুলে ধরেছেন। এই প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্কে তিনি সন্ধান করেছেন 'সংস্কৃতি ও ভাব দর্শনের' ক্ষেত্রে। প্রধানত গ্রামসির ভাবনাতে এখানে দুটি মৌলিক বিষয় কাজ করেছে, এক ইউরোপীয় মার্ক্স বাদের আদি পর্বে কৃষক শ্রেণীর প্রতি কৃষকের সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা, আচার-আচারন ও রাজনৈতিক সম্ভবনার সম্পর্কে যে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল গ্রামসি তার বিরুদ্ধে 'সাবলটার্ন' কৃষকদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক ধ্যানধারণার অনুসন্ধান করা ও বোঝার প্রয়োজনের কথা বলেছেন। এবং একই ভাবে

---

[৬০] আসলে রাষ্ট্র এই ধারণা পোষণ করে যে, উন্নয়ন সম্পর্কে স্থানীয় প্রান্তিক এই মানুষগুলোর কোণ ধারণা নেই। যদি তাই হয় তাহলে এই মানুষ গুলোর গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা, নির্বাচনে উন্নয়নের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট প্রদান, কিংবা গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরনের দাবিতে তো এই মানুষগুলোরও অংশগ্রহণ রয়েছে, যেমন, গ্রাম সংসদ, গ্রাম সভাতে অংশগ্রহণ করে স্থানীয় সরকার পরিচালিত করার ক্ষেত্রে এই মানুষগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। আসলে উন্নয়ন বৃত্তের একেবারেই প্রান্তে অবস্থান করার জন্য এই ধারণায় পোষণ করে যে 'আইলা হয়েছে বলেই (সরকারের পক্ষ থেকে) কিছুটা কাজকর্ম (উন্নয়ন) দেখছি'। আরও বলা যায় দশকের পর দশক ধরে সুন্দরবনের প্রকৃতির সাথে ভারসাম্য রেখে নদী বাঁধের রখনাবেক্ষন, কিংবা স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র রক্ষার্থে এই মানুষগুলোর ভুমিকাকে কিভাবে আমরা অস্বীকার করতে পারি? রাষ্ট্র এই প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে স্থানীয় জ্ঞানকেই অবজ্ঞ করে। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সচেতন ভাবেই এড়িয়ে যায় কারণ এর ফলে উন্নয়ন নামক আধুনিক মডেলকে সহজে পরিচালিত করা যায়। সহজেই সরলীকরণ করা যায় বলেই এড়িয়ে যায়। এই বিষয়ে আরও গভীরে আমি আমার গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

তিনি কৃষক শ্রেণীর 'চেতনার সীমাবদ্ধতার' ওপরও জোর দেন। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে প্রভুত্বের অধিকারি যে শ্রেণী তার চেতনার, সমগ্রতা, মৌলিকতা সক্রিয় ইতিহাস বোধের তুনায় কৃষক চেতনা একান্তভাবেই খণ্ডিত, নির্জীব ও পরাধীন। এমন কি বিদ্রহের মুহূর্তেও তার চেতনা বহুলাংশেই আচ্ছন্ন থাকে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শের আবরণে। আবার একই ভাবে গ্রামসি জোরের সঙ্গে কৃষকের ভাবাদর্শ ও জীবনযাত্রার জগতটিকে অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। অর্থাৎ কৃষক শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা ও পরনির্ভরতার কথা যেমন বলেছেন তেমনি একই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, 'কোণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কটা হল বিরোধিতার সম্পর্ক'। ফলত তার পরনির্ভরতার মধ্যেও কৃষকচেতনার বাস্তব প্রকাশ সময় সময় 'ইতিবাচক ভুমিকাও' গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং গ্রামসি এখানে বলতে চাইছেন শাসক শ্রেণীর ধর্ম বিশ্বাস ও তাদের অধীন গোষ্ঠীগুলির ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠানিক ভাবে এক হলেও তাদের আকার ও চরিত্র আলাদা, এমনকি বিরোধী রূপও নিতে পারে। এই বিরুদ্ধুতার থেকে জন্ম নেই 'সাবলটার্ন' শ্রেণীর প্রতিরোধ, যা সময়ে ক্ষমতাশীল শ্রেণীগুলোকে প্রতিরোধে ফেলতে সক্ষম হয়। সুতরাং চেতনার সিমাবদ্ধতার কথাই যদিও গ্রামসির লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে, তা সত্তেও এই চেতনার স্বতন্ত্র অভিব্যাক্তির সম্ভবনার ইঙ্গিতও তাতে যথেষ্ট পরিমানেই আছে' (দেখুন, চট্টোপাধ্যায় ২০০৭; পৃঃ ১৭১-১৭২)। যা আমি ওপরের ১৩ নম্বর নোটে উল্লেখ করেছি। যা গ্রামসির মতে আরও বলাযায়, সুন্দবনের কৃষক সমাজকে যদি সাবলটার্ন শ্রেণী হিসেবে ধরি, তাহলে এই শ্রেণীর মধ্যেও খণ্ডিত, চেতনার সীমাবদ্ধতা ও পরাধীনতার চরিত্র বহন করে।[৬১] তেমনি স্থানীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, গণতান্ত্রিক বিশ্বাস, রাজনৈতিক-বাস্তুতন্ত্র (Political ecology) ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের অবদানকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আবার তাদের ব্যবহার করে রাষ্ট্র সমগ্র

[৬১] এখানে আমি বলার চেষ্টা করছি আইলা দুর্যোগের পরে রাষ্ট্রীয় আদলে নিম্ন সুন্দরবনের যে উন্নয়ন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে সেই উন্নয়ন ক্ষেত্র গুলির নীতি গ্রহনের ক্ষেত্রে তাঁদের কি কোণ অংশগ্রহণ রয়েছে? উত্তরে বলা যায় নেই। রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটিতে রয়েছে। যেখানে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের নীতি গ্রহণ করা হয়। তাতে অন্তত আশানুরূপ ফল তো পায়া যাচ্ছে না। এই সাবলটার্ন শ্রেণীর স্থানীয় উন্নয়ন কল্পে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে, উন্নয়ন নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে 'বিকেন্দ্রিকতার' ভাবনাটাকে ভাবতে পারি। অর্থাৎ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে যদি পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা পরিচালন করা যায়, তাহলে রাষ্ট্র চাইলে স্থানীয় উন্নয়ন ক্ষেত্রে এই (স্থানীয়) সাবলটার্ন (জনগোষ্ঠীর) শ্রেণীর জ্ঞানকেও অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

জাতির কাছে এই বৈধতা অর্জন করার চেষ্টা করে যে, আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণকামী, তাই নাগরিক জীবনে যেকোন সংকটে রাষ্ট্রই একমাত্র সেই স্থান যেখানে সে (নাগরিক) পরম নিরাপত্তা অনুভব করে। আসলে এটাই হচ্ছে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্র দুর্যোগের মতো কতগুলো 'ঘটনাকে' ব্যবহার করে। যে ঘটনা গুলোকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। যা দিয়ে আবার ভিন্ন কোন জনবসতি, ভিন্ন কোন ঘটনায় ও ভিন্ন কোন উন্নয়ন প্রকল্পের বৈধতা অর্জন করে। তাই প্রান্তিক মানুষ সহজে অনুমান করতে পারে যেখানে রাষ্ট্রের 'ইন্টারেস্ট' নেই সেখানে উন্নয়ন হয়না। তাও 'এই' যে হচ্ছে তাতেই নাগরিক হিসেবে আত্মতৃপ্ত।[৬২] অর্থাৎ স্থানীয় মানুষের ভাষায় রাষ্ট্রের যেখানে ইন্টারেস্ট নেই সেখানে উন্নয়ন হয় না যে তা এঁরা জানেন। কি ভাবে জানেন? আসলে রাষ্ট্র যে ভাবে জানিয়েছে, যা সমাজ জীবনে দৈনন্দিন অনুশীলন হচ্ছে তাই হল এই 'জানার-বোঝার আধার'। আর এই অর্থাৎ জানা-বোঝার আধারেই দুর্যোগের মতো নতুন নতুন ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন 'ক্ষেত্র' প্রস্তুত করে। যে ক্ষেত্র গুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্র নতুন নতুন জনবসতিকে শৃঙ্খলায়িত করে। ঠিক এই ক্ষেত্রে আমরা চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেন্ধে উল্লিখিত, ফুকোর ক্ষমতা তত্ত্ব নিয়ে আলোকপাত করতে পারি। অর্থাৎ গ্রামসি যখন কারাগার থেকে ১৯২৯-৩৫ এর সময়ে 'Prison Notebooks' লিখছেন তখন ফুকোর বয়স ৩ থেকে ৮ বছর হবে। এবং ফুকো জখন আধুনিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিভিন্ন বয়ানকে "ক্ষমতা ও জ্ঞানের" সম্পর্কের প্রেক্ষিতে আলোচনা করছেন তখন ফুকোর বয়স (The History of Madness 1961, গ্রন্থ লেখার সময় থেকে যদি ধরে) তাহলে এর মাধ্যে ৩০ বছর আরও কেটে গেছে। এই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের শুরু ও শেষ, ১৯৫০ দশকের শেষের দিক থকে এশিয়া, আফ্রিকার পরাধীন রাষ্ট্রগুলোর ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি, এবং এর পরে সমান্তরাল ভাবে ঠাণ্ডা যুদ্ধে শুরু ও উন্নত রাষ্ট্রগুলো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর ওপরে নানান প্রকারে (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্ক্রিতি গতভাবে) প্রভাব বিস্তার করার কৌশল পরিবর্তন ঘটছে। ঠিক এই প্রেক্ষিতে ফুকো Discipline and Punish (1975) লিখছেন। যেখানে তাঁর 'রাষ্ট্র ক্ষমতা' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া

[৬২] আইলা পূর্বের তুলনায় আইলা উত্তর সময়ে নদী বাঁধ শক্তপোক্ত হওয়া, প্রতি মাসে রেশনে 'আইলার চাল' পাওয়া, গ্রামের অভ্যন্তরে কিছু রাস্তার উন্নতি এইরূপ কিছু প্রকল্প থেকে নিজেদের (সামান্য) উপকৃত হওয়াই রাষ্ট্রের কাছে আনুগত্যের ভিত্তি তৈরি করে।

যায়। অর্থাৎ গ্রামসির ১৯২৯-৩৫ এর সময়ে 'Prison Notebooks' ও ১৯৭৫ এর সময়ে ফুকোর 'Discipline and Punish' জখন পাবলিকেশন হয়, এই সময়ের পার্থক্যের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধরণের এক ব্যাপক পরিবর্তন আমরা দেখতে পায়। ফুকোর মতে, ক্ষমতার তিনটে ধরণ। যথা, সার্বভৌমত্ব, অনুসাসন ও প্রশাসনিকতা। ফুকোর মতে সার্বভৌমত্ব হল সনাতন রাষ্ট্রের ক্ষমতা, এই বক্তব্যকে ধরে আমরা এখানে সংক্ষেপে তাঁর 'অনুসাসন ও প্রশাসনিকতাকে' নিয়ে আলোকপাত করব। অনুশাসন সম্পর্কে ফুকে এখানে আধুনিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, হাসপাতাল, স্কুল, কারখানা, কারাগার ইত্যাদিকে। অসুস্থ মানুষ হাসপাতালে, ছাত্রকে স্কুলে, আইনভঙ্গ কারিকে কারাগারে, শ্রমিককে কারাগারে। এই শাসন শারীরিক জন্ত্রনা দেয়না, তা কাজ করে মানুষের চেতনায়। আধুনিক মানুষ তাঁর বিচার বুদ্ধির মাধ্যমে শে বুঝে নেবে শরীর খারাপ হলে তাঁকে ডাক্তারের নজরদারিতে থাকা উচিৎ। এটা করে মানুষ এর জন্য নয় যে তাঁর সাস্থি হবে, বরং এটা ভেবেই ডাক্তারের কাছে যাবে এতে তাঁর নিজের মঙ্গল ভেবে। এই যুক্তিতে আধুনিক সমাজ হল ক্ষমতার আদর্শ সার্বভৌমত্ব নয়, বস্তুত কেন্দ্রহীন সর্বব্যাপী এক অনুশাসনতন্ত্র। যেখানে সবাই স্বাধীন, কিন্তু সকলেই স্বাধীন ভাবে অনুশাসনের শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হতে চায়। অপর দিকে ফুকো প্রশাসনিকতার (Governmentality) অর্থ বুঝিয়েছেন এই ভাবে, আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ক্ষমতা ব্যবহার করা হয় জনগোষ্ঠীর 'বিশেষ' কল্যানের জন্য। অর্থাৎ বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কল্যাণকর ব্যবস্থা। যেমন জনগোষ্ঠীর কোণ অংশের খরচ বৃদ্ধি বা কমানো, কোণ গোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যা কমানো বা বৃদ্ধি করা, কোথাও অংশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা বা কমানো ইত্যাদি। আর এই কাজ গুলো করে হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, খাদ্যদপ্তর এইরূপ নানান প্রকার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে রাষ্ট্র শৃঙ্খলাপরায়ন করে তোলে। এই ভাবে রাষ্ট্র নতুন সমীক্ষা, নতুন তথ্য, নতুন নীতির মাধ্যমে প্রশাসনিক প্রকরণ গুলোর মাধ্যমে আরও কার্যকর, জনহিতকর, মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। আর এই ভাবে ক্ষমতাতন্ত্র হয়ে যায় আরও পরিব্যাপ্তি, আরও কার্যকর। এই ক্ষেত্রে যা বিকল্প ভাবা হয় তা আরও যুক্তিসহকারে আধুনিক ক্ষমতারেই অঙ্গ হয়ে যায়। তাই সমাজচেতনার চালিকাশক্তিকে ফুকো আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্রের চাবিকাঠি বলে উল্লেখ করেছেন (দেখুন, চট্টোপাধ্যায়; ২০০৭; পৃ; ১৭৩-১৭৫)। ঠিক এই ভাবে সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষ উন্নয়নের অংশীদারি না হয়েও, এই উন্নয়নের তাঁদের সম্পৃক্ততা যথেষ্ট কম থাকার পরেও, শুধু স্থানীয় কৃষি নয়, এইরূপ নানান প্রকার অকৃষি জীবিকা থেকে উৎখাত

হয়েও, 'আইলা প্রকল্পে' নদী বাঁধের মেরামতের মতো একটি চূড়ান্ত ব্যর্থ উন্নয়ন মডেলকে মঙ্গল ময় বলে মেনে নেয় (এই আইলা প্রকল্পের দ্বারা নদীবাঁধের পরিকল্পনার বিশ্লেষণ আমি তৃতীয় অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি)। সুতরাং রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে উন্নয়ন কল্পে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তা স্বীকার করেই বলতে হয় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেই উন্নয়ন হবে? এমন ভাবনাও বোধহয় (উন্নয়নের) সমস্ত ক্ষেত্রে সঠিক নয়। এই বিষয়ে আমাদের ক্ষেত্র সমীক্ষার গ্রাম কৃষ্ণদাসপুর মৌজার একটি কথা উল্লেখ করতে পারি। কৃষ্ণদাসপুর মৌজাতে প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ ওপার বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষ ও তাদের বসতি। মৌজাটিতে দুটো বুথের মধ্যে বরাবরেই একটিতে বাম ও অন্যটিতে ডান পন্থী দল ক্ষমতা দখল করত। এর ফলে এমন কোন ফল দেখিনি যেখানে বাম সমর্থিত বুথে উন্নয়ন তুলনামূলক বেশি হয়েছে। যদিও এমন বেশ কিছুজনের এখনো এই উদ্বাস্তু পরিচয়ের কার্ড রয়েছে। যেখানে উল্লেখ রয়েছে রাষ্ট্রের কাছ থেকে তাঁরা কি কি 'বিশেষ সুবিধা' পাবেন। উদ্বাস্তু শ্রেণীর মানুষের এই বিশেষ সুবিধা গুলো এমন হতে পারে যে ওই অঞ্চলে স্কুল ও হাসপাতাল গড়ে উঠবে, পয়ঃপ্রণালি উন্নত হবে, পানীয় জলের পরিষেবা প্রদান করা হবে। এইরূপ নানান (উদ্বাস্তু শ্রেণীর মানুষ দের উন্নতি কল্পে) প্রকল্প (বিশেষ নীতি) গ্রহণ করা হয়েছিল অন্তত কাগজে কলমে। কিন্তু উদ্বাস্তু শ্রেণীর মানুষের প্রতি রাষ্ট্রীয় এই প্রতিশ্রুতির কোনটাই ফলপ্রসূ হয়নি। এই বিষয়ে দুজন ব্যাক্তির বক্তব্য তুলে ধরব। তার মধ্যে অভয় দাস কংগ্রেস ও বাম সমর্থিত প্রিলাল দাস যারা স্থানীয় রাজনৈতিক পদাধিকারি ও প্রশাসনের সাথে বিভিন্ন ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই ক্ষেত্রে উক্ত দুজন ব্যাক্তির সাথে ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অভয় দাসের সাথে তিন বার ও প্রিয়লাল দাসের সাথে দুবার কথোপোকথনে বোঝার চেষ্টা করেছি আইলা পূর্বের স্থানীয় অঞ্চলে দলীয় রাজনীতি ও উন্নয়নের চিত্র। এই বিষয়ে প্রথমে বলব অভয় দাস এর কথা, যিনি কংগ্রেস সমর্থিত এবং কংগ্রেসের শাসন কালে (বয়সের ভারে অভয় বাবু সাল তারিক বলতে পারিনি, তবে তাঁর বড় ছেলে পাশ থেকে আনুমানিক ভাবে বললে সময়টা ১৯৬০-১০৭০-৭৫ হবে) তিনি দীর্ঘ ১০ বছর ব্লকের ভূমি বিষয়ক কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে প্রিয়লাল দাস এর কথা যিনি CPI(M) সমর্থিত এবং বাম শাসনকালে ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েত মেম্বার ছিলেন। এই দুজনেই যথাক্রমে কংগ্রেসের সময় এবং সিপিএমের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদাধিকারী ছিলেন। দুজনকে যখন জিজ্ঞেস করি যে উদ্বাস্তু মানুষের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি গুলি

কেন পালন করা যায়নি, উত্তরে দুজনেরই বক্তব্য ছিল এই দুটো বুথে'বাঙাল মানুষের' সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় একই রাজনৈতিক দল হলেও পঞ্চায়েত অফিস, ও ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক আলোচনায় এঁদের বক্তব্যেকে গুরুত্ব দেওয়া হতনা। অর্থাৎ দুজনেই নিজ দলের মধ্যেই অবজ্ঞার স্বীকার হয়েছেন। বুথের উন্নয়ন মূলক পরিষেবার ক্ষেত্রেও বরাবরেই অবহেলার কথা উঠে এসেছে দুজনের বক্তব্যে। অর্থাৎ দলীয় সমর্থক চাইলেও তাঁকে কিন্তু উন্নয়নে সামিল করা যাবে না। স্থানীয় অঞ্চলে ক্ষমতার বিন্যাস ও উন্নয়ন প্রশ্নে অনেক ক্ষেত্রেই 'বাঙাল-ঘটির' লড়াই নামক (মেদিনিপুর থেকে আগত মানুষদের প্রচলিত ভাষায় 'ঘটি' বলা হয়) বাইনারির মাধ্যমে (সমাজের সমস্ত স্তরে) আবর্তিত হত। ঘটি দের ভাবনা হল বাঙালরা তাদের তুলনায় অনেক নিচু শ্রেণিতে অবস্থান করে। জীবন-যাত্রা ও সংস্কৃতির মান যেন তাদের খুবই নিম্ন রুচির। এবং যেহেতু ঘটিরা এই অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ (সমগ্র সুন্দরবনে) তাই সহজে স্কুল, খেলার মাঠ, বাজার, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মক্রিয়ায় বাঙালরা সামাজিক বঞ্চনার স্বীকার হত। অর্থাৎ কৃষ্ণদাসপুর মৌজায় রাজনৈতিক মতাদর্শ বা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ততটা নয়, বরং তুলনায় গোষ্ঠী রাজনীতিই প্রকট হত। যে গোষ্ঠীর ক্ষমতা বেশি, উন্নয়নের ভাগও তার বেশি।

এখানেই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়, রাজনীতি ও ক্ষমতার সাথে উন্নয়নের সম্পর্ক কি? তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলোতে বেশির ভাগ রাজনৈতিক প্রবাহ এই খাতে বইছে যেখানে উন্নয়নের যুক্তিকে কেন্দ্র করে রাজনীতি প্রবাহিত হয় এবং রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ক্ষমতা প্রবাহিত হয়। তাই রাষ্ট্রীয় আখ্যানে কৃষ্ণাদাসপুর মৌজার (আঞ্চলিক) রাজনীতিতে অংশগ্রহণ থাকলেও উন্নয়ন প্রকল্পে এই বাঙাল গোষ্ঠীর মানুষ ব্রাত্য থেকে যায়। যে ভাবে থাকে সুন্দরবন অঞ্চল। রাষ্ট্রের কাছে সুন্দরবন হল সেই প্রান্তিক অঞ্চল যেখান থেকে শুধু শ্রমিক উৎপাদন হবে। সহজ লভ্যে শ্রম কেনা যাবে। অর্থাৎ উন্নয়ন কল্পে প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান দেবে। কিন্তু উন্নয়নের সাধ পাবে না। তাই নামখানা, কাকদ্বীপ ব্লকের তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব জগত জুড়ে থাকলেও পাশের ব্লক পাথরপ্রতিমাতে কতোটা পড়েছে তা বলা কঠিন। অর্থাৎ তেভাগা আন্দোলন ছিল রাষ্ট্রের কাছে একটি ঘটনা মাত্র যেখান থেকে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ভিন্ন কোন স্থানে আরও দক্ষ ভাবে এইরূপ উক্ত পরিস্থিতিকে নিজের অধীন রাখার জন্য। তাই তেভাগা আন্দোলনে

উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর কোন সমাধান হয়না। সমাধান যে হয়নি তা পাথরপ্রতিমা ব্লকের ভূমি বন্দোবস্তের চিত্র অঙ্কন করলে সহজে অনুমেয়।

ক্ষেত্রসমীক্ষা করার সময়ে দেখা গেছে ১৯৭৭ থেকে প্রায় ১৯৯২-৯৩ সাল পর্যন্ত কৃষকদের মধ্যে (সরকারি ভাবে) পাট্টা বিলি করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে ভূমি সংস্কারের সময়ে সরকার প্রত্যেকটি গ্রামের জন্য আলাদা আলাদা মানচিত্র অঙ্কন করে গ্রামের কাছেই কৃষকদের জমি প্রদান করে । গ্রামের ভেতর ছাড়াও কৃষি জমির মধ্যে দিয়ে এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে যাওয়া-আসা করার জন্য রাস্তার উল্লেখ করা হয়। গ্রামের মানুষের পরস্পরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল এই রাস্তা ও নদী-বাঁধ। গ্রামের এই মানচিত্রের সাথে নদী-বাঁধের মানচিত্রেরও উল্লেখ রয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রামে স্কুল, কলেজ, হসপিটাল, বাজার, অফিস, বিভিন্ন গোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান ও নানান কারণে কিছু 'খাস'[৬৩] জমিও মানচিত্রে উল্লেখ করা হয়। এই ক্ষেত্রে খুব সঙ্গত কারণে এই প্রশ্নগুলিও আমাদের মনে উত্থাপিত হয় যে ঠিক কতপরিমাণ 'জমি, ভূমিতে' রূপান্তরিত হয়েছে।[৬৪] অর্থাৎ সরকারের হিসেবে ব্লকের মানচিত্রে মোট কত পরিমাণ ভূমি রয়েছে? এবং তার মধ্যে মোট কতপরিমাণ ভূমি সরকারের খাতায় নথীভুক্তি (ভূমির মালিকানার ক্ষেত্রে) রয়েছে? এবং তৃতীয় প্রশ্নটি যদি এখানে স্থানীয় কৃষক পরিবারের দিক থেকে করি তাহলে প্রশ্নটি দাঁড়ায় এইরূপ, সরকারের খাতায় নথীভুক্তি ভূমির মধ্যে রায়তী, পাট্টাদার, বর্গাদার ও খাস (ভূমি) মিলে মোট কতপরিমাণ ভূমিকে কেন্দ্র করে বিবাদ (Dispute) রয়েছে? তা স্থানীয় মানুষের নিজেদের মধ্যে হোক কিংবা স্থানীয় মানুষের সাথে রাষ্ট্রের বিবাদই হোক। ভূমি বিষয়ক গবেষণায় প্রথম দুটি প্রশ্ন সাধারণ হলেও তৃতীয় প্রশ্নটি সুন্দরবন অঞ্চলের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক।

এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয়, চর জীবনে যে জনপদের ইতিহাস আমরা পাই তা সুন্দরবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই বিষয়ে কুন্তলা লাহিরি দত্ত ও গোপা সামন্তের লেখা "Dancing With the river" বইটির কথা উল্লেখ করব। লেখকরা বইটিতে নিম্ন বঙ্গের চর জীবনের ইতিহাস

---

[৬৩] খাস জমি হল সম্পূর্ণ সরকারি অধিকারাধীন থাকা একপ্রকার ভূমি। সরকার চাইলে সেই জমিতে কোন প্রজাকে পাট্টা দিতে পারে বা যে কোন কাজে লাগাতে পারে।

[৬৪] এই ক্ষেত্রে জমি হল কৃষকের ভাষা এবং ভূমি হল রাষ্ট্রীয় ভাষা, এই অর্থে পার্থক্য করেছি। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা যেখানে কৃষক কেন্দ্রিক ভাষ্যে জমি শব্দটি ব্যবহার করব এবং রাষ্ট্রীয় ভাষ্যের ক্ষেত্রে ভূমি শব্দটিকে ব্যবহার করব।

তুলে ধরেছেন। চর জীবনের ইতিহাস এই ভাবে তুলে ধরেছেন, 'এই চর গুলি হল এমন এক ভূমিগত অবস্থান যেখানে জল এবং মাটি একেই সাথে বিদ্যমান। এবং এই চরের মানুষরা জল ও স্থলভূমির মধ্যে অবস্থিত একটি "অস্পষ্ট স্থানে" বসবাস করে। যার ফলে এই বসতির মানুষরা তথাকথিত সমাজের চোখে বৈধ এবং অবৈধ অবস্থার মধ্যে ঘোরাফেরা করে'। লেখকদের সাথে একমত হয়ে বলতে হয় সুন্দরবনে বসবাসকারী মানুষ গুলোর (আত্ম)পরিচয় কি? যেখানে চরের মানুষরা এমন একটি অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট স্থানে বসবাস করে যেখানে রাষ্ট্রের মুখ্য লক্ষই থাকে 'শাসন করা' সেখানে নাগরিকের প্রতি 'তত্ত্বাবধান' এর প্রশ্ন গৌণ। তাই উপরে উল্লিখিত তৃতীয় প্রশ্নটি এই ধরনের অঞ্চলের জন্য খুবেই গুরুত্বপূর্ণ। যে প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়ে পাথরপ্রতিমা ব্লক তথা সুন্দরবনের ভূমি ব্যবস্থা নিয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরে যা তথ্য পেলাম তার নির্যাসআরও জটিল ও বিভ্রান্তিকর। District Land and Land Reforms Officer (DL and LRO), Block Land And Land Reforms officer (BL and LRO), District Registrar Office (DRO) ও Block Sub-Registrar Office (BSRO), District Survey Office (DSO) সরকারি এই দপ্তর গুলোর দেওয়া তথ্য এতটাই গোলমেলে যে এক তথ্যের সাথে অন্য তথ্যের মিল নেই। এবং সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল এই তথ্যগুলি এতটাই পুরনো যে GPS দেখে গাড়ি চালানোর সময়ে (কোন কোন ক্ষেত্রে) চালক যেমন কখনো কখনো ডোবা, খাল-বিলে গিয়ে পড়ে তেমনি সুন্দরবনের ক্ষেত্রেও এই দপ্তরগুলর দেওয়া তথ্যের মাধ্যমে যদি আপনি উক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যান তাহলে GPS দেখে গাড়ি চালানো ওই ব্যাক্তির মতো আপনাকেও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশেষ করে নিম্ন সুন্দরবনের ক্ষেত্রে বলা যায়।[৬৫]

[৬৫] এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, বিগত কয়েক বছরে অতিমারির সময়ে ব্লকের ভূমি কেন্দ্রিক একটি দুর্নীতির ঘটনা ঘটে। যার সাথে ব্লকের বেশ কিছু আধিকারিক ও স্থানীয় রাজনৈতিক পদাধিকারী কিছু নেতা যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে। যার ফলে ব্লকের সংশ্লিষ্ট ভূমি আধিকারিক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা চাকরি স্থগিতের (Suspended) নির্দেশ পান। এবং এর ফলে ব্লকে এখনো পর্যন্ত রাজনৈতিক চাপান উতর চলে। এই কারণে কেবল ব্লকের ভূমি দপ্তর নয়, জেকন তথ্যের জন্য অন্যান্য দপ্তরে গেলেও নানান অজুহাতে আমাকে তথ্য প্রদান করা হয়নি। যেমন ব্লকের BLRO, land Sub-registre office, Agriculture office এই দপ্তরগুলোর ক্ষেত্রে আমাকে বার বার বলা হয়েছে, প্রথমে আলি পুর D.M.O, যেতে। নাহলে S.D.O গিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসলে তবে তথ্য পাওয়া যাবে। ২০২১ সালের জুলই থেকে সেপ্টম্বর মাসের মধ্যে উক্ত

১৯৫০ এর দশকের শেষের দিক থেকে এই অঞ্চলগুলিতে সরকার যখন জরীপ করে সেই সময়ে ভূমির যে আকৃতি অনুযায়ী খাল-বিল, পুকর, নদীর বাঁধ, চর ইত্যাদি ছিল তার প্রায় অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে, তার সাথে পরিবর্তন হয়েছে ভূমির 'শ্রেণি চরিত্রও', যেমন নিচু ভূমি, সালি ভূমি ও বাস্তু ভূমির। কারণ কোনও অঞ্চলে ভূমির আকৃতিগত পরিবর্তনের সাথে ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন অনিবার্য। কোথাও খাল-বিল, ডোবা এইসব নিচু অংশ বর্তমানে সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আবার এইরূপ অনেক সমতল ভূমি খাল-বিল নালাতে পরিণত হয়েছে। আবার এইরূপ অনেক রায়তি জমি চরে পরিণত হয়েছে আবার অনেক ক্ষেত্রে চর ছিল যেগুলো সেখানে এখন বসতি গড়ে উঠেছে এবং এইরূপ কিছু চরে কৃষি কাজও হচ্ছে। পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি-প্লট গ্রাম পঞ্চায়েত গত একশ বছরে প্রায় অর্ধেক চলে গেছে সমুদ্র গর্ভে।[৬৬] গবেষণার প্রারম্ভে আমারও বিষয়টি বুঝতে বেশ কিছু সময় লাগার পর সরকারি দলিল দস্তাবেজের পরিবর্তে (বিশেষ ভরসা না করে) নিবিড় ক্ষেত্র সমীক্ষার ওপরে বেশি নির্ভর করেছি। কারণ এইরূপ একটি অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট বসতির ন্যূনতম জনকল্যাণ কল্পের কাজ তরান্বিত করতে গেলেও সরকারের কাছে উক্ত তথ্যের খুবেই প্রয়োজন। কিন্তু নেই, তাহলে আধুনিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালন কি ভাবে হয়? সোজা উত্তর হতে পারে ভোটার কার্ড আর আধার কার্ড দিয়েই (ভারতের ক্ষেত্রে)। যেগুলো রাষ্ট্রের প্রয়োজন জনগণকে নজরদারী-ভূত ও শৃঙ্খলা পরায়ণ করে তোলার জন্য। এই

দুটি অফিসে (D.M .O দুবার ও S.D.O একবার যায়) গিয়ে যথারিতি আবেদন করে হতাস হয়ে ফিরে আসি। আবার পুনরায় ২০২৫ সালে মার্চ মাসে বর্তমান অধ্যায়টিকে বিশ্লেষণ করার জন্য তথ্যের প্রয়োজনে মহাকুমা অফিসে যায় তখনও এইরূপ নানান বাহানায় আমাকে হতাস হতে হয়েছে। তবে স্থানীয় দপ্তরগুলো থেকে কিছুটা তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তাও মৌখিক ভাবে। যা আমাকে খাতায় কলমে লিখে নিতে হয়েছে। সব শেষে বলা যায়, এই তথ্যগুলোর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে একজন ছাত্র-গবেষক হিসেবেও আকুতি মিনতি করতাম এবং কয়েকটি দপ্তরে R.T.I করার কথা বললে আধিকারিকদের দেখতাম কিছুটা ভিতস্ত ও নির্লিপ্ত ভাবে চুপ থাকত। অথচ আমার M.Phil গবেষণার ক্ষেত্রে ব্লক ও মহাকুমা অফিস থেকে দিনের পর দিন উপস্থিত হয়ে এইরূপ নানান তথ্য সংগ্রহ করেছি। তলিয়ে ভাবলে আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহল আমি যখন M.Phil গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করি তখন সময়টা ছিল রাজ্যে নতুন সরকারের নতুন উদ্যোগ (২০১৫২০১৬)। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই উদ্যোগ অনেকটাই ফিকে হয়েছে। এবং সম্ভবত আধিকারিকদের নানান ভীতিও এখানে কাজ করতে পারে।

[৬৬] এই তথ্যটি ১৪ মে ২০২৩ সালের আনান্দ বাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/area-of-south-g-plot-of-patharpratima-village-has-reduced-to-half-due-to-this-cyclones-and-storm/cid/1429829।

ক্ষেত্রে খামতির কোন সম্ভাবনানেই। কিন্তু জনগণের উন্নয়ন কল্পে সরকারের কাছে যে ধরনের তথ্যের প্রয়োজন হয় তার চিত্র অনেকটাই এই সুন্দরবনের ন্যায়। এইবার আসি ক্ষেত্র সমীক্ষার কিছু তথ্য নিয়ে। সরকারি তথ্যের এই হালহকীকত, যার ফলে স্থানীয় আমিন, মহরি, উকিল, গ্রামের মোড়ল, রাজনৈতিক পদাধিকারী যেমন ব্লকের ভূমি কর্মাধ্যক্ষ, সরকারি দপ্তরের কিছু আধিকারিক ও সর্বোপরি স্থানীয় কিছু কৃষক পরিবারগুলো থেকে 'Random sample survey' এর মাধ্যমে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। এতে দেখা যায় যায় যে প্রতি কৃষক পরিবারের মোট জমির প্রায় ৩০-৩৫% কোন কোন ভাবে এলোমেলো হয়ে রয়েছে। যেমন পর্চা, দলিল, (জমির) সঠিক পরিমাপের অভাব ইত্যাদি। আবার রায়তি জমি সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে গেছে এমন জমির পরিমাণ রয়েছে ৭%।[৬৭] জমির (শ্রেণীগত) চরিত্র পরিবর্তন হয়েছে ২৭% এর কাছাকাছি। অর্থাৎ ব্লকের মোট ভূমির ৬৫-৭০% এর মধ্যে নানান প্রকার আইনি জটিলতা ছিল।

স্থানীয় অঞ্চলে ভূমির এই আইনি জটিলতার জন্য যে যে কারণগুলো ছিল তা বিশ্লেষণ করাটা এখানে প্রয়োজন। তার একটি কারণ হিসেবে বলা যায় ভূমি গঠন ও নদীর গতিপথের প্রতিনিয়ত দিক পরিবর্তন, নদী বাঁধের ভাঙ্গন এবং চাষের অনুপযুক্ত লোনা ও পলি মাটির জন্য কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্তরায় (যে বিষয়গুলো অধ্যায়ের আগেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি) ।[৬৮] যার ফলে কৃষক শ্রেণীর কাছে জমি যেএকটি গুরুত্বপূর্ণ 'সম্পদ' এই ধারণা তেমন ভাবে গড়ে ওঠেনি। কিংবা সম্পদ হিসেবে ধারণা গড়ে তোলার জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন উৎসাহও ছিল না। আনুমানিক ১৯৫০ এর দশকে এই অঞ্চলে ভূমি বন্দোবস্ত শুরু হয় এবং ১৯৭৭ সালের ভূমি-সংস্কারের সময়ে থেকে আইলার আগে পর্যন্ত আনুমানিক ৬৫-৭০% জমির নথী পত্রের ভুল, যা প্রমাণ করে সরকারি আমলাদের অনভিজ্ঞতা বা গাফিলতির দিকটিকে। স্থানীয় আমিন ও বয়োজ্যেষ্ঠ কৃষকের সাথে কথোপকথনে এর কারণগুলি উঠে এসেছে। জঙ্গলাকীর্ণ

---

[৬৭] এই ৭% জমিগুলোকে এই ভাবে হিসেব করেছি, যেসব কৃষক পরিবারগুলোর জমি নদী ও সমুদ্রের ধারে অবস্থান করছে, এই শতাংশের হিসেব শুধু তাদের কে ধরা হয়েছে। কারণ ব্লকের মোট ভূমির পরিমাণের সাথে এর হিসেব করার থেকেও কেবলমাত্র যাঁদের জমি নদী ও সমুদ্রের ধারে অবস্থান করছে শুধু তাদের মধ্য থেকে এই তথ্য সংগ্রহ হলে বিষয়টি বেশি যুক্তিযুক্ত হয়।

[৬৮] দেখুন নীহার রঞ্জন রায়; ১৩৫৬ (বঙ্গাব্দ); পৃ; ১৪৩, ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংখ্যা ১৪০৬ (বঙ্গাব্দ), পৃঃ ২১৬।

সুন্দরবনের বেশকিছু ভূমি ছিল অসমতল। পাট্টা বিলির সময়ে ভূমির 'আকৃতি ও শ্রেণীর' ওপর নজর না দিয়ে কৃষকদের মধ্যে জমি প্রদান করা হয়।[৬৯] ভূমি বন্দোবস্তের সময়ে গ্রামের মানচিত্রের সাথে সাথে নদী বাধের মানচিত্রও অঙ্কন করা হয়। নদী বাঁধের মানচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে 'ভেতর ও বাহির' নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বিগত ৬০-৭০ বছরে নদী বাঁধের বহু রকমফের ঘটেছে। নদীবাঁধ ভাঙনের ফলে বহু রায়তি জমি নদীর 'চর' বা জলের তলায় চলে গেছে। আবার কোথাও চর গড়ে উঠে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সুন্দরবনের এইরূপ বহু কৃষি পরিবার রয়েছে যাঁদের রায়তি জমি চর বা জলের তলায় চলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী ২০ বছরের মধ্যে যদি সেই জমি আবার চরে পরিণত হয় তাহলে বকেয়া খাজনা প্রদান করে কৃষক জমি ফেরত পেতে পারে।[৭০] প্রাকৃতিক ঘটনাই যে কেবল এর জন্য দায়ী তা নয়। গ্রাম বা আঞ্চলিক গোষ্ঠী রাজনীতিও এর জন্য অনেকাংশেই দায়ী বলা যায়। পাথরপ্রতিমার ব্লকের কৃষ্ণদাসপুর মৌজায় এইরূপ ১৮৩ জন জমির মালিকের মোট ৭৫০ বিঘা ফিসারির বাঁধ আইলার সময়ে ভেঙে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে প্রশাসনিক স্তর থেকে চেষ্টা থাকার পরেও তা বরাবরেই ব্যর্থ হয়েছে। শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ে ফিসারি সংলগ্ন নদী বাঁধ আর মেরামত করা যায়নি। বর্তমান প্রায় ১৫ বছরে সেই ফিসারি এখন নদীর চরে রূপান্তরিত হয়েছে। যার ফলে স্থানীয় মানুষের ১.৫ থেকে ২ কোটির টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।[৭১]

সুন্দরবনের ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাসের আরো নানান তথ্যের অভাবে আলোচনাটির মধ্যে ফাঁকফোকর থেকে গেছে। তবে পরিশেষে একটি কথা বলতে হয় যে বামফ্রন্ট সরকারের ১৯৭৭ সালের ভূমি সংস্কার (অপারেশন বর্গা) নিয়ে সমাজ তাত্ত্বিকগণ বেশ উৎসাহী হলেও বা শহরের বুদ্ধিজীবী মানুষ গ্রামের প্রান্তিক কৃষকের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে বলে বেশ উৎফুল্ল হলেও এর একটি সত্য ভাষ্য আজও তেমন কোন পত্র পুস্তিকাতে দেখলাম না। বিষয়টি হল এই রকম,

---

[৬৯] পাট্টা হল প্রজাদের জমি আধিকার প্রদানের একটি দলিল। যা ১৮৮৫ শালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের' মাধ্যমে লাগু করা হয়। এবং এখানে 'আকৃতি' বলতে বুঝিয়েছি, জমির 'ভু-আকৃতিকে' যেমন জলা, ডোবা, উঁচু ঢিবী ইত্যাদি এবং 'শ্রেণী' বলতে বুঝিয়েছি সরকারি আইন দ্বারা নির্ধারিত যেমন বাস্তু, চাষের ও জলা জমি ইত্যাদি।

[৭০] দেখুন, সুবির কুমার পাল, পৃঃ ১০৯

[৭১] এই তথ্যটি আমি ক্ষেত্র সমীক্ষার সময়ে দেখেছি।, এবং অর্থের হিসেব স্থানীয় ফিসারির মালিকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছি।

অবিভক্ত চব্বিশ পরগণার উপরোল্লিখিত আলোচনায় দেখেছি যে ভূমি সংস্কারের ইতিবাচক প্রভাব। এর ফলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে জমিদার ও জোতদারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হয়েছে। কৃষকের উপরে এর প্রভাব আমরা কমবেশি জানি। কিন্তু এর ফলে বহু ছোট কৃষকও জমি ছাড়া হয়েছে। তাদের মধ্যে বাধ্য হয়ে অনেকে ভিটে ছাড়া হয়েছে। হয়ত বা তাদের মধ্যে অনেকে শহরের অলিগলিতে বসবাস করছে। ২০০৪-০৫ এই সময়ে (যে সময়ে আমি বুঝতে শিখি) আমার ও আশেপাশের গ্রামে কিছু অ-বাম মনস্ক পরিবারকে বছরের পর বছর জমিতে হাল দেওয়ার সময়ে স্থানীয় সি.পি.আই(এম)-এর নেতার লাঠির ঘা খেতে দেখেছি। আবার যদিওবা কেউ কেউ নেতাদের নজর এড়িয়ে চাষ করতো, অনেক ক্ষেত্রে তাদের ধান মাঠেই নষ্ট হয়ে যেত আর নয়তো সি.পি.আই(এম) পার্টির কোন নেতার গোলাতে উঠত। যতটুকু মনে পড়ে ২০০৪-০৫ এই সময়েও সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন খুবই কম ছিল। ক্ষুধা নিবারণের কিছুটা বাড়তি উপায় ছিল সেই বামফ্রন্ট সরকারের দেওয়া রেশনের চাল। একদিকে দেখতাম ক্ষুধার্ত ভিক্ষুকের ছবি আর অন্য দিকে দেখতাম মাঠের ধান মাঠেই মজে যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হল কিছু ভালো করতে গেলে কিছু খারাপ তো হবেই। সমাজ কাঠামোর এই সরলীকরণ কি সমাজতত্ত্বেরই ঘরনা? এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই থেকে যায়। কারণ এই চিত্র রাজ্যের প্রায় প্রতি গ্রামেই দেখা যায়।[৭২] শতাংশের হিসেবে তা যে একেবারে কম নয় সেটাও আমাদের মনে রাখতে হবে। এবার আসা যাক অধ্যায়ের মূল বিষয়ে। প্রথমত স্থানীয় অঞ্চলের জমির স্বত্বাধিকার বলতে ঠিক কি বোঝায়? তা আমরা এবার বোঝার চেষ্টা করি।

বিশেষ করে নিম্ন সুন্দরবনে নতুন করে জমির স্বত্বাধিকারের যে প্রশ্ন ওঠে তা আসলে আইলা প্রকল্পে নদীবাঁধ মেরামতের সময়ে জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। তাই বিষদে ব্যাখ্যার

[৭২] ২৯ জুন ২০১৪, আনান্দ বাজার পত্রিকা, 'অপারেশন বর্গা যে ক্ষতি করেছে' নামক সম্পাদকীয় কলামে নাসিম-এ-আলম লিখেছেন। 'আমাদের বামপন্থীরা আত্মঘাতী, কিন্তু এ দেশে বামপন্থা ছাড়া গতি নেই' নামক শিরোনামে, অশোক মিত্রের সঙ্গে অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার আনান্দবাজার পত্রিকায় যা ১০ জুন ২০১৪ সম্পাদকীয় কলামে লেখাটি ছাপা হয়েছিল। তার পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে লেখক লেখাটি লেখেন। https://www.anandabazar.com/editorial/%E0%A6%85%E0%A6%AA-%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%97-%E0%A6%AF-%E0%A6%95-%E0%A6%B7%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%9B-1.45451#goog_rewarded

আগে এই ক্ষেত্রে নদী বাঁধ মেরামতের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বুঝতে সুবিধা হবে। ২০০৯ সালের ২৫ মে দুর্যোগের পরে এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে কেন্দ্রের U.P.A সরকার আইলা প্রকল্পে নদী বাঁধ মেরামত করার জন্য ৯ সদস্যের একটি 'টাস্কফোর্স কমেটি' গঠন করে।[৭৩] এই টাস্কফোর্স কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী তিন বছরের মধ্যে ৭৭৮ কিলোমিটার নদী বাঁধ এমন ভাবে মেরামত করতে হবে যেন 'আগামি একশ বছরেও এর ক্ষতি না হয়'।[৭৪] রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা প্রশাসন এই প্রকল্পটিকে বাস্তবায়ন করার জন্য কার্যভার গ্রহণ করে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ডি.এম অফিসের নবম তলায় ৫০ জন ভূমি বিষয়ক অভিজ্ঞ অধিকর্তা দের নিয়ে প্রকল্পটির কাজকর্ম তরান্বিত করা হয়। মোট ১০ টি টিমে আলাদা আলাদা ভাগ করে প্রত্যেকটি টেবিলে একজন ভূমী বিষয়ক অভিজ্ঞ অধিকর্তা, একজন করে আমিন, মোহরি, ক্লার্ক ও একজন সহযোগী নিয়ে মোট ৫ জন করে এক একটি টিম তৈরি করা হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতেই জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক জটিলতা সৃষ্টি হয়। কারণ দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় অঞ্চলে প্রচলিত ভূমি বিষয়ক প্রথা, রীতিনীতি ও রাষ্ট্রীয় আইন কানুন[৭৫] এর কাঠামোর পরিবর্তন ও নতুন করে অবকাঠামো গড়ে ওঠার ফলে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পায়। যে কারণে রাজ্য সরকার সঠিক ভাবে জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রকল্পের মাঝামাঝি সময়ে ভূমি বিষয়ক আরও অভিজ্ঞ ও অবসরপ্রাপ্ত কিছু আধিকারিক নিয়োগ করে অধিগ্রহণের কাজটিকে সম্পূর্ণ

---

[৭৩] The Indian Express, **Central Task Force to assess Aila damage, June 16, 2009.** https://indianexpress.com/article/news-archive/web/central-task-force-to-assess-aila-damage/?ref=archive_pg

[৭৪] দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার 'প্রধান প্রকৌশলী' (chief engineer) র সাথে কথোপকথনে উক্ত বক্তব্যটির উল্লেখ করেছেন, ১১.০২.২০১৬।

[৭৫] 'রাষ্ট্রের আইনকানুন' বলতে আমি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে, আইলার আগে উক্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রের উপস্থিতি বিশেষ ভাবে না থাকলেও তূলনামুলক ভাবে (ভূমি বিষয়ক) কম জটিলতা পূর্ণ আইনের অনুশীলন হত। যার মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রের উপস্থিতি স্বল্প হলেও উপলব্ধি করা যেত।

ভূমি বিষয়ক রাষ্ট্রীয় আইনকানুনের জটিলতা, কিংবা নিজেদের মধ্যে জমি কেন্দ্রিক কোন সমস্যা তৈরি হলে তার সমাধানের জন্য আইন আদালতের দ্বারস্থ হওয়াটা যেমন সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ তেমনি দীর্ঘদিন ধরে সরকারি বিভিন্ন অফিস আদালতের ঝক্কিও মানুষ নিতে চাইতেন না। এর ফলে সরকারও উক্ত অঞ্চলের ভূমির প্রতি গুরুত্ব দেয়নি । যার ফলে স্থানীয় অঞ্চলের প্রায় ৮০% জমির নথিতে ভুল রয়েছে।

করতে চেষ্টা করে । তবে এই বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জমির নথী সংক্রান্ত জটিলতা ছাড়া স্থানীয় মানুষের সাথে সরকারের আর কোন ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। যেখানে সরকার কোন প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করার ক্ষেত্রে (জমি) দাতাদের সাথে 'ক্ষতিপূরণের মূল্য' বা উক্ত প্রকল্পের নানান নীতি নিয়ে স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়, কিংবা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, সেখানে সুন্দরবনে (সমগ্র ভারতীয় সুন্দরবন) আইলা প্রকল্পের জন্য মোট ১৪০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করলেও তার বিভিন্ন নীতি ও ক্ষতিপূরণের 'মূল্য' নিয়ে কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। এর দুটো কারণ রয়েছে, এক নদীবাঁধ মেরামতের জান্য সরকার রায়তদারের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করলে তার জন্য যে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় সে সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের ধারণা ছিল না। কারণ এযাবৎ কাল সমগ্র সুন্দরবনের নদী বাঁধ মেরামতের ক্ষেত্রে রায়তদারদের কাছ থেকে সরকার জমি অধিগ্রহণ করলেও কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হতো না, তাই এই ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষতিপূরণ পেয়ে সরকারের সাথে কোন দরকষাকষি না করে পরুন্তু উৎসাহের সাথে তা গ্রহণ করে (No. 5504-LA 11-147/11(Pt.)।

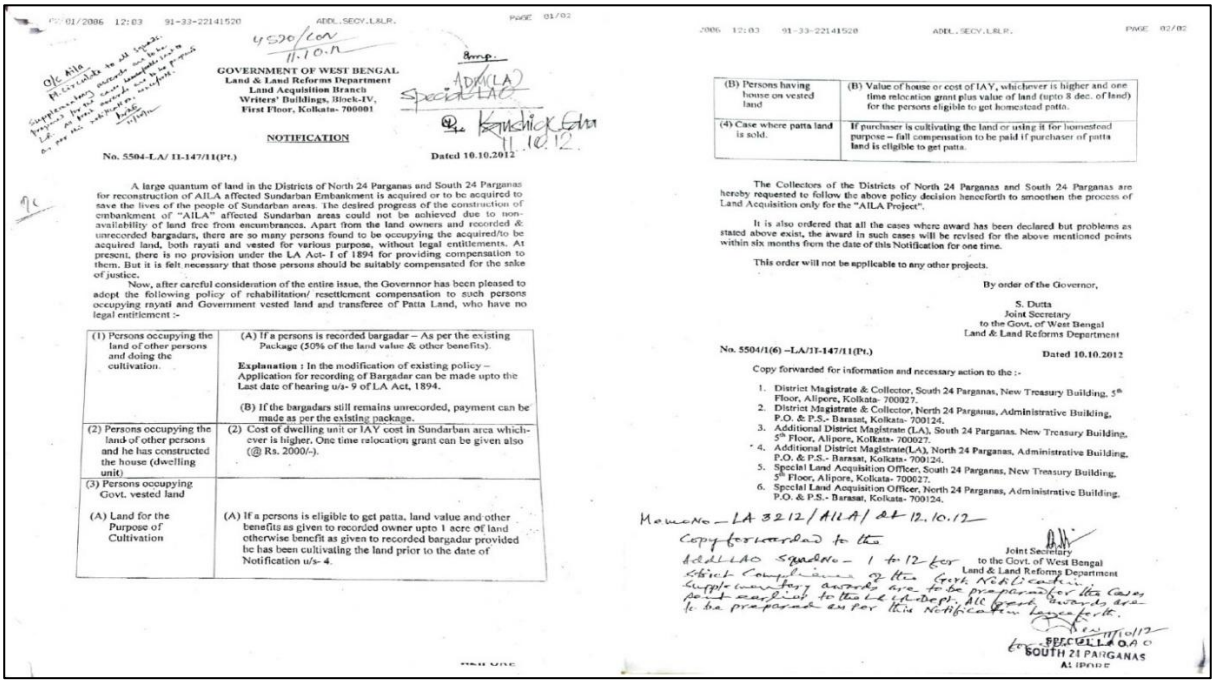

আইলা প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি

01/2006 12:03 91-33-22141520 ADDL.SECY.L&LR. PAGE 01/02

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Land & Land Reforms Department
Land Acquisition Branch
Writers' Buildings, Block-IV,
First Floor, Kolkata- 700001

NOTIFICATION

No. 5504-LA/ 11-147/11(Pt.) Dated 10.10.2012

A large quantum of land in the Districts of North 24 Parganas and South 24 Parganas for reconstruction of AILA affected Sundarban Embankment is acquired or to be acquired to save the lives of the people of Sundarban areas. The desired progress of the construction of embankment of "AILA" affected Sundarban areas could not be achieved due to non-availability of land free from encumbrances. Apart from the land owners and recorded & unrecorded bargadars, there are so many persons found to be occupying the acquired/to be acquired land, both rayati and vested for various purpose, without legal entitlements. At present, there is no provision under the LA Act- I of 1894 for providing compensation to them. But it is felt necessary that those persons should be suitably compensated for the sake of justice.

Now, after careful consideration of the entire issue, the Governor has been pleased to adopt the following policy of rehabilitation/ resettlement compensation to such persons occupying rayati and Government vested land and transferee of Patta Land, who have no legal entitlement :-

(1) Persons occupying the land of other persons and doing the cultivation.	(A) If a persons is recorded bargadar – As per the existing Package (50% of the land value & other benefits). **Explanation** : In the modification of existing policy – Application for recording of Bargadar can be made upto the Last date of hearing u/s- 9 of LA Act, 1894. (B) If the bargadars still remains unrecorded, payment can be made as per the existing package.
(2) Persons occupying the land of other persons and he has constructed the house (dwelling unit)	(2) Cost of dwelling unit or IAY cost in Sundarban area whichever is higher. One time relocation grant can be given also (@ Rs. 2000/-).
(3) Persons occupying Govt. vested land (A) Land for the Purpose of Cultivation	(A) If a persons is eligible to get patta, land value and other benefits as given to recorded owner upto 1 acre of land otherwise benefit as given to recorded bargadar provided he has been cultivating the land prior to the date of Notification u/s- 4.
(B) Persons having house on vested land	(B) Value of house or cost of IAY, whichever is higher and one time relocation grant plus value of land (upto 8 dec. of land) for the persons eligible to get homestead patta.
(4) Case where patta land is sold.	If purchaser is cultivating the land or using it for homestead purpose – full compensation to be paid if purchaser of patta land is eligible to get patta.

2006 12:03 91-33-22141520 ADDL.SECY.L&LR. PAGE 02/02

The Collectors of the Districts of North 24 Parganas and South 24 Parganas are hereby requested to follow the above policy decision henceforth to smoothen the process of Land Acquisition only for the "AILA Project".

It is also ordered that all the cases where award has been declared but problems as stated above exist, the award in such cases will be revised for the above mentioned points within six months from the date of this Notification for one time.

This order will not be applicable to any other projects.

By order of the Governor,

S. Dutta
Joint Secretary
to the Govt. of West Bengal
Land & Land Reforms Department

No. 5504/1(6) –LA/1I-147/11(Pt.) Dated 10.10.2012

Copy forwarded for information and necessary action to the :-

1. District Magistrate & Collector, South 24 Parganas, New Treasury Building, 5th Floor, Alipore, Kolkata- 700027.
2. District Magistrate & Collector, North 24 Parganas, Administrative Building, P.O. & P.S.- Barasat, Kolkata- 700124.
3. Additional District Magistrate (LA), South 24 Parganas. New Treasury Building, 5th Floor, Alipore, Kolkata- 700027.
4. Additional District Magistrate(LA), North 24 Parganas, Administrative Building, P.O. & P.S.- Barasat, Kolkata- 700124.
5. Special Land Acquisition Officer, South 24 Parganas, New Treasury Building, 5th Floor, Alipore, Kolkata- 700027.
6. Special Land Acquisition Officer, North 24 Parganas, Administrative Building, P.O. & P.S.- Barasat, Kolkata- 700124.

Joint Secretary
to the Govt. of West Bengal
Land & Land Reforms Department

SPECIAL L.A.O.
SOUTH 24 PARGANAS
ALIPORE

এই তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছে ক্ষেত্র সমীক্ষার সময়ে (২০১৯ সালের ২৩ মার্চ) পশ্চিমবঙ্গের সেচ ও জলসম্পদ দপ্তর থেকে।

এবং দ্বিতীয় হল, সদ্য সিঙ্গুরে জমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বর্তমান শাসক দলের উত্থান। তারা চায়নি যে তাদের শাসন কালে জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে কোন আন্দোলন গড়ে উঠুক। এবং একই সময়ে রাজ্যে তিন দশকেরও বেশি সময়ের পর বাম শাসনের অবসান এবং সবেমাত্র ক্ষমতায় আসা শাসকদলের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন- যার ফলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের পক্ষেও প্রকল্পের নীতি নিয়ে সমালোচনা বা কোন প্রকার প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের ঘটনা এখানে ঘটেনি। এইভাবে সময়ের সাথে সাথে প্রকল্পের কাজ যেমন গতি পেয়েছে তেমনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সরকারি আমলা শ্রেণিরও একটি বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। এই বোঝাপড়া আরও বেশি করে ত্বরান্বিত হয় আইলা পরবর্তী উন্নয়ন কল্পে বিভিন্ন NGO, নতুন নতুন বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি উপকরণ প্রস্তুতকারী কোম্পানির আগমনে। কারণ রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যম হিসেবে এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ভাবে স্থানীয় মানুষের মধ্যে ভূমি বিষয়ক রাষ্ট্রীয় 'আইন কানুন' সম্পর্কে 'নতুন ধারণা' গড়ে ওঠে।

পরিবর্তিত ভূমি রাজনীতিঃ-

ফলস্বরূপ সুন্দরবনের প্রতি রাষ্ট্রের দেখার দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে, যার ফলে এক 'নতুন ভাষ্য' গড়ে উঠছে। যে ভাষ্য সুন্দরবনের বাঘ, মধু, মাছ, কাঁকড়া, পাখি, গরান, হেতাল নদী নালার পরিচিতির সাথে সাথে উন্নয়ন, বিশেষজ্ঞ-জ্ঞান (উন্নয়ন কল্পে), দেশ-বিদেশের প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদির ফলে একটি ভিন্ন 'পরিচিতির' গল্পও উঠে আসছে। অর্থাৎ পরোক্ষ ভাবে বলতে পারি দুর্যোগ পরবর্তীতে স্থানীয় অঞ্চলে উন্নয়নের ফিরিস্তি রাষ্ট্রের উপস্থিতিকে অনিবার্য করে তোলে। জমি জায়গা নিয়ে স্থানীয় মানুষের 'প্রচলিত' ধারণা বা বিশ্বাসকে সরাসরি 'বিশেষ জ্ঞানের' সম্মুখীন হতে হয়। যে কারণগুলির জন্য, স্থানীয় কৃষক শ্রেণির মধ্যে জমির পরিমাপ, ভূ-গঠনগত জমির শ্রেণী চরিত্র, সরকারি মানচিত্র, জমির সীমানা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে যেমন ধারণাগত পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি একই সাথে জমির পর্চা, দলিল, লিজ, (জমি) বেচাকেনার যে সরকারি আইন কানুন তার সম্পর্কেও একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠছে।

এবং এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতে জমি সম্পর্কে ধারণাগত পরিবর্তন যেমন ঘটেছে, তেমনি জমির বাজার মূল্য ও দৈনিক শ্রম মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষিতে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু একটু ছন্দপতন ঘটে যেখানে কৃষির এই পরিবর্তনের সাথে (কৃষি ক্ষেত্রে) প্রযুক্তির ব্যবহার পরিবর্তনে যেন একটু তাল কাটে। ২০০৯ সালে আইলার পর ২-৫ বছরের মধ্যে গরুর লাঙলের পরিবর্তে ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলারের ব্যবহার যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল তা কয়েক বছরের মধ্যে স্থিমিত হয়ে যায়। অর্থাৎ অর্থনীতির যুক্তিতে কোন অঞ্চলে কৃষি (অর্থনীতি) পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার যেভাবে প্রভাব ফেলে, সুন্দরবনের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। তার কারণ একেই ছোট ছোট দ্বীপ, ছোট ছোট জমি, আইলার পরে স্থানীয় অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বাজারমুখি হওয়ায় চাষের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন হয়েছে।[৭৬] এবং সর্বোপরি বলা যায় ট্রাক্টর এতটাই বড় ইঞ্জিন যে এক দ্বীপের কাজ শেষ হয়ে গেলে অন্য দ্বীপে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধার ফলে এখন আর তেমন দেখা যায় না। অর্থাৎ স্থানীয় অঞ্চলে কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার মানে পাওয়ার টিলারের ও ফসলে কীটনাশক ছড়ানোর জন্য স্প্রে মেশিনের ব্যাবহারকেই বোঝায় (তবে উপরিউক্ত অসুবিধার জন্য ট্রাক্টর অনেক কমে গেছে)। কিন্তু উন্নত কৃষি প্রযুক্তির যেসব প্রকল্প যেমন, Precision Agriculture, Drones, AI and Machine Learning, Blockchain, Smart Irrigation Systems, Remote Sensing, Farm Automation, Vertical Farming and Hydroponics এইধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার এখানে ঘটে নি। আসলে এই প্রযুক্তি গুলো পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ মুনাফার প্রয়োজন সেই পরিমাণ লাভ এখানে হবে

[৭৬] অর্থাৎ আইলার আগে স্থানীয় কৃষি পরিবারগুলোর কৃষি উৎপাদনের মূল লক্ষ্য ছিল পরিবারের খাদ্যাভাব নিবারণ করা। কিন্তু আইলার পরে এমন যুক্তি সাজানো হল যে এই অঞ্চলে পুরনো পদ্ধতিতে চাষবাস আর সম্ভব নয়। অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রে কৃষকের বংশপরম্পরায় জ্ঞান এবার থেকে অনেকটাই অকেজো হয়ে গেল। এইরূপ লবণাক্ত মৃত্তিকায় চাষ করতে হলে কৃষককে অবশ্যই উচ্চফলনশীল, হাইব্রিড ও তার সঙ্গে নির্দিষ্ট সার কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। এই ছিল বিভিন্ন বীজ, সার, কীটনাশক বিক্রিকারী কোম্পানির ভাষ্য। কৃষকও সেই মতো বাজার থেকে উচ্চফলনশীল বীজ কিনে চাষ করা শুরু করল। এতে মোট উৎপাদন বাড়ল কিন্তু খরচও বাড়ল দ্বিগুণ, ফসলের মানও কমে গেল । কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায়, উদ্বৃত্ত ফসল বাজারেও গেল। বেশি উৎপাদনের আশায় কৃষক এখন থেকে জমির পরিবর্তে উঁচু করে আল বেঁধে তাতেই দ্রুত ফসল ফলাচ্ছে। অর্থাৎ এক কথায় বললে বলা যায় যে স্থানীয় অঞ্চলে কৃষির উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কৃষির উন্নতি আর কৃষকের উন্নতি যে এক নয় তা আমাদের বোঝা উচিত। কারণ উন্নয়ন হলেও সেই উন্নয়নের ছোঁয়া যে কৃষকরা পায়না তা ইতিহাসেই প্রমাণিত।

না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা ভাবতেই পারি যে উচ্চফলনশীল ও হাইব্রিড বীজ এবং তার সাথে সার ও কিটনাশক প্রস্তুতকারী বিভিন্ন কোম্পানির রমরমা ব্যবসা দেখা গেলেওকৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি প্রস্তুতকারী কোন কোম্পানির এখানে দেখা মেলেনি। কারণ মুনাফালোভী এই কোম্পানিগুলো হয় নতুন নতুন বাজার দখল করে না হয় নতুন করে বাজার তৈরি করে। যেমন বিভিন্ন বীজ, সার, কীটনাশক প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো আইলা দুর্যোগকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে নতুন বাজার তৈরি করেছে। কিন্তু কৃষি প্রযুক্তি প্রস্তুতকারী বিভিন্ন কোম্পানিগুলোর পক্ষে নতুন করে বাজার তৈরি করার সুযোগ এখানে ছিলনা।

একই ভাবে বলতে পারি যে প্রযুক্তির ন্যায় 'সেচ' ব্যবস্থাতেও কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অন্যতম শর্ত হল সেচ ব্যবস্থার উন্নতি। পাথরপ্রতিমা ব্লকের মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৩০৫০৬ হেক্টর। তার মধ্যে ২৬% জমিতে খারিফ শস্য উৎপাদন হয়। জমির ধরণ মূলত ৬১% নিম্নভূমি, মাঝারি ২৬% ও উঁচুভূমি ১১%।[৭৭] এই অঞ্চলে কৃষিকাজ মৌসুমি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। ব্লকে চাষের ক্ষেত্রে কেবল মাত্র ২০% জমি পুকুর, খাল ইত্যাদি থেকে সেচ করা হয় (দেখুন, ধারা ও অন্যান্যরা ২০১৬, পৃঃ ২৪২)। সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে চিত্রটি একটু আলাদা। ভারতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্রমশ সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে যেমন ভারতে ১৯৫১ সালে ২২.০৬% মিলিয়ন হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫ সালে ৯০ মিলিয়ন হেক্টরে পৌঁছেছে। এবং বর্তমান ভারতের প্রায় ৫০% জমিতে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন করা হয়।[৭৮] সমগ্র ভারতের কৃষি ব্যবস্থার সাথে তুলনা করলে বোঝা যায় পাথরপ্রতিমা ব্লকের কৃষির হালহকীকত। যেখানে ভারতে প্রায় ৫০% চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা রয়েছে, এবং ক্রমস সেচ ব্যবস্থার বৃদ্ধি হচ্ছে সেখানে পাথরপ্রতিমার সেচ ব্যবস্থা বলতে পুকুর, খালবিলে সঞ্চিত বৃষ্টির জলে মাত্র ২০% জমির চাষ কেই বোঝায়। অর্থাৎ এই ২০% জল যা পুরোটাই আসে পুকুর, খাল-বিল, ড্রেন থেকে, যা আবার সম্পূর্ণ বর্ষার দ্বারা পরিপুষ্টিত হয়। সমগ্র পাথরপ্রতিমা ব্লকে

[৭৭] এই তথ্যটি Reconnaissance Study of five Blocks in Sunderbans, India under CCDRER project, 2012 2013, পৃঃ ৭, থেকে সংগ্রহ করেছি।
https://www.drcsc.org/CCDRER/docs/Reconnaissance%20Study%20Report.pdf

[৭৮] এই তথ্যটি FAO এর Irrigation of India নামক রিপোর্টে পৃঃ ১ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
https://www.fao.org/4/y5082e/y5082e08.htm#TopOfPage।

সেচ ব্যবস্থায় সরকারের ভূমিকা বলতে বোঝায় এই পুকুর, খালবিল এইরূপ পুরনো জলাশয় গুলোকে আংশিক সংস্কার করা ও কিছু ক্ষেত্রে নতুন ভাবে কৃষকের জমিতে পুকুর খনন করা। আমাদের ক্ষেত্র সমীক্ষার মৌজাগুলোতে দেখেছি সরকারি প্রকল্পের এই উপকার পেয়েছে মাত্র ৪% কৃষক। অর্থাৎ উন্নতমানের সেচ ব্যবস্থা এখানে দেখা যায় না। আইলার পরে যখন কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়, তখন স্থানীয় কিছু কৃষকের দাবি ছিল যে সেচ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সরকারকে ভর্তুকিতে গভীর নলকূপের মাধ্যমে (শ্যালো মেশিন) জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকি কিছু কিছু কৃষক ব্যাক্তিগত ভাবে নিজেদের জমিতে এই শ্যালো মেশিন বসানোর উদ্যোগ নিলে স্থানীয় পঞ্চায়েত তাতে বাধা দেয় এই বলে যে বদ্বীপ অঞ্চলে অগভীর নলকূপের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রের জন্য জল উত্তোলন করলে মাটির তল দেশ শুকিয়ে যাবে। যা দীর্ঘ কালীন কৃষির জন্য বুমেরাং হবে। সুতরাং আইলার পরে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও প্রযুক্তি ও আধুনিক সেচ ব্যবস্থা এখানে গড়ে ওঠেনি।

আমলা তান্ত্রিক পরিবর্তনঃ-

সুন্দরবনে দুর্যোগ পরবর্তী উন্নয়নের প্রশ্নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য সরকারি আমলা শ্রেণীর উপস্থিতি ঘটে। নদীবাঁধ মেরামতের জন্য ভূমী অধিগ্রহণ ও তা বাস্তবায়িত করা, শস্য হানির ফলে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ও নানা প্রকার সামাজিক প্রকল্প পরিচালনা করার জন্য দক্ষ আমলা শ্রেণীর প্রয়োজন হয়। যার ফলে স্থানীয় অঞ্চলে নতুন করে আমলাতান্ত্রিক কার্যকলাপ এর বিস্তার এই অঞ্চলের অর্থ রাজনীতির ওপরে প্রভাব ফেলেছে, এই প্রভাব সরাসরি আইলা দুর্যোগের সাথে সম্পর্কিত না হলেও, দুর্যোগের পরে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। জমি অধিগ্রহণের জন্য নতুন নতুন বিভাগ ও তার জন্য সরকারি আমলা নিয়োগ, এবং ভারি বর্ষায় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার জন্য গ্রামে গ্রামে অস্থায়ী অফিস গড়ে তোলায় স্থানীয় মানুষের সাথে সরকারি আমলা গোষ্ঠীর পরিচিতি গড়ে উঠেছে। যার ফলে স্থানীয় মানুষের মনে ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘাত প্রতি ঘাতে জড়িয়ে যাচ্ছে সরকারি আমলাতান্ত্রিক নিয়মকানুন। রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক নিয়মকানুনের সাথে সম্পর্কিত হয়ে জীবনযাত্রায় এক জটিলতার ছাপ পড়ছে, সাথে সাথে গড়ে উঠছে নতুন নতুন জ্ঞান। এখন

প্রশ্ন হল আমলাতান্ত্রিক নিয়মকানুনের সাথে স্থানীয় মানুষের প্রচলিত ধ্যান ধারণা কতটা খাপ খাওতে পারছে? নাকি আরও বেশি করে রাষ্ট্রীয় বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ছে? রাষ্ট্রের এই উপস্থিতির ফলে স্থানীয় মানুষের কি উপকার/ভালো হল, নাকি রাষ্ট্রের যা ভালো বা উপকার তাই জনগণের ভালো বা উপকার? উত্তরটি খোঁজার জন্য একটু ইতিহাসের শরণাপন্ন হলাম।

প্রাক আধুনিক রাষ্ট্রে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্কে এতটা সচেতন ছিলনা। কিভাবে চাষ করে শস্য উৎপাদন করা যায়, বা কিভাবে জমি থেকে বেশি পরিমাণ উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত শস্য সঞ্চয় করা যায় কিংবা জমির নির্দিষ্ট মালিকানা সম্পর্কিত নকসা ও পরিমাপের গুরুত্ব কতটা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট ছিলনা। সেখানে ছোট ছোট অংশে নিজেদের প্রচলিত ধারণার দ্বারাই জমি পরিমাপ করা হত। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদন, গৃহপালিত পশু পালনের জন্য জমি ও সমগ্রের ইচ্ছানুযায়ী পরিবার গুলিকে কৃষিজমি ভাগ করে দেওয়া হত । কয়েক বছর পর পর আবার জমি গুলিকে অন্য কোন পরিবারের কাছে প্রদান করে উৎপাদিত শস্য স্থানীয় অঞ্চলের পরিবারে সদস্য অনুযায়ী ভাগ করা হত। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র সরলীকরণের মাধ্যমে প্রাক আধুনিক রাষ্ট্রের প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে একটি সমস্যার সম্মুখীন করে। সেখানে ভূমিকে একটি নির্দিষ্ট তপশীল ভুক্ত (cadastral map) করা হয়। যেখানে প্রাক আধুনিক রাষ্ট্রের সমস্ত পরিমাপ গুলিকে বাতিল করে একটি নির্দিষ্ট সার্বিক পরিমাপে পরিণত করা হয় । যেমন বিঘা থেকে হেক্টর বা একর, মাইল থেকে মিটার, কিলোমিটার ইত্যাদি (দেখুন Scott; ২০০৩)।

সুতরাং রাষ্ট্রের উপস্থিতির ফলে কিভাবে স্থানীয় অঞ্চলে প্রচলিত জমির ধারণা, ভৌগোলিক আকৃতি ও জ্ঞানের পরিবর্তন হতে থাকলো তা এখানে বিশ্লেষণ করাটা গুরুত্বপূর্ণ। আইলা পূর্বে গ্রামের মানুষ নির্দিষ্ট কয়েকটি হাতে গোণা সরকারি বিভাগীয় পদস্থ কর্মচারীর সাথে পরিচিত হতে পারত। স্থানীয় অঞ্চলের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রেশন ও ভোটার কার্ড, তপশীল ও তপশীল উপজাতি সংক্রান্ত পরিচয় পত্র কিংবা সামান্য কিছু সামাজিক প্রকল্পের জন্য স্থানীয় ব্লক উন্নয়ন অফিসে যাওয়াআসা থাকলেও আইলার পর থেকে নতুন করে (জমির) রেজিস্ট্রি অফিস, ভূমি ও কৃষি দপ্তরে স্থানীয় মানুষের যাওয়াআসা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। যেমন এখানে খাজনার কথা উল্লেখ করতে পারি। আইলার আগে স্থানীয় একজন ঠিকা কর্মী কয়েক বছর পর পর বাড়ি বাড়ি এসে সরকারি খাজনা আদায় করত। যিনি ‘কমিশনের’ ভিত্তিতে ঠিকা কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত

ছিলেন। অর্থাৎ তিনি যত পরিমাণ খাজনা তুলে দিতে পারবেন, তার ভিত্তিতে তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস থেকে কমিশন পাবেন। এখন তার কাজ আর নেই। স্থানীয় কৃষক এখন তাঁর নিজের তাগিদে পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে খাজনা প্রদান করে। এই ভাবে ব্লকের প্রত্যেক দপ্তরে স্থানীয় মানুষের দৈনন্দিন যোগাযোগের ফলে উক্ত দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে একটি পরিচিতির মাধ্যম তৈরি হয়। নতুন এই পরিচিতি শুধু স্থানীয় মানুষের মধ্য নয় আমলা গোষ্ঠীকেও নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে তোলে। এই ভাবে ধীরে ধীরে স্থানীয় মানুষ আমলা গোষ্ঠীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পূর্ণ নাগরিকে পরিণত হতে থাকল। সুতরাং আমরা এখানে দেখছি, রাষ্ট্র বণ্টন ব্যবস্থার জন্য এক কাঠামো তৈরি করে। যে কাঠামোটি রাষ্ট্রের ভাষা প্রতিষ্ঠা করে। যে ভাষার মাধ্যমে সমাজে রাষ্ট্রীয় জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন বণ্টনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কৌশল। যেমন সুন্দরবনের ক্ষেত্রেও ঘটেছে।

জমির বাজারমূল্যঃ-

আইলা দুর্যোগের পরে স্থানীয় অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হলে স্থানীয় জমির দাম প্রায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ জীবনে কৃষি জমি শুধু যে উৎপাদনের উপকরণ তা নয় বরং গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবেও দেখা হয়। ভারতের মত একটি অর্থনৈতিক সম্প্রসারনশীল দেশে কৃষি জমির বাজার ক্রমশ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। ভারতে উদারীকরণের ফলে জমির দাম দ্রুতগতিতে বেড়েছে, এমনকি উন্নত দেশ গুলোর থেকেও বেশি (দেখুন নায়েক; ২০২০; পৃঃ ১৪১)। তবে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভূমি সংস্কার ও জমি বিক্রির ফলে ভারতে নিম্ন শ্রেণীর মানুষই বেশি উপকৃত হয়েছে (দেখুন, নায়াক; ২০২০; পৃঃ ১৪৩)। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে পরিষেবা ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠার ফলে ভারতে কৃষি জমির দাম আরও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং ক্রমবর্ধমান পরিষেবা খাতে জমির চাহিদা ও জনসংখ্যার বৃদ্ধিও জমির দামের ওপরে প্রভাব ফেলছে। সুন্দরবনের ক্ষেত্রে আইলার পরে কৃষি জমির বাজারমূল্য প্রায় তিন থেকে চারগুণ বৃদ্ধি পায়। আইলার আগে স্থানীয় অঞ্চলে কৃষি জমির দাম (গড়ে) বিঘা প্রতি (২০ কাঠায় এক বিঘা ধরে) ৭০ হাজার থেকে ১ লাখ পর্যন্ত ছিল। কিন্তু আইলার পরে স্থানীয় অঞ্চলে জমির দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে গড়ে ২.৫

থেকে ৩.৫ বা কোন কোন ক্ষেত্রে ৪ লাখ পর্যন্ত হয়ে যায়। ২০০৯ সালে দুর্যোগ পরবর্তী উন্নয়নের ফলে ধীরে ধীরে জমির দাম বৃদ্ধি পেলেও ২০১৫-১৬ সালে স্থানীয় অঞ্চলে বৈদ্যুতিক পরিষেবা কাজ শুরু হলে তা আরও ত্বরান্বিত হয়। দ্বীপাঞ্চলের ফলে সরকারি উন্নয়নের ছোঁয়া যেমন বিশেষ পাওয়া যায়না বা যায় নি তেমনি অদূর ভবিষ্যতেও এই অঞ্চল এ যে কোন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে এই আশা স্থানীয় মানুষও খুব একটা করে না। কিন্তু আইলা দুর্যোগের ফলে স্থানীয় অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও তার কয়েকবছর পর থেকে বৈদ্যুতিক পরিষেবা শুরু হলে জমির বাজার মূল্য এক ধাক্কায় অনেকটা বৃদ্ধি পায়।

কোন অঞ্চলে জমির বাজার মূল্য হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে তার নানান কারণ আমরা দেখি যেমন, স্থানীয় জমি দালালদের ভূমিকা, সরকারি বা বেসরকারি কোম্পানির প্রকল্প কিংবা জনকল্যাণ প্রকল্প, এইরূপ নানান কারণে জমির দাম বৃদ্ধি পায়। এই ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। যদি ধরেও নি নদী বাঁধ মেরামতের জন্য সরকার সমগ্র সুন্দরবনে মোট ১৭০০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। এই একটা ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোন প্রকল্প হয়নি যেখানে জমি অধিগ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু তাহলে এই যে নদীবাঁধ মেরামতের প্রকল্পকে আমরা উন্নয়ন বলছি তার সাথে জমির বাজার মূল্য বৃদ্ধির সম্পর্ক কোথায়? এই বিষয়ে বলতে হয় বাঁধ আগের তুলনায় শক্তপোক্ত হওয়ায় স্থানীয় মানুষ দুই দিক থেকে উপকৃত হয়েছে। প্রথমত, নদীর লোনা জল (কোন কোন গ্রামের) চাষের জমিকে তুলনামূলক ভাবে কম প্লাবিত করছে। এবং দ্বিতীয়ত হল আইলার আগে নিচু ও দুর্বল নদী বাঁধ এখন অনেক শক্ত পোক্ত হয়েছে। যার ফলে স্থানীয় মানুষ এই নদীবাঁধকে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। যেমন চাষের সময়ে পাওয়ার টিলার এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়া-আসার জন্য তাঁরা এখন অনায়াসে নদী বাঁধ ব্যবহার করে। এখন কৃষক আর দূরের জমি থেকে ধান কেটে মাথায় না বয়ে মেশিনভ্যানে করে (ধান) বাড়ি নিয়ে আসে। এর ফলে শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা ও সময়ব্যয় অনেকটাই কমে গেছে। এই ভাবে স্থানীয় মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নানান ক্ষেত্রে নদী বাঁধের ব্যবহারের বৃদ্ধির ফলে আর্থিক ভাবে কিছুটা হলেও সুবিধা হয়েছে ।

তবে বলা যায় স্থানীয় অঞ্চলে জমির বাজার মূল্য বৃদ্ধির ফলে কিছু এজেন্ট গড়ে উঠেছে যারা অনেকদিন ধরে বেহাতি হয়ে যাওয়া জমিকে মালিক পক্ষের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে প্রচুর অর্থ

উপার্জন করছে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে আইলা প্রকল্পে নদীবাঁধ মেরামতের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অঞ্চলে জমির জটিলতা সামনে আসে। এতে দেখা যায় বহু জমি নামি বেনামিতে রয়েছে। এজেন্টরা এই বেনামি জমিগুলোর পুরনো নথী খুঁজে বের করে সরকারের কাছে কেস করে। কেসে জয়লাভ করলে চুক্তি অনুযায়ী মালিক পক্ষের কাছে নির্দিষ্ট কমিশন নেয়। এই ভাবে স্থানীয় এজেন্ট আইলার পর থেকে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ লক্ষ টাকা আয় করেছে। এই কারণগুলো স্থানীয় অঞ্চলে জমির মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। আসলে উন্নয়নের বাইরে থাকা এই মানুষগুলো সরকারি সামান্য উন্নয়নের ছোঁয়ায় উৎসাহিত হয়ে পড়ে। তাঁরা এই উপলব্ধি করে যে সুন্দরবনের মানুষ হিসেবে এবার রাষ্ট্রের কাছে গুরুত্ব পাবে। অর্থাৎ এখন থেকে তাঁরা রাষ্ট্রের পূর্ণ নাগরিকে পরিচিত লাভ করবে। ঠিক এই ভাবনা থেকে স্থানীয় অঞ্চলে কৃষি জমির বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়।

সম্পদের ধারণাগত পরিবর্তনঃ-

আধুনিক রাষ্ট্র সীমানার অভ্যন্তরে সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী হল রাষ্ট্র নিজেই । যেমন জনগণের পরিষেবার জন্য রাস্তাঘাট তৈরি করা, সরকারি বা বেসরকারি শিল্প, কলকারখানা, সৈন্য অর্থাৎ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা উন্নয়নের খাতিরে আইন মোতাবেকে ও নৈতিক কর্তৃত্বের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপরে অধিকার স্থাপন করতে পারে। আলোচনালব্ধ বিষয়বস্তুকে বিষদে উপলব্ধি করার জন্য আমরা একটু ইতিহাসের পাতায় অবতরণ করতে পারি। লক তার ‘সম্পত্তির’ ধারণায় বলেছেন “মানুষের কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে ‘মিশ্রিত’ যে কোন বস্তুর উপরে, তার স্বাভাবিক অধিকার বর্তায়, যেমন তার দ্বারা চিহ্নিত এবং কর্ষিত ভূখণ্ডের উপরে তার স্বাভাবিক অধিকার বিরাজ করে” ‘অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের ব্যবহারের জন্য, মানুষের সাহায্যে এবং সুবিধার্থে। কিন্তু মানুষ যাতে ভালোভাবে ঐ সম্পদ ভোগ করতে পারে, তার জন্য সর্বপ্রথম যা’ প্রয়োজনীয়, তা’ হচ্ছে সেটা দখল এবং অধিকার করা’ এবং এই দখলের জন্য অধিকার থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। অর্থাৎ লক এটাই বলতে চাইছেন যে, প্রত্যেক মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে সম্পত্তি লুক্কায়িত রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ কে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হলে, মানুষকে অবশ্যই তাঁর ‘কায়িক শ্রমের’ বিনিময় (প্রকৃতির সাথে) করতে হয়। ব্যক্তির

শ্রমের বিনিময়ে সম্পদ উৎপাদিত হয় বলে, তা নিজের বলে দাবি করতে পারে। সুতরাং যে সম্পদ প্রকৃতি থেকে মানুষের শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত হয়, তা অবশ্যই তাঁর নিজের। এই ভাবে বলতে পারি যে, 'মানুষের সম্পত্তির অধিকারের উৎস তার শ্রম' (দেখুন অমল কুমার মুখোপাধ্যায়; ২০১৩)। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, আঠারো শতকে জমিতে বেড়া দেওয়ার ফলে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ইয়োরোপে আদিম যৌথ কৃষি ব্যবস্থার অবসান লগ্নে, ব্যক্তিগত কৃষি উৎকর্ষ বা মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্র থেকে লক প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। সার্বিক ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, লক এখানে ব্যক্তির 'স্বার্থকে' প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম দিকে লক ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জনের সীমারেখা টানার চেষ্টা করলেও, পরবর্তী সময়ে ব্যক্তি স্বার্থকে তিনি অপ্রতিরোধ্য বলে মনে করেন। এবং অপর দিকে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থকে গুরুত্বহীন বলে মনে করেন। যার ফলে বৃহত্তর সামাজিক অবস্থানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা ও তাদের সংস্কৃতির আত্মপরিচয় এক সংকটে পড়ে। আইলা পরবর্তী সময়ে পাথরপ্রতিমা ব্লকে রাষ্ট্রের উপস্থিতিতে (স্থানীয় অঞ্চলের মানুষের মধ্যে) সম্পত্তির প্রচলিত ধ্যানধারণার পরিবর্তে 'রাষ্ট্র-নৈতিক উন্নত ও বিশেষজ্ঞ' যে জ্ঞান গড়ে উঠছে, তা এক অর্থে অষ্টাদশ শতকে লকীয় সম্পত্তির ধারণার সাথে তুলনা করতে পারি। এর ফলে সাধারনের মধ্যে সম্পদ সম্পর্কে নতুন করে ধারণা গড়ে ওঠায় জমিতে সীমানা দেওয়া হয়। ফলত জমির ভৌগোলিক রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। যেমন জমির সীমানা নির্ধারণ, অনুর্বর ও পতিত জমিকে চাষ যোগ্য করে তোলা, জমির পরিবর্তে সীমানা বরাবর উঁচু বাঁধ দিয়ে তাতে বাজার মুখী সব্জি চাষ করা। এই ভাবে ধীরে ধীরে জমির প্রতি প্রচলিত ভাবাবেগের পরিবর্তে গড়ে উঠতে থাকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ভাবাবেগ বর্জিত 'ভূমি' কেন্দ্রিক ধারণা। অর্থাৎ যেখানে James C Scott, তাঁর 'Seeing like a State' বইতে দেখাচ্ছেন যে আধুনিক রাষ্ট্র তার উপস্থিতির ফলে নির্দিষ্ট 'মানচিত্রের' মাধ্যমে কিভাবে জমি গুলিকে সীমানার মধ্যদিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তে রূপান্তর করেছে। এর ফলে ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির প্রচলিত বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে গড়ে উঠল একটি একমাত্রিক ব্যবস্থা। যে একমাত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ জমির সীমানা বরাবর আল দেওয়া, সরকারের কাছে নিয়মিত কর ও খাজনা প্রদান করা (আসলে বাধ্য হওয়া), নতুন করে জমির সরকারি খাতায় সঠিক ভাবে নথিভুক্ত করা ইত্যাদি অভ্যাসের নিয়ন্ত্রণে পড়ে গেল। এর ফলে দেখা যায় ধীরে ধীরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নিজেদের গোষ্ঠী গত 'পরিমাপ' পরিচিতির পরিবর্তে রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক

পরিমাপের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার প্রবণতা জন্ম নিচ্ছে। যেমন বিঘা থেকে হেক্টর/একর, মাইল থেকে কিলোমিটার, পর্চা থেকে মিউটেশন ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে ব্যক্তিগত জমির মালিকের দলিল বা পর্চার সাথে বৃহত্তর ভাবে সরকারী উন্নয়নের সম্পর্ক কি?

মনে রাখা উচিৎ স্থানীয় অঞ্চলে পরিবারগুলির কাছে যেখানে বেশিরভাগ নির্দিষ্ট জমি সরকারি খাতায় নথিভুক্ত ছিল না, সেখানে সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নের তাগিদে ভূমি অধিগ্রহণ করবে কিভাবে? বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে শস্য উৎপাদন কম হলে সরকার কিসের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেবে? এই প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে রাষ্ট্র আসলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নির্দিষ্ট নথিভুক্তির কারণে অনুশীলন যথা জরীপ, কর, খাজনার সাথে সাথে স্বত্বাধিকার হিসাবে রায়তি, খাস, বর্গাদার যেমন রয়েছে তেমনি ডাঙা, শালী, বাস্তু বিভিন্ন 'শ্রেণীতে' ভাগ করে জমির মূল্যায়ন স্থির করে। এর ফলে সমবায় পদ্ধতিতে জমির ভাগীদার, চাষবাস, গবাদি পশুর প্রতিপালনের পরিবর্তে জমির সীমানা নির্ধারণ করে কিছু শ্রেণীর মানুষকে তা স্থায়ী বণ্টন করার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন সুন্দরবনে বেশিরভাগ জমি জায়গা বিক্রি হত (আইলার আগে পর্যন্ত) ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পরিচিতি ও আত্মীয়তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে। যার ফলে জমি হস্তান্তর হলেও সরকারি খাতায় পরিবর্তিত মালিকের নাম নথিভুক্ত করার তাগিদ কম দেখা যেত। কারণ একদিকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রতি একটা বিশ্বাস, যা গড়ে ওঠে নিজস্ব গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন থেকে। যেমন বিভিন্ন গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে নিজেদের উদ্যোগে জমি জায়গাকে জরীপ করে, নির্দিষ্ট সীমানায় ভাগ করে নিতে দেখা যেত।

পাথরপ্রতিমা ব্লকে গ্রামের (ভেতরে) রাস্তার জন্য সরকারি মানচিত্রে নথী ভুক্তি হয়ে থাকলেও আইলার আগে পর্যন্ত অনেকাংশেই তা বেদখল হয়ে থাকত। কিন্তু আইলার পরে রাস্তা তৈরি হওয়ায় নিজেদের জমি জায়গার সীমানাও পরিবর্তিত হয়। কিছু চাষি পরিবর্তিত সীমানা অস্বীকার করায় কৃষক শ্রেণীর মধ্যে অন্তঃকলহ শুরু হয়। যার ফলে স্থানীয় আমিনের মাধ্যমে গ্রামের জমি পুনরায় জরীপ করে নির্দিষ্ট সীমানা বরাবর ভাগ করে নেওয়া হয়। এই ভাবে সম্পত্তি নিয়ে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্নেরও উত্থাপন হয় । সম্পত্তির সূচক যদি স্থায়ী সীমানা ও পরিমাপেই হয়, তাহলে সেই সীমানা ও পরিমাপের মানদণ্ডও স্থায়ী হওয়া দরকার। কিন্তু যেখানে সীমানা ও পরিমাপ আপেক্ষিক সেখানে স্থানীয় মানুষ সম্পত্তির পরিচয়

কিভাবে দেবে? আমি এখানে কৃষ্ণদাসপুর মৌজার মৌসুমি ঘেরির মাধ্যমে উত্তরটি খোজার চেষ্টা করব। নদীর জলই হল কৃষি উৎপাদনের বড় অন্তরায়। আধুনিক রাষ্ট্র এই ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাঁধ দিয়ে নদীর জল ও কৃষি জমির ভাগ করে। এবং যে বাঁধকে সীমানা হিসাবে উল্লেখ করে জমির বণ্টন ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু জি-প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌসুমি ঘেরির কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। যেখানে পলি জমে চর গড়ে ওঠে। এই চরটির ১২০০ বিঘার মধ্যে ৩০০ বিঘা সরকারি ভাবে কিছু পরিবারকে পাট্টা দেওয়া হয় যেখানে বেশিরভাগ পরিবার বিভিন্ন প্রকার নদীর মাছ চাষ করে জীবিকা অর্জন করে। বাকি অংশটি খাস হিসাবে নথিভুক্ত থাকে। কয়েক বছর অন্তর অন্তর উক্ত স্থানে নদী বাঁধটি তে ভাঙ্গন ধরে। যার ফলে অঞ্চলটির প্রচলিত নাম হয় 'ভাঙ্গা ঘেরি'। ২০০৯ সালে আইলায় অঞ্চলটির নদীবাঁধ বৃহৎ আকারে ভেঙ্গে যায়। তারপর থেকে সারা বছর জোয়ারের সময়ে স্থানীয় মানুষ মাছ কাঁকড়া ধরে পরিবারের খাদ্য বা উপরি অর্জন করে। কিন্তু স্থানীয় পঞ্চায়েতর তত্ত্বাবধানে ২০১৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে নদীবাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হয়। বাঁধটি সম্পূর্ণ হলে, পাট্টা প্রাপ্ত পরিবারগুলো নিজ নিজ সীমানা বরাবর বাঁধ তৈরি করে।

আইলার সময়ে বাঁধ ভেঙে বর্তমান চরে নদীতে মিশে গেছে
পাথরপ্রতিমা ব্লক, কৃষ্ণদাসপুর । (২০১৯ এপ্রিল ১০)

এখানে সীমানা বা বাঁধ ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচক। যতদিন নদীর জল অবাধে প্রবেশ করতে পেরেছে ঠিক ততদিন মৌসুমি ঘেরির কোন অংশই ব্যক্তিগত দখলে ছিলনা। স্থানীয় মানুষ এখান থেকে মাছ ধরে জীবিকা উপার্জন করতে পারত। কিন্তু সরকার নদী বাঁধ মেরামত করায় এতদিন জলের তলায় থাকা ফিসারিগুলকে (মালিক শ্রেণী) সীমানাবরাবর বাঁধ দিয়ে নিজ দখলে নেয়।

এর ফলে সাধরণ মানুষ এই ফিসারিগুলতে মাছ ধরার জীবিকা থেকে উৎখাত হয়। অর্থাৎ বাঁধের ফলেই বহু পরিবার তাদের জীবিকা হারায়। অর্থাৎ রাষ্ট্র তপশীল ভুক্তের (Cadastral map) মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীবন জীবিকা থেকে তাদের উৎখাত করে। অর্থাৎ একদিকে বাঁধের ফলে যেমন কিছু মানুষের রুজি রোজগার হারাবে তেমনি আবার বাঁধ ভেঙ্গে জল প্রবেশ করলে প্রান্তিক মানুষের রুজি রোজগারের সন্ধান হবে। অর্থাৎ বাঁধ মেরামতের পরে পাট্টা প্রাপ্ত পরিবার ব্যক্তিগত সীমানার ফলে যেমন সম্পত্তির অধিকার পায়, তেমনি বাঁধ ভেঙ্গে জল প্রবেশ করলে সীমানার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে সম্পত্তির অধিকার হারায়। সুতরাং এখানে বলা যায়, যেখানে সীমানা নির্দিষ্ট নয়, সেখানে সম্পত্তির পরিচয় কিভাবে হবে? নাকি ব্যক্তিগত 'সীমানা' নামক প্রতিষ্ঠানের নামে আসলে প্রান্তিক মানুষকেই শোষণ করে? নিম্ন সুন্দরবনের দ্বীপ গুলি এখনও সচল হওয়ায় প্রায়শই নদীর বাঁধ ভেঙ্গে বহু ঘর বাড়ি সহ চাষের জমি জলে তলিয়ে যায়। সুতরাং নদী-বাঁধ মেরামতের নামে জমি অধিগ্রহণের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে প্রচলিত ধ্যান ধারনার পরিবর্তে নতুন যে উদ্দীপনা জন্মায় তা আসলে উপকথার নামান্তর। কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের সাথে রাষ্ট্রের যে সম্পর্ক তৈরি হয় তা আসলে সার্বভৌমের বৈধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার রশিদ মাত্র।

আইলা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় মানুষের উদ্দীপনা ও উৎসাহকে ব্যবহার করে রাষ্ট্র খাজনা নামক প্রতিষ্ঠানটিকে সচল করে তোলে। সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয় যে, ক্ষতিপূরণের এই অর্থ পাওয়ার জন্য প্রত্যেক চাষিকে নিজস্ব জমির দলিল বা রেকর্ড দেখিয়ে খাজনা প্রদান করতে হবে। বিগত বছরগুলোর বকেয়া খাজনা সম্পূর্ণ প্রদান না করা পর্যন্ত কোন চাষিকে সরকার এই ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করবে না। ঠিক এখান থেকেই সুন্দরবনের রায়তি, বর্গাদার, পাট্টা ও খাস জমির নিয়ম নীতি ও জমি কেনাবেচার সম্পর্কে নতুন ধারণা গড়ে উঠেছে। সরকার এই নীতি ঘোষণার পর পাথারপ্রতিমা ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতে অফিস ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে ব্যাপক হারে বকেয়া খাজনা প্রদান করার জন্য সাধারণ মানুষের লম্বা লাইন দেখা যায়। গ্রামপঞ্চায়েতে এমন দুদিন হাজির হয়ে দেখি চাষি খাজনা প্রদান করার জন্য ইট, প্লাস্টিকের বোতলের লাইনের সাথে সাথে কেউ কেউ রাতে অফিস লাগোয়া মশারি খাটিয়ে রাত গুজরান করেছে । এবং এটাও দেখা গেছে যে খাজনা প্রদানকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে প্রশাসনকে

পুলিশের সহযোগিতা নিতে হয়েছে। আবার সরকারের এই নির্দেশের ফলে বাড়তি কাজকর্মের তাগিদে দপ্তরগুলোতে কিছু অস্থায়ী কর্মচারীও নিয়োগ করা হয়। এখানে উল্লেখ করতে পারি যে আসলে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ নয়, বরং এর মধ্যে দিয়ে খাজনা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানটিকে সচল করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কারণ আইলার পরে ২০১৫ সালে ভারি বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হলে সরকার এই ক্ষেত্রেও একই নীতি গ্রহণ করে। এবং এর পরবর্তী সময় থেকে সরকারি যে কোন কাজের জন্য জনগণকে খাজনা পরিশোধ করার রশিদ দেখাতেই হবে, নাহলে সেই ব্যক্তি সরকারি কোন সুযোগ পাবেনা। এইভাবে ধীরে ধীরে স্থানীয় অঞ্চলে খাজনা প্রদানের ব্যবস্থাকে সচল করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, উন্নয়ন কল্পে যে জমিগুলো অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে নাহয় জমির ক্ষতিপূরণের জন্য নির্দিষ্ট মালিকের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের যদি উন্নয়নই মূল লক্ষ হয় তাহলে গরীব চাষিদের বকেয়া খাজনা মকুব করে দিত। কিংবা ভারী বর্ষায় শস্যের ক্ষতি হলে, স্বাভাবিক যুক্তিতে কৃষকের খাজনা মকুব হওয়ার কথা। অথচ ভারী বর্ষায় শস্যহানি হওয়ায় তার ক্ষতিপূরণের জন্যও আগে খাজনার রশিদ দেখিয়ে পরে সেই রশিদ দিয়ে ক্ষতিপূরণের আবেদন করা যাবে। আইলা পরবর্তী সময়ে উন্নয়নকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনে কৃষি ব্যবস্থার এই পরিবর্তনগুলো স্থানীয় অঞ্চলের অর্থরাজনীতিতে এক দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব ফেলেছে। যা পরবর্তী অধ্যায়ে তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

তৃতীয় অধ্যায়

দুর্যোগ ও পুঁজির উত্থান

সাবেকী ও আধুনিক পুঁজির সম্পর্কঃ-

আমরা বর্তমান অধ্যায়ে দেখব আইলা দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে উন্নয়নকে সামনে রেখে কিভাবে পুঁজিবাদ তার বাজার তৈরির অভিসন্ধিকে সম্প্রসারণ করে। এই পুঁজিবাদী সম্প্রসারণের ফলে স্থানীয় মানুষের সাময়িক 'ভালো' হওয়া ও কিছু 'অবকাঠামোগত' (infrastructure) পরিবর্তন হলেও বস্তুতপক্ষে দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য সেই উন্নয়নের ছোঁয়া কতটা তাঁরা পেয়েছেন তা এক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে দ্রুত পুনর্গঠনের জন্য সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এমন কিছু যুক্তির অবতারণা করে যা স্থানীয় অঞ্চলের দীর্ঘদিনের প্রচলিত অর্থনীতির (বিশেষত কৃষি অর্থনৈতিক) ধারনাগুলো ভেঙ্গে উক্ত পুঁজিবাদী ধারণাকে প্রতিস্থাপন করে। যেমন নদীর বাঁধ দ্রুত মেরামত করার জন্য অবশ্যই স্থানীয় মানুষের শ্রমের পরিবর্তে বিভিন্ন বৃহৎ কোম্পানির যন্ত্রচালিত মেশিনের ব্যবহার করা। কারণ এটাই যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে, ক্রমশ 'বিশ্ব উষ্ণায়নের' ফলে জলস্তর যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে নদীর বাঁধ এতটাই উঁচু ও শক্তপোক্ত করতে হবে যা 'মানবিক শ্রমের' দ্বারা আর সম্ভব নয়। এর ফলে নদীবাঁধ মেরামতের জন্য স্থানীয় মানুষ প্রতি বছর যে কাজ পেত তা বন্ধ হয়ে গেলেও তাঁরা এই যুক্তিকে সাদরে গ্রহণ করলেন এটা ভেবে যে নদী বাঁধ মেরামতের জন্য অবশ্যই বৃহৎ কোম্পানির মেশিনের প্রয়োজন।[১] নাহলে সুন্দরবন টেকানো যাবে না।[২] এর ফলে সুন্দরবনের হাজার হাজার প্রান্তিক

---

[১] কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রচলিত/প্রথাগত/পুরনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের ফলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠলে, প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে স্থানীয় মানুষ কাজ হারান। এটা পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটি নিজস্ব মডেল। সুন্দরবনের ক্ষেত্রেও তার ভিন্নতা ঘটেনি। কিন্তু আমরা এখানে দেখব এই প্রযুক্তির ব্যবহার কি অন্যান্য অঞ্চলের থেকে কোথাও ভিন্ন ভাবে ভূমিকা পালন করেছে?

[২] এই বিষয়ে উল্লেখ করতে হয় যে সুন্দরবনে স্থানীয় মানুষের বছরের অর্ধেক আয় হতো ঝড়া-কোদালে মাটি কেটে (কোদাল দিয়ে মাটি কেটে বাঁশের তৈরি ঝড়ার মাধ্যমে সেই মাটি মাথায় বয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত)। এর মধ্যে যেমন নতুন পুকুর খনন, পুরনো পুকুর ও খাল-বিল সংস্কার, নদী বাঁধের মেরামত ইত্যাদি। এই কাজগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ বছরে গড়ে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা আয় করত। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে

মানুষ কাজ হারান। কাজ হারিয়ে স্থানীয় মানুষ বাধ্য হল জীবিকার উদ্দেশ্যে বাড়ির বাইরে যেতে। এর ফলে পুঁজিপতিদের এই যুক্তি আরও কার্যকরী হল এই বলে যে, নদী বাঁধ মেরামতের পাশাপাশি অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও যেখানে কায়িক শ্রমিকের দ্বারা এতদিন পর্যন্ত কাজ গুলো করা হত তা এখন থেকে স্থানীয় শ্রমিকের অভাবে বাধ্য হয়ে সরকার বা ব্যাক্তিগত উদ্যোগে প্রযুক্তির ব্যবহারে মাধ্যমে হতে থাকল। এই যুক্তি ক্রমশ স্থানীয় অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করে।

কয়েক দশকের কাঁচা মাটির (দুর্বল) বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার জল বছরের পর বছর কৃষি জমিকে প্লাবিত করত। এই দুর্বিষহ সমস্যা আরও বেড়ে যেত যখন একই সময়ে স্থানীয় মানুষের ঘর বাড়িও ভেঙ্গে যেত। নদীর তীরে বসবাসকারী মানুষজন তাই নতুন করে বুক বাঁধতে শুরু করল এই আশায় যে আইলার পরে নদীর বাঁধ মেরামত করতে সরকার যেমন দায়িত্বশীল ও তেমনিই যত্নশীলও বটে। দৈত্যকার অদ্ভুত সব মেশিন (যেমন J.C.B, স্ক্র্যাপার ইত্যাদি), ১০০ জনের কাজ এক নিমেষেই শেষ করে উঁচু উঁচু বাঁধ যখন বানায় তখন এই আশা ও ভরসা (সরকারের প্রতি ভরসা) তো সিক্ত, জীর্ণ, সঙ্কট কবলিত এই মানুষজন ‘চোখ বন্ধ’ করেই করতে পারে। বিশেষ করে এই ভেবে যে এইবার আর তাঁদের কৃষি জমি লবণ জলে প্লাবিতও হবে না ও ঘরও ভাঙবে না। আইলার পরে স্থানীয় অঞ্চলে এই রূপান্তর ‘উন্নয়ন’ নামে পরিচিতি পেয়েছে।[৩] অচিরে এই উন্নয়ন উঁচু বাঁধ বেয়ে বাঁধের পাদদেশে স্থানীয় কৃষি জমিকেও (ব্যবস্থাকে) সংপৃক্ত করে ফেলে। ঐতিহাসিক ভাবে সুন্দরবনের ক্ষেত্রে ঠিক এইরূপ একটি পরিবর্তন ঘটেছিল ১৮৫০ সালের পর থেকে কোম্পানির দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কারের সময়ে ‘লবণাক্ততা সুরক্ষা’ অবকাঠামো থেকে ‘বন্যা সুরক্ষা’ অবকাঠামোতে পরিবর্তন এর মধ্য দিয়ে ।[৪] লেখক তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ‘ব্রিটিশ

বিভিন্ন কোম্পানির ড্রেজার মেশিনের মাধ্যমে প্রথমে নদী বাঁধের মেরামতের কাজ শুরু হলে ধীরে ধীরে তা ব্যাক্তি মালিকানায় সমস্ত প্রকারের মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত হতে থাকল। যার ফলে সুন্দরবনের মানুষের নির্দিষ্ট ও স্থায়ী এই জীবিকা হারাতে হোল ।

[৩] আসলে সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এই মৌজাগুলোতে প্রত্যেক বছর বর্ষার মরশুমে নদী বাঁধ ভাঙ্গার আতঙ্কে থাকত এই মানুষগুলো। যন্ত্রের কেরামতি দেখতে দেখতে হাসি মুখে নদীর দিকে তাকিয়ে কয়েকজনকে বলতে দেখলাম, এই বার জব্দ হবে নদী, তাদের বিশ্বাস এতো বড় যন্ত্রের সাথে নদীর জল আর পেরে উঠবে না। আর যাইহোক এই যন্ত্রের জন্য তাঁরা কাজ হারাল, নিজেদের রুটি রুজি এক প্রশ্নের সম্মুখীন হলেও, সাথে তায় স্থানীয়

[৪] (পৃ ২৯৬) https://books.ms/main/A6AF2F8E0C6F6E4484A3D9A857DE9625

উপনিবেশবাদের (১৭৬৫-১৯৪৭) অধীনে বাংলায় দ্রুত গতিতে জঙ্গল পরিষ্কারের ফলে দক্ষিণ সুন্দরবনের ক্রমবর্ধমান নিম্নভূমিতে নতুন আবাদ যোগ্য জমি এবং বসতি স্থাপন করা হয়েছিল, যেগুলি বঙ্গোপসাগরের লবণ জলের জোয়ারে প্লাবিত হয়েছিল, যার ফলে শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ত জোয়ারের জল থেকে কৃষি ধানক্ষেতকে রক্ষা করার জন্য নদীর সংলগ্ন জমির উপরে উঁচু বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল'। ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের ফলে বদ্বীপময় প্লাবনভূমির জটিল জলতাত্ত্বিক এবং পরিবেশগত প্রক্রিয়াগুলিকে বিবেচনা করা হয়নি। পরিবর্তে 'জলরোধী' বাঁধগুলিকে স্থানীয় মাটির বাঁধের চেয়ে 'ভালো' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ও কম মেরামতের প্রয়োজন এমন এই নতুন ধরণের বাঁধকে বাংলার আধুনিকীকরণের জন্য একটি বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি হিসেবে প্রচার করা হয়েছিল। এই অবকাঠামো প্রকৃতি এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে বদ্বীপকে অসংখ্য অংশে বিভক্ত করেছিল। এই ভাবে ধীরে ধীরে বদ্বীপময় অঞ্চলের নদীর তলদেশে পলি জমে নাব্যতা হারিয়ে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌ বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছে। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে নদি বাঁধ তৈরি করার উদ্দেশ্য ও ধরণকে নিয়ে নানান প্রশ্ন থাকলেও বর্তমান সুন্দরবনের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে পরিগণিত হয়। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মাটি, জল, আলো, বাতাস যেমন মৌলিক উপাদান, তেমনি সুন্দরবনের ক্ষেত্রে বাড়তি মৌলিক উপাদন হল নদীর বাঁধ। এই ভাবে নদী বাঁধের সাথে স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও 'তথাকথিত' (এই) উন্নয়ন দেখা যায়। ঠিক এখান থেকেই পাথরপ্রতিমা ব্লকে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটে এবং বাণিজ্যিক ও বাজার ভিত্তিক কৃষিতে রূপান্তরিত হয়।

সবথেকে বেশি পরিবর্তন দেখা যায় কৃষির উপকরণের ক্ষেত্রে। গরুর লাঙলের পরিবর্তে পাওয়ার টিলার ও ট্রাক্টরের মাধ্যমে চাষের জমি হাল করা শুরু হয় । কৃষকের নিজ জমির শস্য বীজ সংরক্ষনের পরিবর্তে বাজার থেকে ব্যাপক হারে উচ্চ ফলনশীল বীজের মাধ্যমে চাষ শুরু হল। এর ফলে সমান তালে বিভিন্ন কোম্পানির কীটনাশক ও সারের ব্যবহারও এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে যায়। ফলত শস্য উৎপাদনের ধরণ (Mode) পরিবর্তন হতে থাকল। কৃষক শ্রেণীর নতুন করে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিল। কৃষক এখন নিজ পরিবারের জন্য খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত্ত শস্য বাজারে বিক্রি করতে থাকল। কৃষি ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের জন্য ধীরে

ধীরে শ্রমিকের চাহিদা যেমন কমে গেলে তেমনি কৃষি কাজের 'সময়ও' কমে গেল।[৫] এবং কৃষক এখন থেকে চাষের ক্ষেত্রে তার নিজের অভিজ্ঞতার পরিবর্তে বীজ, কীটনাশক ও সার কোম্পানির এজেন্ট নামক 'বিশেষজ্ঞের' পরামর্শে চাষ করতে থাকল।

পাথরপ্রতিমা ব্লকের কৃষির এই পরিবর্তনকে আমরা যদি তাত্ত্বিক আকারে বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে সব থেকে গ্রহণ যোগ্য ভাবে বলা যায় কানাডিয়ান গবেষক নোয়ামি ক্লেইনের লেখা 'The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism' বই এর তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমেই আইলা পরবর্তী স্থানীয় অঞ্চলের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উত্থানকে সহজে অনুমান করা যায়। বইটির মূল আলোচ্য বিষয় হল, কিভাবে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে দুর্যোগ ও তার ফলে তৈরি হওয়া 'সংকটকের' সুযোগ নিয়ে নব্য উদারনৈতিক অর্থ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে । মুলত ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউ অরিলেন্সে' ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্যারিকেন ক্যাট্রিনা ঝড় ও বন্যার পরবর্তী সময়ে মার্কিন সরকারের পুনর্গঠনের 'ধরণকে' তিনি ব্যাখ্যা করেছেন (পুঁজিবাদী) মুক্তবাজার অর্থনীতির কাঠামোর মাধ্যমে। এই দুর্যোগকে (মার্কিন) অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডমান "অর্থনৈতিক সংস্কারের সুযোগ" হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, যা ক্লেইন উল্লেখ করেছেন তাঁর আলোচনায়, "Most New Orleans schools are in ruins," Friedman observed, "as are the homes of the children who have attended them. The children are now scattered all over the country. This is a tragedy. It is also an opportunity to radically reform the educational system" Friedman's radical idea was that instead of spending a portion of the billions of dollars in reconstruction money on rebuilding and improving New Orleans' existing public school system, the government should provide families with vouchers,

[৫] যদিও আমরা জানি যে কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকের চাহিদা কমে। এর ফলে খুব স্বাভাবিক যুক্তি হল যে শ্রমিকের শ্রম মূল্যও কমবে। কিন্তু পাথরপ্রতিমার ক্ষেত্রে তার বিপরীত হয়েছে। একই ধারে এখানে শ্রমিকের চাহিদা আইলার আগের তুলনায় কমলেও শ্রম মুল্য কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় দ্বিগুণ হারে। এর কারণ হল দুর্যোগের ফলে স্থানীয় অঞ্চলের মানুষ জীবীকার স্বার্থে বাইরে চলে যাওয়ায় যে পরিমাণ কৃষি শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল তার অভাব দেখা যায়। যার ফলে আইলার আগের তুলনায় শ্রমিকের চাহিদা কমলেও শ্রম মুল্য বৃদ্ধি পায় প্রায় দ্বিগুণ হারে। এই বিষয়টি অধ্যায়ের মূল অংশে বিশদে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনে এখানে সংখিপ্তাকারে আলোকপাত করলাম।

which they could spend at private institutions, many run at a profit, that would be subsidized by the state. It was crucial, Friedman wrote, that this fundamental change not be a stopgap but rather a permanent reform" (ক্লেইন, ২০০৭; পৃঃ ৪,৫)। অর্থাৎ ফ্রিডম্যান মনে করেন যে নিউ অরলিন্সের স্কুলগুলোকে দুর্যোগ পরবর্তী সরকারি তত্ত্বাবধানের পরিবর্তে স্থায়ী ভাবে বেসরকারি করা হোক। এবং ছাত্র ছাত্রির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি 'ভাউচার' দেওয়া হোক। যা দিয়ে তাঁরা তাদের সন্তানদের পড়াশুনোর খরচ মেটাবে । ফ্রিডম্যানের মতে এই পরিকল্পনাই একমাত্র 'স্থায়ী সংস্কার'। ফ্রিডম্যানের প্রস্তাবনুযায়ি জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রশাসন নিউ অরিলেন্সের স্কুল গুলিকে 'চার্টার্ড' স্কুলে পরিণত করার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে (এই) পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়েছে। এই ভাবে মাত্র ১৯ মাসের মধ্যে সরকারি স্কুলের সংখ্যা ১২৩ থেকে মাত্র ৪ টিতে নেমে আসে। বাকি (স্কুল) গুলোকে চার্টার্ড স্কুলে পরিণত করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে আরও প্রাসঙ্গিক যে, ক্লেইন 'The New York Times'এ উল্লিখিত ফ্রিডম্যানের নেতৃত্বাধীন think tank এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভাষ্য তুলে ধরেছেন। তাদের মতে "the nation's preeminent laboratory for the widespread use of charter schools," while the American Enterprise Institute, a Friedmanite think tank, enthused that "Katrina accomplished in a day . . . what Louisiana school reformers couldn't do after years of trying." Public school teachers, meanwhile, watching money allocated for the victims of the flood being diverted to erase a public system and replace it with a private one, were calling Friedman's plan "an educational land grab" (ক্লেইন, ২০০৭; পৃঃ ৫-৬)। ফ্রিডম্যানের মতে রাষ্ট্র পরিচালিত স্কুল ব্যবস্থা হল সমাজতান্ত্রিক ধারণা ও বিনা মুল্যে শিক্ষা প্রদানের অর্থই হল অন্যায্য ভাবে বাজারে হস্তক্ষেপ করা। অর্থাৎ নব্য পুঁজিবাদী ব্যবাস্থাকে পরিচালিত করার জন্য দরকার ছিল একটি ধাক্কা-র (shock)। আর সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগ হল ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে নিউ অরলান্সের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্যারিকেন ক্যাট্রিনার ধাক্কা। যা বছরের পর বছর লুইসিয়ানের স্কুল গুলোর ওপরে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক বিভিন্ন সংস্কারেরর পরেও বাস্তবায়িত করা যায়নি। হ্যারিকেন ক্যাটরিনার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেই সুযোগকে এনে দিল। অর্থাৎ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নিউ অরলান্সের সরকারি স্কুলের পরিবর্তে চার্টার্ড স্কুলগুলো ছিল দুর্যোগকে ব্যবহার করে কি ভাবে নব্য উদারনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা

যায় (এটি ছিল) তারই একটি 'পরীক্ষাগার'। অর্থাৎ এই পরীক্ষাগারের অভিজ্ঞতা থেকে নতুন নতুন অঞ্চলে নতুন নতুন ভাবে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে নব্য উদারনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিচালিত করাই হল পুঁজিবাদের মূল উদ্দেশ্য। যাকে ক্লেইন বলেন, "I call these orchestrated raids on the public sphere in the wake of catastrophic events, combined with the treatment of disasters as exciting market opportunities, "disaster capitalism." (তদেব; পৃষ্ঠা; 6) ক্লেইনের মতে ফ্রিডম্যানের বিভিন্ন অনুসারিদের মধ্যে রয়েছেন কয়েকজন মার্কিন রাষ্ট্রপতি, রাশিয়ান অভিজাত, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, তৃতীয় বিশ্বের কিছু একনায়ক নেতা, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সচিব, পোলিশ অর্থমন্ত্রী, মার্কিন ফেডারেল ব্যাংকের কিছু আধিকারিক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের পরিচালকরা; তাঁরা সযত্নে ফ্রিডম্যান পরিচালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিচালিত করেছেন। এইভাবে দুর্যোগের মতো সংকটকের ফলে নাগরিক জীবনে যখন হঠাত করে এক 'কম্পন বা shock' তৈরি হয় তখন নিখুঁত কৌশলের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কিছু অংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এবং সঙ্কট কালীন কিছু যুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সমাজ ব্যবস্থায় 'স্থায়ী সংস্কার' হিসেবে তা প্রথিত হয়ে যায়।

এর নিদর্শন প্রথম দেখা যায়, গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে চিলিতে। যখন একনায়ক জেনারেল আগাস্টো পিনোশেটের উপদেষ্টা হিসেবে ফ্রিডম্যান নিযুক্ত হয়ে পরামর্শ দেন কিভাবে একটি ধাক্কা বা সংকটকে ব্যবহার করতে হয়। এর পরেই পিনোশেটো সহিংস অভ্যুত্থানের ফলে একদিকে জনগণ যেমন হতবাক, বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন তেমনি দেশের মুদ্রাস্ফীতিও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এই সুযোগে ফ্রিডম্যানের পরামর্শে পিনোশেটো দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য কর আদায়, মুক্ত বাণিজ্য, সামাজিক ব্যায় হ্রাস, বেসরকারী পরিষেবা প্রদান শুরু করেন । এই ভাবে একে একে ১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড যুদ্ধ, ১৯৮৯ সালে চীনের তিয়ানানমেন স্কোয়ারের গণহত্যা, ১৯৯৩ সালে রাশিয়ায় বরিস ইয়েলৎসিনের সংসদ ভবনে আগুন লাগানোর পরিকল্পনা, ১৯৯৯ সালে বেলগ্রেডে ন্যাটোর আক্রমণ, ২০০১ সালে নিজ (মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্র) দেশে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার পর, ২০০৩ সালে ইরাকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের তাণ্ডব, ২০০৪ সালে শ্রীলংকায় সুনামির আঘাতের পরে প্রকল্প, ক্লেইনের মতে এই প্রত্যেকটি ঘটনার পরে অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলন ঘটেছিল। উপরিউল্লিখিত এই তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে ২০০৯ সালের ঘটে যাওয়া আইলার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে একই ভাবে স্থানীয় অর্থ রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে দেখি।

অধ্যায়ের সুরতেই উল্লেখ করেছি আইলা পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনে উন্নয়নের যে ধরণ তা নব্য পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোরেই এক রূপ হিসেবে পরিগণিত করা যায়। আইলা দুর্যোগের ফলে স্থানীয় মানুষের মনে হঠাৎ যে অভিঘাতের (shock) সৃষ্টি হয় তারই সুযোগে কিছু মুনাফা লোভী বিভিন্ন গোষ্ঠী সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প পরিচালিত করে। আর এই প্রকল্প গুলোর মাধ্যমে স্থানীয় অঞ্চলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কর্মক্রিয়া পরিচালিত হতে থাকে । আইলার ক্ষেত্রে যেমন নদী বাঁধের উন্নয়নে প্রকল্পের কথা উল্লেখ করতে পারি। এবং যা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় কৃষি ক্ষেত্রেও পুঁজিবাদী উত্তরণের সূচনা করে। তাই আমরা প্রথমে নদীবাঁধের মেরামতের প্রকৃতি বিশ্লেষণের পরে কৃষি ব্যবস্থার সংস্কারের বিষয়ে আলোকপাত করব।

নদী বাঁধ মেরামত ও প্রযুক্তির প্রবেশঃ-

আইলা পরবর্তী সুন্দরবনের নদীবাঁধ মেরামতের জন্য, কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ৎণালয় কর্তৃক ৭ সদস্যের একটি 'টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়। এই আইলা টাস্কফোর্সের তত্ত্বাবধানে রাজ্যের সেচদপ্তর এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে। সেচদপ্তর সুন্দরবনের মোট ৩৫০০ কিলোমিটার (মাটির) নদীবাঁধের মধ্যে ২৫০০ কিলোমিটার বাঁধ মেরামতের প্রয়োজন রয়েছে বলে টাস্কফোর্সের কাছে রিপোর্ট প্রদান করে। দপ্তরের সুপারিশ ক্রমে ২৫০০ কিলোমিটার নদী বাঁধ মেরামতের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলে ৭৫ ও ২৫ শতাংশ হারে মোট ৫,০৩২ কোটি টাকা ব্যায়ভার বহন করবে বলে ধার্য করা হয়। রাজ্যের সেচ দপ্তরের সুপারিশ মতে একদিকে সুন্দরবনের প্রায় সিকি ভাগ নদীবাঁধ ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রয়েছে তাই

আইলা প্রকল্পে নদী বাঁধ ও তার পাশেই মাটির দুর্বল বাঁধ পাথরপ্রতিমা ব্লক কৃষ্ণদাসপুর আইলা প্রকল্প। ক্ষেত্র সমীক্ষ ২০২১ সাল ২০ জুন

দ্রুত বাঁধ মেরামতির কাজ না করলে সুন্দরবনকে আর ধরে রাখা যাবে না। এই হিসেবে বিষয়টি যেমন স্পর্শকাতর তেমনি এতো বড় নদী বাঁধের কাজ'কায়িক শ্রমের' দ্বারা আর সম্ভব নয় সেই স্বীকৃতি। তাই বৃহৎ কোম্পানির টেন্ডারের মাধ্যমে ভারি প্রযুক্তির ব্যবহার করে দ্রুত বাঁধ মেরামতের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে এই ভাবনার জোরাল প্রকাশ। আপাত দৃষ্টিতে কথা গুলো সম্পূর্ণ যুক্তি ভিত্তিক ও সুন্দরবনের প্রতি রাষ্ট্রের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির বার্তা বহন করে বলে মনে হলেও, তা ঠিক কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে ও স্থানীয় মানুষ এই উন্নয়নের দ্বারা কতটা সংপৃক্ত হয়েছে তা আমরা বর্তমান পঙ্কতিতে আলোকপাত করবার চেষ্টা করব। সেচ দপ্তরের, প্রকল্পের প্রতিবেদন ছিল এইরূপঃ পূর্বের মাটির বাঁধের থেকে প্রায় ৫ মিটার উচ্চতা, ও ৩০ থেকে ৪০ মিটার প্রশস্ত বাঁধের জন্য, এবং কংক্রিট ও পলিপ্রপিলিন সিটের (স্থানীয় মানুষ যাকে জিও চট নামে জানে) মাধ্যমে ভারি মেশিন যেমন ট্রাক্টর (মাটি বহন করার জন্য), ড্রেজার[৬] (এক সাথে অনেক বেশি মাটি কাটার জন্য), স্ক্র্যাপার (বাঁধের ওপরে মাটি ফেলার পরে সেগুলোকে চেপে বসানোর জন্য ব্যবহার করা হয়) ব্যবহার করে বাঁধের মেরামত সম্পূর্ণ করা হবে। রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন বড় বড় ঠিকাদারি কোম্পানির মাধ্যমে প্রতি কিলোমিটার নদী বাঁধ মেরামতের জন্য ৪ থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ হবে বলে ধার্য করা হয়।[৭] পাথরপ্রতিমা ব্লকে এইরূপ

পাথরপ্রতিমা ব্লকে উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ মৌজায় আইলা প্রকেল্পর কাজে)

[৬] বস্তুত পক্ষে স্থানীয় মানুষ এক্সক্যাভেটর মেশিন কে ড্রেজার ও J.C.B নামে জানে, তবে J.C.B এর তুলনায় ড্রেজার শব্দটিকে বেশি ব্যবহার করে। তাই আমরা সন্দর্ভে এক্সক্যাভেটর বা J.C.B মেশিনকে ড্রেজার হিসেবেই উল্লেখ করব।

[৭] প্রকল্পের এই তথ্য সংগ্রহ করেছি ২০১৮ সালে রাজ্যের মুখ্য সেচ দপ্তর সল্টলেক সেক্টর-১, ডি.এফ ব্লকে অবস্থিত জলসম্পদ ভবন, রাজ্যের সেচ ও জলসম্পদ দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকারের (দক্ষিণ) এর সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে।

মোট ৭টি কেন্দ্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে 'আইলা প্রকল্পের' মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যাওয়া নদী বাঁধ মেরামত করার প্রস্তাব ।[৮] এইরূপ ৩টি আইলা প্রকল্পের ক্ষেত্রে ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছি ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত-তবে একটানা নয়, যেগুলি পাথরপ্রাতিমা ব্লকের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত। তার মধ্যে একটি হল পাথরপ্রতিমা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গোপাল নগর মৌজায় যেটি বঙ্গোপসাগরের মোহনার অনেকটা ভেতরে অবস্থান করছে। এবং বাকি দুটি হল একেবারেই বঙ্গোপসাগরের মোহনায় বিছিন্ন দ্বীপের জি-পল্ট গ্রাম পঞ্চায়াতের অধীন কৃষ্ণাদাসপুর মৌজা ও উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ মৌজায় অবস্থিত।

এখানে উল্লেখ করতে হয় পাথরপ্রতিমা ব্লকের মোট ৭টি আইলা প্রকল্পের মধ্যে সব থেকে আকৃতিতে বড় ও বেশি ব্যায়ের প্রকল্পটি হল কৃষ্ণদাসপুর মৌজার প্রকল্প। তাই আমি কৃষ্ণদাসপুর মৌজার আইলা প্রকল্পের হালহকীকত তুলে ধরে বোঝার চেষ্টা করব দুর্যোগ পরবর্তী উন্নয়নের 'চালচিত্র'।

এই প্রকল্পটি অনুযায়ী ১০৬৫ মিটার দৈর্ঘের বাঁধের জন্য মোট ৪৮২ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। যা category 2b ও passage No 29/k নামে পরিচিত এবং 'পাইওনিওর কন্সট্রাকসন' দ্বারা প্রকল্পটি নির্মিত হয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রয়োজনে প্রকল্পের ক্ষেত্রে বহুবার উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি ঠিকাদার, ঠিকাদারের অধীন বিভিন্ন কর্মী, ভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত কিছু কায়িক শ্রমিক, ভারি মেশিনের চালক এবং সর্বোপরি আইলা প্রকল্পের কাছাকাছি বসবাসকারী স্থানীয় মানুষের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে। এক একটি প্রকল্প শেষ করতে সময় লেগেছিল প্রায় ২ থেকে ৩ বছর ।[৯] একটি প্রকল্পে মোটের উপর ৩০টি ট্রাক্টর, ৭টি

---

[৮] এই নদী বাঁধ মেরামতের জন্য সরকারি ভাবে প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছিল 'আইলা প্রকল্প'।

[৯] এই বিষয়ে উল্লেখ করতে হয়, প্রকল্পের আধিকারিকদের মূল যুক্তি ছিল (প্রকল্পের) কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য স্থানীয় মানবিক শ্রমের পরিবর্তে অবশ্যই ভারি মেশিনের প্রয়োজন। নাহলে দীর্ঘ সময়ে ধরে কাজ করলে স্থানীয় মানুষের আরও ক্ষতি হয়ে যাবে, এই যুক্তি স্থানীয় সাধারণ মানুষ মেনেও নিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল ৩ থেকে ৪ বছর কি কম সময়? এর ক্ষেত্রে ঠিকাদার বলেন, এর উত্তর দিতে পারবে সরকার। কারণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের জটিলতার কারণেই দেরি হয়েছে । প্রকল্পের চুক্তি অনুযায়ী সরকার জমি অধিগ্রহণ করবে এবং প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করবে ঠিকাদার। এই বিষয়ে আইলা প্রকল্প তত্ত্বাবধান করেন এইরূপ কয়েকজন সরকারি আমলার বক্তব্য হল স্থানীয় জমির জটিলতার কারণে জমি অধিগ্রহণে দেরি হয়েছে এবং হচ্ছে। অর্থাৎ যা বোঝা

ড্রেজার, ৩টি স্ক্র্যাপার মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে। এবং আরও কিছু আনুসঙ্গিক প্রয়োজনে স্থানীয় যন্ত্র চালিত মেশিন ভ্যান ও দু-চাকা বিশিষ্ট মাটি বহনকারী হাতে টানা গাড়ীর (যাকে স্থানীয় ভাষায় ঠেলা গাড়ি বলে) ব্যবহারও দেখেছি। সর্বোপরি যা বলতে হয় 'আধুনিক উন্নয়ন ব্যবস্থায়' যে রকমারি ভারি মেশিনের ব্যবহারের পরেও কিছু কায়িক শ্রমিকের প্রয়োজন হয় তা উক্ত আইলা প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভালোভাবেই আন্দাজ করা যায়। উক্ত যন্ত্রের 'যাদুর' পরেও বাইরে থেকে আগত 'মা মনসা' (এই নামের গেঞ্জি তাদের গায়ে পরিহিত ছিল) নামে একটি কায়িক শ্রমিকের ১৫ থেকে ২০ জনের গ্রুপ ছিল যারা দৈনিক রাতদিন ধরে মাটি খননের কাজ করেছে। এই ক্ষেত্রে ঠিকাদারের যুক্তি হল "সব ক্ষেত্রে তো আর এতো বড় বড় মেশিন চালানো যায় না, মেশিনকে সহযোগিতার জন্য প্রত্যেকটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে কিছু কায়িক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া এখানের (সুন্দরবনের ক্ষেত্রে) মাটির তলদেশ কোথাও কোথাও নরম থাকে (পলি মাটির জন্য) যেখানে গাড়ির চাকা চলে না।[১০] সেই ক্ষেত্রে তো কায়িক শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে"।

এই ক্ষেত্রে কায়িক শ্রমিকের যে গ্রুপটি কাজ করছে তারাও স্থানীয় নয়। অন্য অঞ্চল থেকে তাদের কে ঠিকাদার নিয়ে এসেছে। স্থানীয় মানুষের দাবি ছিল অন্তত এই কাজটা তাদের দেওয়া হোক। কিন্তু ঠিকাদারের বক্তব্য হল এই কাজে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু স্থানীয় মানুষের বক্তব্য হল এই কাজ তাঁরা অনায়াসেই করতে পারতেন। দক্ষ শ্রমিকের নামে আসলে ঠিকাদারের পরিচিত অন্য কোন ঠিকাদারের কাছ থেকে এই শ্রমিকদের নিয়ে এসেছে। এর ফলে ঠিকাদারের পরিচিত ওই ব্যক্তিও যাতে এই প্রকল্প থেকে লাভবান হয় সেই উদ্দেশ্যেই স্থানীয় শ্রমিকদের এই কাজে নেওয়া হয়নি। ঠিকাদারের বক্তব্যনুযায়ী এই ৩টি প্রকল্পের একটিতে খরচ হচ্ছে বা হবে যথাক্রমে ১৫ কোটি (কৃষ্ণাদাসপুর মৌজা), ১৩ কোটি (উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ মৌজা), ও ৮ কোটি (গোপাল নগর মৌজা) টাকা।

গেল তা হল প্রকল্পের বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ ঠিকাদার বা সরকারি আমলা নয় বরং স্থানীয় জমির জটিলতাই দায়ী।

[১০] সুন্দরবন অঞ্চলের পলি মাটি এবং প্রকল্পটি নদীর পার্শ্ববর্তী হওয়ায় মাটির তল দেশ কিছুটা কর্দমাক্তের ফলে ভারি মেশিনের লোহার চেনের চাকা (কোন কোন ড্রেজার ও স্ক্র্যাপার মেশিনের চাকার ক্ষেত্রে) স্বাভাবিক নরম মাটিতে ভালো কাজ করতে পারে না। এই ক্ষেত্রগুলোতে মানুষের কায়িক শ্রমের মাধ্যমে কাজ পরিচালিত করতে হয়।

সারণি ১

আইলা প্রকল্পে দৈনিক মেশিন ও কায়িক শ্রমিকের মোট খরচ

সরকারের সাথে ঠিকাদারের চুক্তিনুযায়ী

মেশিনের নাম	মেশিনের ভাড়া (টাকা)	জ্বালানি খরচ (টাকা)	মেশিন পরিচালকের মজুরী (টাকা)	অন্যান্য খরচ (টাকা)	মোট মেশিনের সংখ্যা	মোট খরচ (টাকা)
ট্রাক্টর	৪০০০	১২০০	১৫০০	৩০০	৩০	২১০,০০০
ড্রেজার	১২০০০	৮৪০০	২২০০	৫০০	৭	১৫৮,২০০
স্ক্র্যাপার	১৫০০০	১৫৬০০	৩০০০	৭০০	৩	১০২,৯০০
ইঞ্জিন ভ্যান	৩০০০	৯০০	১২০০	২০০	১২	৬৩,৬০০
হাতে টানা ভ্যান	৫০০	---	১০০০	৫০	১৫	২৩২৫০
প্রকল্পে ব্যবহৃত দৈনিক মেশিনের ভাড়া বাবদ খরচ						৫৫৭,৯৫০
দৈনিক ১৫ জন কায়িক শ্রমিক বাবদ খরচ						১২০০০
দৈনিক মেশিনের ভাড়া ও কায়িক শ্রম বাবদ খরচ						৫৬৯,৯৫০

- সারণির এই হিসেবটি ক্ষেত্র সমীক্ষার সময়ে ঠিকাদার, মেশিন পরিচালকের সাথে মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে করেছি, কারণ ঠিকাদার বা সরকারি কোন অফিস থেকে চুক্তির কোন তথ্য আমাকে প্রদান করা হয় নি। তাই হিসেবটিকে আমরা আনুমানিক ধরব, যাতে প্রকল্পের দৈনিক খরচ সহজে অনুমান করতে পারি।

অর্থাৎ সমস্ত খরচ বাবদ প্রকল্পের একদিনের গড় খরচ হল ৫৬৯,৯৫০ টাকা (একটি প্রকল্পের হিসেবে)। আমি যখন প্রথম দিন প্রকল্পের কেন্দ্রে যাই ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য তখন প্রায় তিন মাস হয়ে গেছে কাজ শুরুর দিন থেকে। এই তিন মাসে ১৭ দিন বিভিন্ন কারণে কাজ বন্ধ ছিল। ঠিকাদারের বক্তব্যনুযায়ী এই ১৭ দিনে কাজ না হওয়ার জন্য দৈনিক ৫৬৯,৯৫০ টাকা করে সরকারের ক্ষতি হয়েছে। অর্থাৎ তিন মাসে সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যায় হয়েছে ৯,৬৮৯,১৫০

টাকা। তাহলে এই হিসেবে ২ থেকে ৩ বছরে একটি প্রকল্পে গড়ে ঠিক কতো পরিমাণ অর্থ অপ্রয়োজনীয় ভাবে ব্যায় হয়েছে তা আমরা সহজে অনুমান করতে পারি। সরকারি প্রকল্পে এই ধরণের 'অর্থের অপচয়ের' আসল উদ্দেশ্য জানতে হলে সরকারের সাথে ঠিকাদারের চুক্তির বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই সরকার বা ঠিকাদার কারো কাছ থেকেই প্রকল্পের চুক্তি সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষয়ে আমি যখন জলসম্পদ ভবনে আইলা প্রকল্পের তথ্যের জন্য সেচ ও জলসম্পদ বিভাগের আধিকারিক দের সাথে দেখা করি, নানান কারণ দেখিয়ে চুক্তি পত্র আমাদের দেওয়া হয়নি, কেবল প্রকল্পের আনুসাঙ্গিক কয়েকটি তথ্য ছাড়া। এই কারণে স্থানীয় কিছু নতুন উদ্যোগপতির[১১] সাথে আলোচনা করেছি যারা আইলার পরে স্থানীয় অঞ্চলে ড্রেজার মেশিনের মাধ্যমে ব্যাক্তি মালিকানাধীন নানান ক্ষেত্রে মাটি খননের কাজ করে অর্থ উপার্জন করেছে।

উন্নয়নের চুক্তি ও চুক্তির অস্বচ্ছতাঃ-

আইলা প্রকল্পে নদী বাঁধ মেরামতের জন্য প্রথম এই ধরণের ভারি মেশিনের ব্যবহার শুরু হলে দ্রুত তা স্থানীয় অঞ্চলে ব্যাক্তি মালিকানাধীন পুকুর, খাল-বিলের সংস্কারের জন্যও ব্যবহার করা শুরু হয়। ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে, স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে বাইরের কিছু ড্রেজার মালিকের কাছ থেকে এই ধরণের মেশিন গুলো ভাড়া করে নিয়ে এসে প্রতি ঘণ্টায় ১৮০০ থেকে ২৩০০ টাকার বিনিময়ে ব্যাক্তি মালিকানাধীন পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদির মাটি খননের কাজে নিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে শুরু করে। স্থানীয় অঞ্চলের এইরূপ তিনজন 'নতুন' উদ্যোগপতির সাথে তাদের মেশিন মালিকের চুক্তির 'ধরণ' নিয়ে আলোচনা করে বোঝার

[১১] এখানে আমি যাঁদের উদ্যোগপতি বলছি, তাঁরা আসলে স্থানীয় অঞ্চলের সাধারণ মানুষ, যারা স্থানীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত। এবং অবসর সময়ে কৃষি কাজ, মাটি খনন, নদীতে মাছ ধরা ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করত। স্থানীয় অঞ্চলের এই মানুষগুলো রাজনৈতিক পরিচিতি থাকায়, প্রকল্পের কাজের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার দেখভালও করত। এই সুত্রে ঠিকাদারের মাধ্যমে তারাও ব্যাক্তিগত উদ্যোগে কিছু দিনের মধ্যে বাইরে থেকে ড্রেজার মেশিন ভাড়ায় নিয়ে এসে স্থানীয় অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত মাটি খননের কাজ করে ভালো পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে থাকে। তাই এদের আমরা স্থানীয় নতুন উদ্যোগপতি হিসেবে উল্লেখ করছি।

চেষ্টা করেছি কোন কোন 'শর্তে' চুক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রথমত উল্লেখ করা ভালো স্থানীয় এই তিন জন উদ্যোগ পতি যারা শাসক দলের কেউ বুথ সভাপতি, কিংবা কেউ আবার অঞ্চল সভাপতির 'কাছের লোক', যারা এই উক্ত দুটি আইলা প্রকল্পের সাথে বিভিন্ন ভাবে যুক্ত ছিল। যেমন, ভূমি অধিগ্রহণের সময় কোন সমস্যা তৈরি হলে, কিংবা প্রকল্পের কাজকে তরান্বিত করার জন্য, বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার ক্ষেত্রে ঠিকাদার এবং সরকারি আমলারা স্থানীয় এই ছোটখাটো নেতাদের সহযোগিতায় কাজ ত্বরান্বিত করেছে। সেই সুবাদে এই তিন জন, প্রকল্পের মাধ্যমে কিভাবে তাঁরাও লাভবান হতে পারে, সেই সুযোগ সুবিধার অপেক্ষায় ছিল। যেমন ট্রাক্টর ও ড্রেজার মেশিন ব্যবহারের ফলে কিভাবে লাভবান হওয়া যায় ইত্যাদি।

সারণি ২

ঠিকাদারের সাথে ব্যক্তিগত মালিকের চুক্তির ক্ষেত্রে খরচ ও লাভ (টাকায়)

মেশিনের নাম	দৈনিক ভাড়া	জ্বালানি খরচ	মেশিন পরিচালকের মজুরী	আনুসঙ্গিক খরচ	মোট খরচ	মোট আয়	মোট লাভ
ড্রেজার	৪,০০০	৫,৪০০	১,৫০০	৬০০	১১,৫০০	২০,০০০	৮,৫০০

- এখানে চুক্তিনুযায়ী মেশিন ভাড়া ২৪ ঘণ্টাকে একদিন হিসেবে ধরে ও মেশিন পরিচালকের দৈনিক (৮ ঘণ্টা) মজুরী হিসেবে দেখানো হয়েছে। এবং জ্বালানির খরচ ঘণ্টা হিসেবে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন গড় ১০ ঘণ্টা হিসেবে ও ঘণ্টায় ৬ লিটার ডিজেল তেলের খরচ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এবং প্রতি লিটার ডিজেলের মুল্য ৯০ টাকা করে ধরা হয়েছে। যেহেতু ড্রেজার মেশিনের নানান প্রকার তেলের ব্যবহার রয়েছে তাই এর আনুসঙ্গিক খরচও একটু বেশি ধরা হয়েছে।
- এবং দৈনিক যে আয় দেখানো হল তা দিনে ১০ ঘণ্টায় গড়ে ২০০০ টাকা করে ধরা হয়েছে।

এর ফলে তারাও ঠিকাদারদের মাধ্যমে বাইরে থেকে মেশিন মালিকের সাথে চুক্তি করে মেশিনগুলো স্থানীয় অঞ্চলে নিয়ে আসে। মেশিন মালিকের সাথে তাদের চুক্তির মূল বিষয় ছিল 'মেশিন প্রতি দৈনিক ৪০০০ টাকা করে ভাড়া মালিক কে দিতে হবে। এর মধ্যে জ্বালানি ও

আনুসঙ্গিক খরচ এবং মেশিনের যদি কোন ক্ষতি হয় সেই ক্ষতিপূরণ এই উদ্যোগপতিরা দেবে। এবং কোনদিন কোন কারণে কাজ বন্ধ থাকলে সেই দিনের টাকা মালিক পক্ষ দাবি করবে না'। এর ফলে দৈনিক মেশিন ভাড়া বাবদ ৪০০০ টাকা, প্রতি ঘণ্টায় তেলের খরচ ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা, ড্রাইভার এর খরচ দৈনিক ১৫০০ টাকা। গড়ে দিনে ১০ ঘণ্টা কাজ হলে, মোট খরচ হয় ১১৫০০ টাকা। এর বিনিময়ে উদ্যোগ পতিরা পার্টিদের[১২] কাছ থেকে ঘণ্টায় ১৮০০ থেকে ২৩০০ টাকা নিত। এই হিসেবে উদ্যোগ পতির দৈনিক খরচ বাদ দিয়ে আয় হতো ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা। তবে দৈনিক কাজ না পাওয়ার জন্য মাসে গড়ে ১৫ থেকে ২০দিনের বেশি কাজ হতো না। সুতরাং যুক্তির খাতিরে যদি ধরেওনি যে, মাসে গড়ে ১৮ দিনের কাজ হয়, তাহলে এই উদ্যোগ পতিদের লাভ থাকে (দৈনিক ৮,৫০০ টাকা ধরে) মাসে প্রায় ১৫৩,০০০ টাকা। এই ছিল সহজ হিসেব। এখানে পরিষ্কার যে ঠিকাদারের সাথে সরকারি ও ব্যাক্তিগত কাজের বরাতের চুক্তির ক্ষেত্রে বিস্তর 'রকমফের' রয়েছে। আমরা উপরিউক্ত দুটি সারণির মাধ্যমে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝার চেষ্টা করেছি। এক, কিভাবে সরকারি প্রকল্প ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে একই প্রযুক্তির ব্যবহারে হলেও ব্যায়ের বিস্তর ফারাক। দুই, অর্থ ব্যায়ের এই পার্থক্যের জন্য দৈনিক সরকারি প্রকল্পে ঠিকাদারের মোট লাভের পরিমানের বহরও দেখলাম। এই ক্ষেত্রে যদিও সারণি-১ এর ক্ষেত্রে মোট লাভের পরিমাণ দেখানো হয়নি তথাপি সারণি ২ এর ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ দেখলে সারণি ১ এর লাভের পরিমাণ সহজে অনুমেয়। এইবার আমরা বোঝার চেষ্টা করব সরকারি প্রকল্পে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি ও মেশিন মালিকের সাথে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে চুক্তির রকমফেরের কারণ।

এই তিনজন উদ্যোগ পতির মধ্যে একজন আমার পূর্ব পরিচিত হওয়ায় প্রকল্পের লাভ ক্ষতি ও চুক্তির নানান কৌশল নিয়ে আরও গভীরে আলোচনা করার সুযোগ পেলাম। আলোচনার বিষয়বস্তুর সম্পর্কে গোপনীয়তা রাখব এই শর্তে তিনি যা বললেন তা হল প্রথমত, 'সরকারি কাজের বরাতের ক্ষেত্রে কোন ঠিকাদারি কোম্পানি কত অর্থ, ঘুর পথে, সরকারি আমলা ও উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত ছোট, মাঝারি ও বড় নেতার মন সন্তুষ্ট করতে পারবে, বরাত পাওয়ার জন্য

[১২] উদ্যোগ পতিরা স্থানীয় অঞ্চলে ড্রেজার মেশিনের দ্বারা যাঁদের মাটি কাটার ঠিকা (contract) নিত, তাদেরকে 'পার্টি' বলা হত। এই পার্টিদের কাছ থেকে কাজের বিনিময়য়ে ঘণ্টায় গড়ে ২০০০ টাকা নিত।

এটাই হল অলিখত ভাবে প্রথম শর্ত। এই শর্ত পূরণ করা ও ঠিকাদারের (লাগামহীন) মুনাফা লোভের কারণে প্রকল্পের মোট অর্থের ব্যায় কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেখানো হয়।[১৩] এই কয়েকগুণ বরাদ্দকৃত বেশি অর্থকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে খাতা কলমে স্বচ্ছ হিসেবে দেখানো হয়। যেমন কাজ না হওয়ার দিনগুলোতে মেশিনের ভাড়া, মেশিন পরিচালকের মজুরী এবং জ্বালানি বাবদ কোনও খরচ। ঠিকাদারেরা ছুটির দিনগুলোকেও খাতায় কলমে কাজের দিন হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। কিন্তু এই দিনগুলোতে (কায়িক) শ্রমিকদের কাজ না হওয়ার জন্য তাঁরা ওইদিনের মজুরি মুল্য পায়না, পরন্তু ওইদিন তাঁদের বসে বসে খাবারের টাকা গুণতে হয়। কিন্তু আমরা সারণি ১ এর ক্ষেত্রে দেখলাম, প্রকল্পে একদিন কাজ না হলে ঠিকাদারের বক্তব্য অনুযায়ী 'সরকারের ক্ষতি' ৫৬৯,৯৫০ টাকা। কেন ক্ষতি? যেক্ষেত্রে সাধরণ যুক্তি হল কাজ না হলে মেশিন বন্ধ থাকলে সেই দিনের ভাড়া বাবদ মেশিন মালিক কোন অর্থ পাবে না! অথচ ঠিকাদার এখানে কাজ বন্ধের দিনও মেশিনের খরচ ধরে নেয়। এই ভাবে তিন মাসের মধ্যে ১৭ দিন কাজ বন্ধ থাকার ফলে ৯,৬৮৯,১৫০ টাকা ঘুর পথে উপর মহল ও ঠিকাদারের পকেটে চলে যায়বলে মনে করেন কেউ কেউ। সুতরাং যতদিন বেশি মেশিন বন্ধ থাকবে তত বেশি প্রকল্পের মোট অর্থ বরাদ্দও বাড়বে। এই ভাবে ঠিকাদারেরা নানান আছিলায় ধাপে ধাপে প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ আরও বহুগুণ বাড়িয়ে নেয়। চুক্তির প্যাঁচ এখানে শেষ হয় না । পরিচিত উদ্যোগপতি আরও জানান কিভাবে মেশিন ভাড়ার নামে ঠিকাদার প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ করে তার কিছু নমুনা সম্বন্ধে। তিনি বলেন, ঠিকাদারি চুক্তির সময়ে প্রকল্পে মেশিনের 'প্রয়োজন কম' দেখানো হয়, কারণ প্রকল্প শুরু হলে আরও বেশি মেশিনের প্রয়োজন বলে ঠিকাদারের নিজের মেশিনকেই ভাড়া করা মেশিন বলে চালানো হয়। এই ভাবে ঠিকাদার দ্বিগুণ আয় করে নেয়'। এই হল স্থানীয় উদ্যোগ পতির প্রকল্পের চুক্তি সম্পর্কে বক্তব্য। এই বক্তব্যের সত্যতা যে রয়েছে তা আমরা কিছুটা দেখলাম এবং বিশ্লেষণ যত এগোবে তা আরও প্রমাণিত হবে বলে মনে করি। আমরা সারণি ১ থেকে মেশিনের দৈনিক ভাড়া ও জ্বালানি খরচ বাবদ দেখলাম তা সারণি ২ এর সাথে তুলনা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় (কেবল মাত্র ড্রেজারের ক্ষেত্রে) মেশিনের ভাড়া সারণি ২ এর থেকে অনেকটাই বেশি। অর্থাৎ প্রকল্পের প্রতিটা পরতে পরতে দুর্নীতির ছাপ পরিষ্কার ধরা পড়ে। এখানে প্রশ্ন হল উন্নয়ন ও

[১৩] কারো কারো মতে প্রকল্পের কয়েকগুণ অর্থ বেশি বরাদ্দের পেছনে আসল ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে প্রকল্পের সাথে যুক্ত উচ্চ পদাধিকারী আমলা ও রাজনৈতিক নেতারা।

দুর্নীতি কি একে অপরের পরিপূরক? নাকি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাই (উন্নয়নের) এর যুক্তিকে এমন ভাবে সাজায় যাতে মুনাফা লোভী কিছু পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর হাতেই অর্থ কুক্ষিগত হয়? যেখানে স্থানীয় মানুষের জীবনে উন্নয়নের প্রভাব কতটা পড়ল ও উন্নয়ন কল্পে 'স্থানীয় জ্ঞানের' মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে কতোটা প্রাধান্য দেওয়া হোল ইত্যাদি প্রসঙ্গ সচেতন ভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায়। এই বিশ্লেষণ আমরা পরের পংতিগুলোতে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরবার চেষ্টা করব। এই ভাবে কৃষ্ণদাসপুর মৌজার আইলা প্রকল্পের মোট খরচ ১৫ কোটি থেকে ধাপে ধাপে ২২ কোটিতে পৌছায়। আরও নানান জটিল হিসেব রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে উন্নয়নের নামে দুর্নীতির অনুশীলন চলে। আমরা শুধু অনুমান করার জন্য প্রকল্পের উপরিউক্ত অর্থনৈতিক কারুকার্যের সামান্য হালহকীকত দেখার চেষ্টা করেছি। তাতে যা বুঝলাম তা হল, তিন মাসে শুধু কাজের দিন হিসেবে, সরকারের অপ্রয়োজনীয় খরচ হয়েছে (পরিকল্পিত ভাবে খরচ করানো হয়েছে বললেও মিথ্যা বলা হয়না) ৯,৬৮৯,১৫০ টাকা।[১৪]

উপরে উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা এটা প্রশ্ন করতেই পারি যে উন্নয়ন বলতে আমরা কি বুঝি? ২০১২ সালে সায়ন্তান বেরা, 'Dowan To Earth' জার্নালে 'Fancy wall for Sundarbans' নামক প্রবন্ধে আইলা পরবর্তী উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গল গঞ্জের এইরূপ নদী বাঁধ মেরামতের প্রকল্পের একটি প্রতিবেদনে বলেন, "Government starts building massive embankments on the fragile delta using untested technology. Experts say the project benefits contractors, not islanders" এই প্রতিবেদন থেকে নেওয়া তুষার কাঞ্জিলালের বক্তব্য হল, "No technology can stop an advancing river or tidal wave. What we can do best is to move back and buy time from nature" (a member of the Aila Task Force). He heads non-profit Tagore Society for Rural Development. Kanjilal suggests that the expensive and massive embankments planned in patches are no guarentee against nature's fury."

[১৪] এই প্রকল্প চলা কালিন তিন মাসের মধ্যে ১৭ দিন কাজ বন্ধ থাকার জন্য সরকারের যে ৯,৬৮৯,১৫০ টাকা অপচয় করা হল তা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ভাবেই করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে জানার চেষ্টা করেছি ঠিক কোন কোন কারণে এই দিনগুলোতে কাজ করা যায়নি। উত্তরে যা বুঝলাম তা আসলে কাজ বন্ধ করার সুযোগ খোঁজা। কারণ কাজ বন্ধ হলে একদিনে ঠিকা দারের লাভ থাকে ৫৬৯,৯৫০ টাকা।

কৃষ্ণদাসপুর আইলা প্রকল্পের কাছেই বসবাসকারী সুবীর পাট্টা (নাম পরিবর্তিত) যিনি এই প্রকল্পের সম্পর্কে বলেন "সরকার আমাদের সাথে ঠাট্টা করছে। তার প্রশ্ন হল এই বাঁধ দিয়ে আমাদের কি হবে, কেনইবা করছে আমরা বুঝতে পারছিনা। যেখানে আইলা প্রকল্প চলাকালীন পাশদিয়ে ২ বার বাঁধ ভেঙ্গে নদীর জল প্রবেশ করে আবারও ঘর বাড়ি ভেঙ্গে গেছে, প্রায় ৩ হাজার বিঘা চাষের জমি প্লাবিত হয়েছে, পুকুরের মাছ মারা গেছে। আর এখানে (আইলা প্রকল্পের বাঁধকে নির্দেশ করে বলছেন) সরকার কোটি কোটি টাকা ঢেলে বিশাল উঁচু করে অনেক নিচ থেকে নানান কিছু দিয়ে শক্তপোক্ত বাঁধ বানাচ্ছে। অথচ বছরের পর বছর এই অঞ্চলের নদী বাঁধগুলোকে কখনো সরকারের সহযোগিতায় কিংবা কখনো গ্রামের মানুষ নিজেদের উদ্যোগে বাঁধ মেরামত করে রক্ষণাবেক্ষণ করে এসেছে। সরকার আমাদের উন্নয়নের নামে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছে"।

সুবীর পাট্টার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সাথে যুক্ত অধস্তন ইঞ্জিনিয়ারের সাক্ষাৎকারের জন্য ২ দিন আশাহত হয়ে অবশেষে ৩ দিনের দিন সাক্ষাৎকার পেলাম (যিনি মাসে ২ বার দেখভালের জন্য প্রকল্পের কেন্দ্রে উপস্থিত থাকেন)। প্রকল্পের সম্পর্কে সুবীর পাট্টার বক্তব্যের উত্তরে তিনি খুব সংক্ষেপে বলেন, "আমি এদেরকে বুঝিয়ে পারবোনা, কয়েকজনের প্রশ্নের জন্য প্রকল্পের কাজতো আর বন্ধ থাকতে পারে না? সরকার তো আর এমনি এই বাঁধ বানাচ্ছে না", কিন্তু যখন আমি প্রশ্ন করলাম যে গ্রামের মানুষ অভিযোগ করছে প্রকল্প যেখানে শেষ হচ্ছে তার পরেই বাঁধ ২ বার ভেঙ্গে গেল? উত্তরে সরকারি ইঞ্জিনিয়ার বলেন, "সরকারের পরিকল্পনা হল আইলার সময়ে যেসব নদী বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে আগে সেগুলোকে এই ভাবে মেরামত করতে হবে, এবং এর ফলে বাঁধের কার্যকারিতার সম্পর্কে (সরকার) বুঝে পরবর্তী সময়ে তুলনায় কম দুর্বল বাঁধ গুলোও একেই ভাবে মেরামত করবে"। সরকারি ইঞ্জিনিয়ারের উক্ত বক্তব্যে যা বোঝা গেল তা হল, আইলা প্রকল্প হল সরকারের কাছে একটি পরীক্ষাগার। বিশ্বউষ্ণায়নের ফলে জলস্তরের বৃদ্ধি, ক্রমাগত প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার বেড়ে যাওয়া, ফলে সুন্দরবনের বহু বদ্বীপ জলের তলায় চলে যাওয়ার আশঙ্কা, ইত্যাদির কারণে ঠিক কোন ধরণের বাঁধ আগামী দিনে সুন্দরবনের জন্য উপযুক্ত হবে তা বোঝাটাও সরকারের প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত এই অভিজ্ঞতা থেকে আইলা পরবর্তী প্রায় ১৫ বছরে উক্ত প্রকল্পের ন্যায় বাঁধ না তৈরি করে (আইলার আগের)

তুলনায় শক্তপোক্ত ও উঁচু বাঁধ তৈরি হয়েছে সমগ্র ব্লক জুড়ে। এর ফলে স্থানীয় মানুষের নিরাপত্তা বেড়েছে তা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু পাশাপাশি এটা স্বীকার করাটা আরও জরুরি যে নদী বাঁধ মেরামতের ক্ষেত্রে কায়িক শ্রমের পরিবর্তে ব্যাপক হারে প্রযুক্তির ব্যবহার হল, যার ফলে স্থানীয় অঞ্চলের প্রচুর সংখ্যক কর্মঠ মানুষ স্থায়ী ভাবে ঘর ছাড়া হলেন। অর্থাৎ সুন্দরবন সম্পর্কে যারা বলেন আইলার পরে কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণে স্থানীয় মানুষ স্থানান্তরিত হয়েছে এই কথাটি ঠিক নয়। আইলার আগের তুলনায় কৃষি উৎপাদন এখন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। বস্তুত পক্ষে বলতে হয় সুন্দরবনের কৃষির বাইরেও অ-কৃষি জীবীকাও এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন নদীতে নেট টেনে বাগদা চিংড়ির ছোট বাচ্চা বা চারা ধরে (স্থানীয় ভাষায় যাকে বাগদা আন বা চারা বলে) সেই চারা বিক্রি করে মানুষ দৈনিক কিছু অর্থ উপার্জন করত। কিংবা নদী বাঁধে মাটি কাটার কাজ করে প্রায় প্রতি পরিবার বছরে বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করত। কিছু পরিবার নদীতে মাছ (নদীর বিভিন্ন প্রকারের খাওয়ার মাছ) ধরে জীবিকা উপার্জন করত। কিছু পরিবারের ফিসারিতে মাছ চাষ করত।[১৫] আরও এইরূপ নানান কাজ ছিল যে কাজ গুলোর মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের রুজিরোজগার চালাত। এখন আর এই জীবিকা গুলো নেই। সুতরাং চলিত উন্নয়নের মডেল এই প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর দেয়না। উলটো ভাবে বলতে গেলে উন্নয়নের আলোচনায় এই কলঙ্কিত প্রশ্নগুলো আড়ালেই থেকে যায়।

এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব কয়েকজন অর্থনৈতিক পণ্ডিতের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। পরিবেশবিদ অ গবেষক কল্যাণ সান্যাল তার লেখা বই "সাত সতেরো" তে বলছেন যে আমরা যাকে উন্নয়ন বলতে বুঝি তার জন্ম ১৯৫০ এর দশকে। এর একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক পটভূমিকা রয়েছে। তখন এশিয়া ও আফ্রিকার দেশ গুলো সদ্য স্বাধীন হয়ে জাতিরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। অপরদিকে একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার নেতৃত্ব ঠাণ্ডা লড়ায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

---

[১৫] এখানে উল্লেখ করতে হয় যে সুন্দরবনের উপকূলবর্তি এইসব মৌজাগুলোর নদীর চরে কেউ বা রায়তি কিংবা কেউ কেউ দখলদারি ভাবে কিছু ফিসারি তৈরি করে প্রাকৃতিক উপায়ে মাছ চাষ করত। এই প্রাকৃতিক উপায়ের অর্থ হল নদীর জল দৈনিক সরু ড্রেনের এর (cannel) মাধ্যমে ফিসারিগুলিতে প্রবেশ করত। এই জলের মাধ্যমে কিছু বিভিন্ন মাছের চারাও ফিসারিগুলিতে প্রবেশ করত। এই মাছগুলোকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ফিসারিতেই বড় করার জন্য রাখত। কয়েকমাস পরে এই মাছগুলো বড় হলে বিক্রি করে বছরে ২০-৩০-৪০ কিংবা ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করত। আইলার সময়ে নদীরবাঁধ ভেঙে যাওয়ার ফলে বেশিরভাগ এইধরনের ফিসারিগুলো নদীর চরে পরিণত হয়। ফলত এরাও রুজিরোজগার হারায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ ও ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রস্তুতির মাঝে আন্তর্জাতিক পরিসরে একটা নতুন বিন্যাস ঘটছে। আর ঠিক এই পটভূমিকায় উন্নয়নের মডেলটিও তৈরি হল। বস্তুত পক্ষে বলা যায় আমেরিকার নেতৃত্বেই। এর ফলে উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্র নেতাদের বক্তব্য হল সদ্য স্বাধীন এই রাষ্ট্র গুলো দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। যদি এদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন না করা যায় তাহলে এরা সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রথম থেকেই আদ্যোপন্ত ছিল রাজনৈতিক। অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বে যে উন্নয়নের মডেল আমরা দেখি তা এক প্রকার চাপিয়ে দেওয়া। যার উদ্দেশ্যই ছিল রাজনৈতিক।[১৬] এবং যেহেতু ইতিমধ্যে 'নবজাগরণের' ফলে ইয়োরোপ ও আমেরিকার কিছু রাষ্ট্রের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র গুলোর উন্নত ও 'ভালো' ধারণার বিশ্বাস তৈরি হয়েছে, তাই প্রথম বিশ্বের এই 'আধুনিক ও উন্নত' ভালো উন্নয়নের মডেলটিকে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে। সুতরাং অচিরেই এই উন্নয়ন মডেল নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু হয় যা এখনো চলছে আগামীদিনেও তা জারি থাকবে। কিন্তু ১৯৯০ এর দশকে Ferguson ও অমর্ত্য সেন তাদের উন্নয়ন তত্ত্বে উন্নত বিশ্বের উন্নয়ন তত্ত্বের মডেল কে সমালোচনা করেন। কিন্তু Ferguson উন্নত বিশ্বের উন্নয়ন তত্ত্বকে একটি তাত্ত্বিক সমালোচনা পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেলেও বিপরীতে গ্রহণযোগ্য অন্য কোন উন্নয়নের মডেল আমাদের মধ্যে তুলে ধরতে পারেনি। ওপর দিকে অমর্ত্য সেন শুধু উন্নত বিশ্বের উন্নয়নের মডেলকে সমালোচনাই করেননি, তার বিপরীতে একটি নতুন তাত্ত্বিক কাঠামো তুলে ধরেন তাঁর 'উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা' (ভাষান্তর অরবিন্দ রায়, ২০১৬) বইয়ে। তাঁর উন্নয়ন তত্ত্বে বলেন উন্নয়নের মানদণ্ড হওয়া উচিৎ মানুষ সেই উন্নয়নের মাধ্যমে কতোটা সংপৃক্ত হতে পেরেছে। অর্থাৎ উন্নয়নকে মানুষের মৌলিক স্বক্ষমতা (freedom) এবং সক্ষমতার (Capability) প্রসার হিসেবে দেখাই যুক্তি সংগত। অর্থাৎ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে যে সংসাধনের (resources) ব্যবহার করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক পরিকাঠামো এবং অন্যান্য সম্পদ সৃষ্টি করে সমস্ত নাগরিকের জীবন-মানের উন্নতি সাধন করা যায় তাই উন্নয়ন। আবার, মানুষের সক্ষমতা প্রসারিত হলে সংসাধন ও উৎপাদনের উন্নতি ঘটে, আয়বৃদ্ধির গতি শেষ বিচারে যে উন্নতির উপর নির্ভর করে।[১৭] অর্থাৎ উন্নয়নের সাথে সামাজিক

---

[১৬] সান্যাল, কল্যাণ; (২০১১), "সাত সতেরো" অনুষ্টুপ, কলকাতা, পৃঃ ৬৮-৬৯।

[১৭] জ দ্রেজ, ও অমর্ত্য সেন, (২০১৫) "ভারত উন্নয়ন ও বঞ্চনা" আনন্দ, কলকাতা, পৃ; মুখ বন্ধ চার।

কাঠামোর উন্নতি ও মানুষের জীবন মানের একটি স্বচ্ছ সম্পর্ক থাকাটা জরুরী। অর্থাৎ আইলা উত্তর সুন্দরবনের মানুষ উন্নয়নের দ্বারা কতোটা সংপৃক্ত হয়েছে তার নমুনা আমরা উপরিউল্লিখিত আলোচনায় বোঝার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ সেনের এই উন্নয়নের তাত্ত্বিক কাঠামো দ্বারা আমরা সুন্দরবনের মানুষের আইলা উত্তর অভিপ্রায়নের (migration) হিসেবকে কি বুঝতে পারি?

দুর্যোগ ও শ্রম বাজারঃ-

সদ্য IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre) এর একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে গত এক দশকে দুর্যোগের ফলে ভারতের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে অভিপ্রায়ন হয়েছে প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষের।[১৮] অর্থাৎ এই মানুষগুলো সবাই দুর্যোগের ফলে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এই পরিযায়ী মানুষগুলোর বাস্তু ছাড়ার সরাসরি কারণ দুর্যোগ হলেও এর ভেতরেও আরও নানান ছোট ছোট কারণ উপাদান হিসেবে কাজ করে যেমন বাসস্থান ধ্বংস হয়ে যাওয়া, ক্রমাগত দুর্যোগের শিকার হওয়ায়, কৃষি জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়া, অকৃষি জীবিকা ভেঙে পড়া এইরূপ নানান কারণে দুর্যোগের ফলে মানুষকে তাঁর ভিটে মাটি ছেড়ে অজানা এক কঠিন জীবনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে হয়। আইলার পরে সুন্দরবনের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের 'অভিবাসনের' কারণে বলতে হয় কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার মত আকস্মিক প্রভাব থাকলেও দীর্ঘ কালীন ভাবে প্রভাব পড়েছিল স্থানীয় অঞ্চলে অকৃষি জীবিকা ভেঙে পড়ার ফলে। আসলে আইলার আঘাতে সাময়িক ভাবে প্রায় ৪০০,০০০ মানুষ ঘর ছাড়া হয়েছিল (দেখুন, T.I.S.S report 2009, July, পৃ; ৫)। যেখানে ১,৯৪,৩৯০ ঘর সম্পূর্ণ ভেঙে যায় (দেখুন CRG report 2009, পৃ; ৮৭) কিংবা 'Down To Earth' ২০০৯ সালের ১৫ জুলাইয়ের এক প্রতিবেদনে তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি বলেন 'Nearly 15 to 20 per cent people have moved out of the Sundarbans islands. "Most of them are from Kumirbari, Amtali, Choto mollakhali, Patharpratima and Gosaba areas that were the worst-affected," he said. The minister claimed the rate of

[১৮] https://www.internal displacement.org/database/displacement-data/

migration has slowed down and a few people are coming back to repair the embankments'।[১৯] অর্থাৎ দুর্যোগের প্রভাবে হঠাৎ এতো মানুষ স্থানান্তর হলে সেই অঞ্চলের (প্রচলিত) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপরে প্রভাব পড়াটা খুবই স্বাভাবিক। অর্থাৎ যারা আকস্মিক বাড়ি ছাড়া হল তাদের মধ্যে বেশির ভাগের মাটির বাড়ি ছিল। তাঁদের ঘর ভেঙে যায়, চাষ না হওয়ায় কৃষি শ্রমিকের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।[২০] নদী বাঁধ মেরামতের জন্য কায়িক শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে তারা মাটি খননের কাজ হারায়। এই মানুষ গুলোই ঘর ছাড়া হয়। এই শ্রেণীর মানুষ যারা কৃষি শ্রমিকের পেশার পাশাপাশি সারা বছর আরও অন্যান্য নানান অকৃষি জীবীকার সাথে যুক্ত থাকে। দুর্যোগের ফলে গ্রামের এই রূপ একেবারে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ, যাঁদের পরিস্থিতি বিভিন্ন দিক থেকে শোচনীয় হয়ে পড়েছিল তারাই ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। আর এই শ্রেণীর মানুষেরা গ্রামের অকৃষি জীবিকার প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখে। এবং এই মানুষ গুলোর পক্ষে গ্রামে থেকে বা পুনরায় ফিরে এসে বিশেষ কিছু করারও সুযোগ থাকে না । কারণ অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রামের অকৃষি জীবিকার চরিত্র পরিবর্তন হতে থাকে ভেতর থেকে।[২১] আইলার আগে সুন্দরবনের বেশির ভাগ পরিবার কম বেশি যেইসব অকৃষি জীবিকার সাথে যুক্ত থাকত তাহল মাটি খননের কাজ, নদীতে মিন ধরার কাজ, খাঁড়ি/নদিতে মাছ ধরা, ফিসারি তে প্রাকৃতিক উপায়ে মাছ চাষ করা ও আরও কিছু আনুসঙ্গিক দৈনিক কাজ যার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ অসংগঠিত ভাবে কিছু অর্থ উপার্জন করে থাকত।

---

[১৯] https://www.downtoearth.org.in/environment/aila-prompts-exodus-3572

[২০] https://americanethnologist.org/online-content/collections/intersecting-crises/of-pandemics-and-storms-in-the-sundarbans/

[২১] এই বিষয়ে আমি আগে উল্লেখ করেছি যে কিছু মানুষ পুনরায় গ্রামে ফিরে বসতি গড়ার পরিকল্পনার প্রবণতা দেখালেও, পুনরায় তাঁরা তাঁদের জীবিকায় ফিরে যেতে পারেন না। তুলনায় গ্রামে যারা একটু অর্থসম্পন্ন পরিবারের তাঁরা নানান জীবীকার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ল। যেমন ছোটখাটো ব্যবসার কথা বলা যায়, ছোটখাটো মোবাইলের দোকান যেখানে বেচা কেনা করার পাশাপাশি পুরনো ও খারাপ মোবাইল সারাই করা হয়। নতুন নতুন ইলেকট্রনিক্সের দোকান, মেশিন ভ্যান, টোটো এই জীবীকার জন্য কিছুটা হলেও মূলধনের প্রয়োজন। এই জীবিকা গুলোতে গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষেরাই যুক্ত হয়ে পড়ল। ফলস্বরূপ নিম্ন শ্রেণীর মানুষ স্থায়ী ভাবে জীবিকা হারায়।

সারণি ৩

অকৃষি জীবিকার সাথে যুক্ত থাকা প্রতি পরিবারের গড় শ্রমিকের সংখ্যা

আইলার আগে				আইলার পরে		
জীবিকা	মোট শ্রমিক	পরিবারে যুক্ত থাকা মোট শ্রমিকের সংখ্যা	দৈনিক আয়	মোট শ্রমিক	পরিবারে যুক্ত থাকা মোট শ্রমিকের সংখ্যা	দৈনিক আয়
কৃষি শ্রমিক	২৩০	২-৩	২৬০	১৬০	১-২	৫৫০-১১০০
মাটি খননের কাজ	১৭৩	১-২	৩০০-৬০০	২৩	০-১	৪৫০-৫০০
ফিসারিতে মাছ চাষ	৪৬	১-২	২০০-৪০০	৭	০-১	৩৫০-৪০০
মিন ধরা	১৯০	১-৩	১০-৩০০	১৩	০-১	১৫০-২০০
খাঁড়ি/নদিতে মাছ ধরা	১১৫	১-২	৫০-৩০০	৩৬	১-২	৩০০-৬০০
মেশিন ভ্যান	২	০-১	৫০-১২০	২২	০-১	১৫০-২০০০
টোটো	০০	০০	০০	৩৩	০-১	১০০-৩০০
কৃষি যন্ত্র	১	০-১	১২০	৬	০-১	৫০০-৬০০

- সারণি ৩ এর ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার। তা হল, উপরে উল্লিখিত তথ্যগুলি ২০১১ সালের সেন্সাস ও ক্ষেত্র সমীক্ষার তথ্যের ওপরে ভিত্তি করে করা হয়েছে। এবং টেবিলটি তৈরি করা হয়েছে আমাদের ক্ষেত্র সমীক্ষার মোট ৩০০ পরিবারের ভিত্তিতে।
- কৃষি শ্রমিক কেবল ১২ মাসের মধ্যে খুব বেশি ২ মাস বছরে কাজ পায়। অপর দিকে অকৃষি জীবিকার ক্ষেত্রে ১২ মাস কাজ থাকে।
- সারণির উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে আইলার আগে গ্রামের মানুষ অকৃষি জীবিকার সাথে জড়িত ছিল এবং আইলার পরে এই মানুষ গুলো জীবিকা হারিয়ে বাড়ি ছাড়া হল। নতুন কিছু যা দোকান পাট ব্যাবসা বাণিজ্য যা হল, তাও গেল নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের হাতে। সুতরাং ভেতর থেকে গ্রাম যে একটি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটছে তা পরিষ্কার চোখে পড়ে।

- এবং সর্বোপরি সারণির ৩ এর সংখ্যাতাত্ত্বিক যুক্তি গুলো আরও প্রমাণ করে দুর্যোগের প্রভাবে নিম্ন সুন্দরবনের গ্রাম গুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের চরিত্র।

উপরে উল্লিখিত সারণি ৩ এর বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও বিভিন্ন যুক্তি ও মানদণ্ডের আলোচনার ভিত্তিতে এটা বোঝা যায় যে নিম্ন সুন্দরবনের গ্রাম সমাজ একটি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। যার শুরু বলা যায় আইলা পরবর্তী সময় থেকেই।

নূতন কৃষিঃ-

আমরা এবার দেখার চেষ্টা করব কিভাবে আইলা উত্তর সুন্দরবনে কৃষি ও কৃষি ব্যবস্থার 'রূপান্তর' ঘটছে। একই ভাবে দেখার চেষ্টা করবো কৃষির এই রূপান্তর ধান-চালের বাজার, সরকারি নীতি, মানুষের জীবিকা, জমি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলির ওপর কিরূপ প্রভাব পড়েছে। বা এটাও হতে পারে আমি যে বিষয়টিকে আপাতদৃষ্টিতে এই অঞ্চলে কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থায় 'নতুন গঠনা বা 'রূপান্তরা' বলে মনে করছি তা আদপেও কি নতুন? আর যদি নতুন হয়েও থাকে তাহলে সেই নতুনত্বের সাথে উদারনৈতিক অর্থব্যবস্থার সম্পর্কটি ঠিক কি রকম? এই প্রশ্ন গুলোর উত্তর আমি পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করার চেষ্টা করবো প্রথমে আমি আলোচনা করবো সুন্দরবনে আইলা উত্তর নতুন কৃষি বা কৃষির রূপান্তর বলতে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছি। এক কথায় নতুন কৃষির অর্থ হল প্রথাগত কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল বীজ প্রযুক্তি ব্যবহার, বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অনুশীলন ইত্যাদি। নতুন কৃষি এই শব্দটি প্রথম 1906 সালে Barne landreth তাঁর লেখা "the new Agriculture" প্রবন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে আমেরিকা ১৮৪০ সাল নাগাদ Peruvion guano কোম্পানির সার উৎপাদনের ফলে প্রথম প্রথাগত কৃষি উৎপাদন বাবস্থায় পরিবর্তন দেখা যায়, যেটাকে তিনি "নতুন কৃষি" বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই কোম্পানির উৎপাদিত সার ক্রমশ আমেরিকা থেকে সমগ্র ইয়োরোপের কৃষকরা ব্যবহার করা শুরু করে। মিষ্টি বিট, তুলা, তামাক চাষে সুপার ফসপেট, মৃত প্রাণীর হাড়ের দ্বারা তৈরি সার ব্যবহার করার ফলে কৃষির উৎপাদন অনেকটা বেড়ে যায়। একই সময়ে জার্মানি, ইংল্যান্ড, এবং ইজিপ্টে Steam plowing নামে মেশিন (হালের মেশিন) আবিষ্কারের ফলে কৃষি উৎপাদন আরও তরান্বিত হয় । ১৯৭৪ সালে Robert A Alexander তাঁর লেখা " new

challenge-Agriculture" প্রবন্ধে আলোচনা করেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সারা বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের অভাব মেটানোই কৃষির নতুন চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হয়েছিল । Peter Ho ২০০৪ সালে তাঁর লেখা "Rural Development In Transitional China The new Agriculture" বইতে দেখিয়েছেন, স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময়কাল (২০০৪) পর্যন্ত চীনের জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা ও খামার রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বঅর্থনীতিতে চীনের কর্তৃত্ব বা নতুন বাজার দখল করা-ই হল চীনের কৃষি উৎপাদনে নতুন চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে ভারতের ক্ষেত্রে কৃষির রূপান্তরের (সবুজ বিপ্লব) উদ্দেশ্য ছিল মূলত ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা নিবারণ এবং খাদ্যে স্বনির্ভরতা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ভারতে ষাটের দশকে কৃষি ক্ষেত্রে 'সবুজ বিপ্লবের' সূচনা হয়। ফলে কৃষির যে পরিবর্তন দেখা যায় তা বস্তুতপক্ষে উচ্চ ফলনশীল বীজ, সেচ ব্যবস্থার পুনর্গঠন, ও সর্বোপরি প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমেই ঘটে। এক কথায় বলা যায় এই সময় থেকে ভারতবর্ষে শুরু হয় কৃষির 'নতুন ব্যবস্থা' (দেখুন A.K. chakravarti, 1973. K.S.Mann, 1968, G.S Bhalla, 1979)

একটু ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে দারিদ্র দূরীকরণ ও খাদ্য স্বনির্ভরতা (এক কথায় কৃষির রূপরেখা) আসলে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাত ধরেই এগিয়েছে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ও বেসরকারি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ দলের পরামর্শ ও অর্থনৈতিক সাহায্যের মধ্যদিয়ে ভারতীয় কৃষির রূপরেখাটি বাস্তবায়িত করার চেষ্টা হয়েছে। ১৯৫১ সালে ভারত-মার্কিন 'কারিগরি চুক্তি', ১৯৫২ সালে ভারত-মার্কিন 'সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা', ১৯৫৯ সালে মার্কিন কোম্পানি ফোর্ড ফাউন্ডেশনের ‘দশ দফা’ কর্মসূচীর ভিত্তিতে 'নিবিড় কৃষি জেলা পরিকল্পনা', রকফেলার ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় 'উচ্চ ফলনশীল বীজের পরিকল্পনা' - এই রূপ নানান প্রকল্পের রূপায়ন ও নীতি নির্ধারণের ফলে ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে (দেখুন সমীর গুপ্ত, অন্য অর্থ, ১৯৭৪, পৃ ৫৯)।

ফ্রেডিক হাইয়েক ও মিলটন ফ্রিডম্যান (বিশেষ করে Capitalism and freedom বইয়ে উল্লিখিত) এর নেতৃত্বে গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে/ নয়া বাজার অর্থনীতির কাঠামোটি পরিস্ফুট হয় । নব্বইয়ের দশকে এই নয়া বাজার অর্থনীতির নীতিমালা গুলিকে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র গ্রহণ করতে শুরু করে। একদিকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান (১৯৮৯), এবং অপরদিকে কেইন্সিয়

অর্থনীতির ভাঙ্গন হাইয়েক ও ফ্রেডম্যানের বিশ্বায়িত মুক্তবাজার অর্থনীতির নীতিগুলির প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দেয় । অর্থনীতির এই নীতিমালা গুলি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সাথে ভারতেও প্রভাব ফেলে (১৯৯০ এর পরে ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার)। জাতীয় অর্থনীতি, আইন ব্যবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো যেমন পরিবর্তন হতে থাকলো তেমনি ক্রমশ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোতেও পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল (দেখুন, Sarah joseph; 2007)।

আমরা দেখেছি 'বিশ্বায়ন' সময়ের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে কেন্দ্র থেকে একেবারেই প্রান্তের অন্দরমহলে (দেখুন joseph E Stiglitz, Globalization and Its Discontents, 2002, বাগচি, বিশ্বায়নঃ ভাবনা-দুর্ভাবনা, ২০০৮)। এর কেন্দ্র যদি আমেরিকার ওয়াশিংটন ডি সি হয় তাহলে প্রান্তের উদাহরণ হিসাবে সুন্দরবনের প্রান্তিক গ্রামগুলিকে বলা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হোল সুন্দরবন অঞ্চলে ঠিক কোন সময় থেকে উদারনৈতিক অর্থ ব্যবস্থার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

উপরে উল্লিখিত প্রশ্নটির উত্তরের আগে আমাদের সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষির উৎপাদন ও তার প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া উচিত। ভারতীয় সুন্দরবন অঞ্চলটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা নিয়ে গঠিত। পলি জমাট বেঁধে এই অঞ্চলের ভূমি গঠিত হলেও নদীর লবণ জলের প্রভাবে এই অঞ্চলের মাটি অনুর্বর যুক্ত এঁটেল চরিত্রের হয়। মরশুমি কৃষি উৎপাদন, নিম্ন মানের সেচ ব্যবস্থা এইরূপ বিভিন্ন কারণে এই অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন অনেকটাই কম। সমগ্র রাজ্যের চাষবাসের প্রবলতা যেখানে (Crop intensity) ৭৭% সেখানে সুন্দরবনের দুটি জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় তা যথাক্রমে ৪১% এবং ৩১.৩০%। রাজ্যের মোট কৃষি জমির ৬৮% সেচ পরিষেবা থাকলেও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় যথাক্রমে ৩০.২% এবং ১২%। মোট ৩,১৫,৫০০ হেক্টর চাষযোগ্য জমির মধ্যে প্রায় ৩২.৪% উচ্চ লবণাক্ত জমি (দেখুন সুন্দরবন বিষয়ক বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট ২০১৬)। অর্থাৎ চাষবাসের ক্ষেত্রে এই বাধা গুলি যেমন রয়েছে তেমনি এই অঞ্চলের নদীবাঁধও কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (যা আগেই উল্লেখ করেছি)। সমগ্র সুন্দরবন প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধ দিয়ে ঘেরা। বাঁধ সংলগ্ন জমিগুলো প্রায় প্রত্যেক বছরে দু-একবার লবণ জলে প্লাবিত হওয়াটা কোন নতুন ঘটনা নয়। অর্থাৎ এই অঞ্চলে প্রকৃতিগত এই রূপ এবং জমির নানান প্রাকৃতিক ঘাটতির

বৈশিষ্টের কারণে কৃষি উৎপাদন তুলনামূলক ভাবে কম হত। কিন্তু আইলার পরে (সরকারী উদ্যোগে) নদিবাঁধ মেরামত ও আরও নানান আনুসঙ্গিক কারণে ব্লকের সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থার ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটেছে। যেমন ক্যানিং-২, সাগর ও নামখানা ব্লকের কিছু কৃষি পরিবারের সাথে কথা বলে বোঝা গেলো জমিতে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার করার ফলে প্রত্যেক বছরে তাঁদের মোট ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।[২২] এবং এই উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার মোটামটি আইলা পরবর্তী সময় থেকে বেশি করে শুরু হয়েছে।

সবুজ বিপ্লব ও সুন্দরবনের কৃষি রূপান্তরঃ-

ভারতবর্ষের কৃষির রূপান্তর সবুজ বিপ্লবের সময় থেকেই ধরা হয়। সদ্য স্বাধীন দেশ হিসেবে ভারত চরম খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয়। ঠিক এই সময়ে ১৯৬২ তে চীনের সাথে ও ১৯৬৫ তে পাকিস্থানের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, ১৯৬৫-৬৬ সালে পর পর দুবার খরার কারণে খাদ্য শস্যের উৎপাদন ১৭ % কমে যাওয়া এবং ১৯৫৬ সালে অ্যামেরিকার সাথে 'পি.এল.৪৮০' চুক্তির ফলে বাৎসরিক প্রায় ২ কোটি টনের কাছা কাছি খাদ্য শস্যের আমদানি করতে হয়েছিল। এই বিষয়গুলোর ফলে তৎকালীন রাষ্ট্র নেতারা বাধ্য হলেন দেশে 'নতুন কৃষি পরিকল্পনা' করার জন্য। যাকে আমরা 'সবুজ বিপ্লব' হিসেবে জানি। এর ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারত খাদ্যে স্বনির্ভর হয়ে উঠল। ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে ৩৫ % (দেখুন, চন্দ্র ২০১৭, পৃ; ৪৯৬)। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের উত্তর পশ্চিম অংশে প্রথম সবুজ বিপ্লবের পরিকল্পনা করা হলেও ক্রমশ তা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে যায়। কৃষি

---

[২২] এই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা উচিৎ সবুজ বিপ্লবের ফলে ভারতে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল ও নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষ এর (সবুজ বিপ্লবের) ফল ভোগ করছে, এই বিতর্কের পর (১৯৯০ এর পর থেকে) থেকে (বিশেষ করে বামপন্থি পণ্ডিতদের দ্বারা) ভারতের পূর্ব অঞ্চলেও সবুজ বিপ্লবের কাঠামোয় কৃষির রূপান্তর হতে থাকে। যাতে সবুজ বিপ্লবের সুফল দেশের সমগ্র অংশ পায় (দেখুন, চন্দ্র; ২০১৭; পৃঃ ৪৯৬)। এর পর থেকেই উচ্চ সুন্দরবনের অঞ্চলগুলোতে, আধুনিক উচ্চফলনশীল বীজ, সার কীটনাশকের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু এর প্রভাব নিম্ন সুন্দরবনে খুব সামান্যই পড়েছে, যা আমরা ক্ষেত্র সমীক্ষার সময়ে দেখেছি। সুতরাং আইলার আগে থেকে সুন্দরবনে আধুনিক পুঁজিবাদী কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটলেও নিম্নসুন্দরবনের তা বস্তুত আইলা পরবর্তী সময় থেকেই শুরু হয়।

ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি, সেচ ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন, সরকারি বিনিয়োগ, পণ্যের লাভজনক মুল্য, ঋন প্রদান, কৃষি উপকরণে ভর্তুকির মাধ্যমে চেষ্টা করা হল যাতে নিম্ন শ্রেণীর কৃষকেরাও লাভবান হয় এবং কৃষক যাতে শস্যের সঠিক মুল্য পায় তার জন্য 'কৃষিপণ্য মুল্য কমিশন' (১৯৬৫) গঠন করা হল। এবং ক্রমশ দেশের সমগ্র অংশে সবুজ বিপ্লবের প্রভাব কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় পড়তে থাকে।

সবুজ বিপ্লবের ফলে দেশে কৃষির রূপান্তর ও আইলার পরে সুন্দরবনে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে কি কোন সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য ধরা পড়ে? নাকি দুটো ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে প্রবাহিত হয়েছে তার তুল্যমূল্য বিচার করাটা এখানে প্রয়োজন। কারণ এর ফলে সুন্দরবনে আইলা পরবর্তী সময়ে কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঠিক কোন 'বয়ানে' প্রবাহিত হয়েছে তা সহজে বোঝা যাবে।

উপরিল্লিখিত সবুজ বিপ্লব সম্পর্কে যা আলোচনা করেছি তার ভিত্তিতে আমরা যদি আইলা পরবর্তী সময়ে কৃষির পরিবর্তন গুলো দেখি তাহলে তা দাঁড়ায় এইরূপ, সুন্দরবনে কৃষি পরিবর্তন হয়েছিল দুর্যোগ কবলিত সঙ্কট কালীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে। সরকার দুর্যোগের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওই বছরে শতকরা ৬-১০ জন কৃষককে যাঁদের উঁচু জমিতে লবণ জলের প্লাবন হয়নি (২০০৯ সালের আমন ধানের চাষের মরশুমে) তাঁদের কিছু উচ্চফলনশীল বীজ ও সার প্রদান করেছিল, যেগুলো লবণ জল সহনশীল বীজ বলে প্রচারিত হয়েছিল। ফলনও একেবারেই মন্দ হয়নি। পরের বছর থেকে এই কোম্পানি গুলোর ধান বীজ, সার, কীটনাশক বাজারে বিক্রি করা শুরু হয় । নিম্ন সুন্দরবনের উপকূলীয় গ্রাম বা মৌজাগুলোতে আইলা পরবর্তী কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন বস্তুত পক্ষে এই সময় থেকেই শুরু হয় বা বলা যায় কৃষি পরিবর্তনের এটাই ছিল মৌলিক কারণ। ক্রমে এই ধরনের বীজ, সার, কীটনাশক কোম্পানিগুলো স্থানীয় অঞ্চলে একটি স্থায়ী বাজার তৈরি করে নিয়েছিল। কৃষকও এখন বেশি উৎপাদনের আশায় এই বীজের মাধ্যমে চাষ করছে। এতে উৎপাদন অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং আইলার পরে সুন্দরবনের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার এই রূপান্তরের জন্য উক্ত উপাদান গুলো বিশেষ ভাবে কাজ করেছিল। সবুজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য যেসব উপাদান ও সরকারি নীতি বিশেষ ভাবে ভূমিকা পালন করেছিল, সুন্দরবনের ক্ষেত্রে এই উপাদান গুলোর তেমন কোন

কার্যকরী ভূমিকা ছিলনা। বলা যায় সুন্দরবনের ক্ষেত্রে এই উপাদান গুলো কতোটা ভূমিকা পালন করত, তা সন্দেহাতীত। বস্তুতপক্ষে বলা উচিৎ, সবুজ বিপ্লব ছাড়াও পৃথিবীর যেখানে যেখানে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন দেখা গেছে সেখানে এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট গুলো কমবেশি লক্ষ করা যায়। যেমন সেচ ব্যবস্থার ব্যপক পরিবর্তন, প্রযুক্তির ব্যবহার (সুন্দরবনের ক্ষেত্রে শুধুই পাওয়ার টিলার ও ট্রাক্টরের ব্যবহার দেখা গেছে), ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, জলের চাহিদা মেটানোর জন্য শ্যালো মেশিনের ব্যবহার, দেশ বিদেশের কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, শস্য উৎপাদনে বিদ্যুতের ব্যবহার, কৃষি গবেষণাগার, সার কীটনাশক প্রস্তুতকারি কোম্পানি গুলোর বিনিয়োগ ইত্যাদি। কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চিরাচরিত এই বৈশিষ্টগুলো পাথরপ্রতিমা তথা নিম্ন সুন্দরবনে কৃষি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।[২৩] এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে তা হল, প্রথমত সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল হওয়ায় প্রতিনিয়ত ঝড়, বৃষ্টি ও বন্যার একটা প্রবণতা থাকে। দ্বিতীয়ত এই অঞ্চলগুলো সমুদ্রের মোহনায় ছোট ছোট দ্বীপে অবস্থান করায় ও যোত গুলো ছোট ছোট হওয়ায় ভারি যন্ত্রপাতি পরিচালন করা মুশকিল হয়ে যায়। তৃতীয়ত এই অঞ্চলের মাটির তলদেশের মিষ্টি জলের প্রাপ্যতা এতোটাই ব্যায় বহুল যে (১২০০ থেকে ১৫০০ ফুট পর্যন্ত মাটির গভীরে যেতে হয়) কোন মালিক শ্যালো মেশিনের মাধ্যমে জল সরাবরহ করলে তা অলাভজনক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষির পরিবর্তন ও সুন্দরবনে দুর্যোগের ফলে কৃষির পরিবর্তন উভয়ক্ষেত্রের পরিবর্তনের উপাদান ও চরিত্রের মধ্যে বিস্তর অমিল রয়েছে। তা আরও পরিষ্কার হবে আইলা উত্তর পাথরপ্রতিমা ব্লকের কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থার ‘ধরণের’ পরিবর্তন দেখলে।

---

[২৩] বিশেষ ভাবে এখানে উল্লেখ করতে হয় যে সমগ্র পাথরপ্রতিমাকে ভৌগলিক ভাবে মূল ভূমি ও বিচ্ছিন্ন উপকূলীয় বদ্বীপ অঞ্চলে ভাগ করা যায়। ব্লকের যেইসব মৌজাগুলোতে আইলার তেমন প্রভাব পড়েনি সেখানে কৃষির এইরূপ পরিবর্তনও দেখা যায়নি, যেমন আমার ক্ষেত্র সমীক্ষার এইরূপ দুটো মৌজা হল দিগম্বরপুর ও হেরম্ব গোপাল পুর। একই ভাবে বলা যায় ব্লকের প্রায় অর্ধেক অংশ মূল ভূমির সাথে যুক্ত থাকায় আগে থেকেই কিছু শ্যালো মেশিনের ব্যবহার ও উচ্চফলনশীল বীজের মাধ্যমে চাষ হত। যেহেতু আমার গবেষণার ক্ষেত্রে গুলো ব্লকের উপকূলীয় অংশে বিচ্ছিন্ন বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত গ্রাম গুলোকে নিয়ে তাই কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন এই ক্ষেত্র কেবল ব্লকের উপকূলীয় গ্রামগুলোর প্রেক্ষিতেই ভাবতে হবে।

সারণি ৪

আইলার আগে ও পরে ব্যবহৃত কৃষিজ উপকরণ

আইলার আগে		আইলার পরে
উপকরণ	পরিমাণ/সংখ্যা	পরিমাণ/সংখ্যা
সার বিক্রেতা (খুচরা)	১০০	২২০
সার বিক্রেতা (পাইকারি)	০০	৬
কীটনাশক বিক্রেতা	১৮	৬৩
বীজ বিক্রেতা	৫	৩০০
মোট সেচ যুক্ত জমি	৬৫৩৫	৭১২৩
পাওয়ার টিলার	১৭৫	৩১৫
ট্রাক্টর	০০	১৭
ধান ঝাড়া মেশিন	৮৭৫	২৮৭০
শ্যালো মেশিন	১১০	১২৫

- তথ্য গুলো সংগ্রহ করা হয়েছে ব্লক কৃষি দপ্তর থেকে।
- এখানে দুটো বিষয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে, তাহল সেচ যুক্ত জমি ও শ্যালো মেশিনের ব্যাপার সম্পর্কে। প্রথমত বলা যায় শ্যালো মেশিনের জলের দ্বারা সেচ করা হয় পাথরপ্রতিমা ব্লকের উচ্চ অংশে। এবং ৩১৯০৮ হেক্টর মোট কৃষি জমির মধ্যে সেচের ব্যবস্থা রয়েছে মাত্র ৬৫৩৫ হেক্টর জমিতে। সুতরাং এখানে মোট কৃষি জমির সেচ যা ধরা হয়েছে তার বেশির ভাগ আসে খাল বিল ডোবা ও কিছুটা শ্যালোর জলে দ্বারা (শ্যালোর ব্যবহার হয় ব্লকের মূল ভূমির উচ্চ অংশে)। তাহলে যুক্তির খাতিরে বাকি ২৫,৩৭৩ হেক্টর জমিতে কোন সেচ ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ এই জমিগুলো এক ফসলি হিসেবে বর্ষার জলে কেবল আমন ধানের চাষ হয়।

এবার আমরা দেখব আইলার আগে ও পরে ব্লকের শস্য উৎপাদনের হার ও মোট খরচের পরিবর্তন।

সারণি ৫

শস্য উৎপাদনের হার ও খরচ

আইলার আগে			আইলার পরে	
শস্যের নাম	বিঘা প্রতি উৎপাদন কুন্টাইল	মোট খরচ (টাকায়)	বিঘা প্রতি উৎপাদন কুন্টাইল	মোট খরচ (টাকায়)
ধান	৩-৭	১২৫০-২০০০	১০-১৮	৬০৫০-৮০০০
লঙ্কা	১-২	৫০০০-৭০০০	৫ -৭	৮০০০-১৪০০০
তরমুজ	২০-২৫	১০০০০-১৩০০০	০০	০০
সব্জি	২-৪	৪০০০-৬০০০	৮-১২	২০০০০-৩০০০০

- এই তথ্যগুলো ক্ষেত্র সমীক্ষার সময়ে সংগ্রহ করেছি
- এখানে ধানের পরিমাপের ক্ষেত্রে ৪০ কেজিতে এক মন হিসেবে ধরা হয়েছে। কারণ স্থানীয় অঞ্চলের মানুষ ধানের পরিমাপের ক্ষেত্রে কেজি বা কুইন্টাইলের পরিবর্তে 'মন' শব্দটি বেশি ব্যবহার করে। বাকি অন্যান্য ফল ও সব্জি পরিমাপের ক্ষেত্রে কেজি বা কুইন্টাল ব্যবহার করে। এই অর্থে ধানের উৎপাদন ৩-৭ মন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে আইলার আগে জমিতে সব্জি চাষ হলেও আইলার পরে জমির আলে/আঁটায় (জমির বাঁধকে স্থানীয় ভাষায় আল বা আঁটা বলে) বাণিজ্যিক হারে সব্জি উৎপাদন হচ্ছে। লংকা, তরমুজ এই চাষগুলো আইলার আগে জমিতে হলেও, আইলার পর থেকে তরমুজ চাষ আর হয়না বললেই চলে। কিন্তু লঙ্কার ক্ষেত্রে জমির পরিবর্তে আলে বা আঁটায় ব্যাপক হারে উৎপাদন শুরু হল। আগে পাকা লঙ্কা শুকিয়ে বাজারে বিক্রি করার পরিবর্তে কাঁচা লংকা বিক্রি করাকে কৃষক এখন বেশি লাভ জনক মনে করছে।

সুতরাং সারণি ৪ ও ৫ এর তথ্যের ভিত্তিতে আমরা আনুমান করতে পারি আইলা উত্তর নিম্ন সুন্দরবনের কৃষির রূপান্তর ঘটছে। যে রূপান্তর সবুজ বিপ্লবের ন্যায় না হলেও পাথরপ্রতিমার কৃষি পরিবর্তন হয়েছে একটি সঙ্কট কালীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে। সুতরাং এখানে রাষ্ট্রের বৃহৎ কোন কৃষি নীতি কিংবা বৃহৎ আকারে প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ব্লকে কৃষি পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু সারণি ৪ ও ৫ এর ক্ষেত্রে উল্লিখিত তথ্যগুলো অনুধাবন করলে দেখা যাবে ব্লকের উপকূলীয় গ্রাম গুলোতে কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হিসেবে পাওয়ার টিলার ও ধান ঝাড়াইয়ের মেশিনের সংখ্যা ও বীজ, সার ও কীটনাশক ব্যবহার অনেকাংশে বৃদ্ধি

পেয়েছে। অর্থাৎ সরকারি উদ্যোগের থেকেও বেসরকারি এজেন্সিগুলোর প্রভাব এখানে বেশি লক্ষ্য করা যায়।

বীজের কালো বাজারিঃ-

এর ফলে বীজ, সার ও ঔষধের (কৃষি ক্ষেত্রে) কোম্পানিগুলো ব্লকে একপ্রকার 'কালো বাজার' তৈরি করে কৃষকদের দেদার ঠকিয়ে চলছে। তার কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে ধরলে ব্যাপারটি আরও বোধগম্য হবে। বিশেষ করে বীজের ক্ষেত্রে বলা যায়, এই বিষয়ে Bayer কোম্পানি যারা কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঔষধ, প্রযুক্তি, বীজ ইত্যাদি তৈরি করে। এই কোম্পানির একজন কৃষি বৈজ্ঞানিকের এর বক্তব্য হল (পরিচয় গোপন রাখার শর্তে), 'ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স এর বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক কোম্পানির সাথে আমাদের কোম্পানিও যুক্ত হয়ে সুন্দরবনের রাইদিঘি, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, গোসাবার মতো উপকূলীয় ব্লক গুলোতে কিভাবে লবণজল সহনশীল বিভিন্ন বীজ উৎপাদন করা যায় দীর্ঘদিন ধরে তার পরীক্ষানিরীক্ষা করে চলছে। এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমাকেও যেতে হয়েছে। আসলে লবণজল সহনশীল এই বীজ গুলো লবণাক্ত মাটিতে তুলনামূলক ভাবে টিকে যায়। যার ফলে একদিকে হাইব্রিড ও অন্যদিকে লবণজল সহনশীল হওয়ায় 'পরিমাণগত' ভাবে উৎপাদন ভালো হয়। কিন্তু এই বীজ ও সার ঔষধের অত্যাধিক ব্যবহারের ফলে সুন্দরবনের মাটির গুণাগুণ থেকে শুরু করে এক ভয়ানক পরিস্থিতির পর্যায়ে যাবে। কারণ একদিকে বীজের কালো বাজারি যেমন নির্বিচারে চলছে তেমনি অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। প্রথমত বীজ ও সারের কালো বাজারির কথায় আসি, দেশে সরকারি বীজ প্রস্তুতকারী অনেক কোম্পানিই রয়েছে। কিন্তু সেগুলির বেশির ভাগের কোন রক্ষণাবেক্ষণ নেই। তাদের কোন তদারকি নেই। সেই সুযোগে এই ধরণের কোম্পানি গুলো কৃষকদের ঠকায়। যেমন সরকারি নোটিফায়েড বীজ দেখে তবেই যেন কৃষক বাজার থেকে বীজ গুলো কেনে এই নিয়ম। কিন্তু এই নিয়ম যে রয়েছে, কিংবা থাকলেও কৃষক কিভাবে তা দেখবে বা জানবে? এই রকম চর্চা তো কৃষক দের মধ্যে হয় না। তার পরে কোন বীজ যদি এক বছর বিক্রি না হয় তাহলে সেই বীজগুলোকে পরের বছর প্যাকেট পরিবর্তন করে বিভিন্ন প্রকার রং মিশিয়ে আরও চড়া দামে বাজারে বিক্রি করা হয় । ২০২১

সালে রাইদিঘির এক বাজারে গিয়ে শুনি এক ধরণের উন্নত প্রজাতির কেপসিকামের বীজ প্রতি কেজি ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। এবার বলি জমিতে সার ও ক্যামিকেলর (ঔষধ) ব্যবহার সম্পর্কে। এই বীজ গুলোর সাথে এমন কিছু সার ও কেমিক্যালের যেভাবে মাত্রারিক্ত ভাবে ব্যবহার হচ্ছে তা আগামী দিনে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট করে দেবে । অত্যাধিক মাত্রায় সার ও কেমিক্যাল ব্যবহারের ফলে বর্ষার শেষে জমি থেকে জল গড়িয়ে পুকুর, খালে মিশে যায়, এর ফলে সার ও কেমিক্যাল যুক্ত জল যেমন পুকুরের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট করে তেমনি মাটিতে খারের পরিমাণ বহু অংশে বাড়িয়ে দেয়'

কৃষি বিজ্ঞানীর বক্তব্যকে যাচাই করার জন্য বর্ষার মরশুমে স্থানীয় কিছু বাজারে উপস্থিত হয়ে দেখি, একটু বেশি টাকা দিয়ে কৃষক বিগত বছরের রং মেশানো বীজই বেশি কিনছে। কারণ এতে বীজ বিক্রেতা কৃষকদের বিশ্বাস অর্জন করে এই বোলে যে 'এই বীজগুলো কিনলে অন্যান্য বীজের তুলনায় ফলন বেশি হবে। এই বীজ গুলো বিশেষ এক প্রকারের ঔষধ দিয়ে 'শোধন' (বীজের গায়ে বিভিন্ন রং দেখিয়ে) করা থাকে। তাই প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশেও যেমন ঝড়ে গাছ নড়ে গেলে, কিংবা ভারি বর্ষায় গাছের গোড়া জলে ডুবে গেলেও গাছ গুলো মরবে না' এবং প্যাকেটে বা ব্যাগের রং কেমন, বীজের ব্যাগ পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করার জন্য একটু শক্তপোক্ত হাতল আছে কিনা বীজ কেনার সময় এগুলোও কারণ হয়ে থাকে।

এই বীজ কেনার ক্ষেত্রে কৃষক শুধু যে এক বার ঠকে তা নয়। এই বিষয়ে কৃষক মৃত্যুঞ্জয় দাসের সাথে আলোচনার কিছু অংশ তুলে ধরব, 'গতবছর (২০২১) আমি লঙ্কা চাষ করে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা আয় করেছিলাম। তাই এইবার ভাবলাম গত বছরের তুলনায় আরও ভালো করে একটু বেশি চাষ করব। খুব উৎসাহ নিয়ে একদিনের মজুর কামায় করে, কাকদ্বীপের বড়বাজার (যে বাজার থেকে পাইকারি হারে কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা ব্লকের বীজ ব্যবসায়ীরা বীজ এনে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে, যা মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ি থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে) থেকে ৮০০ টাকা দিয়ে ২০০ গ্রাম লঙ্কা বীজ এনে চারা করে গাছ করলাম।[২৪] গতবার

[২৪] গতবারের লাভের আশায় মৃত্যুঞ্জয় এবার অনেক উৎসাহ নিয়ে চাষ করবে ভেবেছিল। তাই বীজের দাম কম হবে ও ঠকবেও না এই আশাকরে বাড়ি থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে প্যাসেঞ্জারি নৌকোয় ও গাড়িতে করে যে বাজার থেকে পাইকারি হারে কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা ব্লকের বীজ ব্যবসায়ীরা বীজ এনে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে, মৃত্যুঞ্জয় সেই বাজার থেকে বীজ কিনে এনেছিল।

আমি ৩০০ লঙ্কার (পিস হিসেবে) চাষ করেছিলাম। এই বার ৮০০ গাছ লাগিয়েছিলাম। গাছের বয়স দেড় থেকে দুমাস হয়ে যাওয়ার পরেও গাছে ফুল ফল আসেনি। পরে যদিও কিছু ফলন হয় তা ঘরে খাওয়ার মতও নয়। এই বছর আমার ক্ষতি হল প্রায় ৩০ হাজার টাকা। কারণ বীজের খরচ, মাটি তৈরি করা থেকে সার ঔষধের খরচ। বাড়িতে থেকে চাষ করব বলে বাইরে খাটতে গেলাম না। এবার বাইরের কাজও গেল আর চাষেও ক্ষতি হল। আমার মতো ছোট চাষিরা আর কোন দিন এই ক্ষতি তুলতে [পুরণ করতে] পারবে না'। তাই চাষ নিয়ে তার হতাশাই তৈরি হল। অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয়ের ৮০০ টাকার বীজে আরও খরচ হল নগদ ১৩ হাজার টাকা। আর এই গাছ গুলোকে বড় করতে তাঁকে যে শ্রম দিতে হয়েছে তার মূল্য ধরলে মোট ২০ হাজারের কম বেশি খরচ হয়েছে। স্বাতী ভট্টাচার্য এবং অশোক সরকারের লেখা, 'ফসলের রাজনীতি বাংলার চাষির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' বইয়ে নবম অধ্যায়ের 'কত বীজে কত ধান' শিরোনামের প্রবন্ধে পূর্ব বর্ধমানের বড় চাষি নান্তু দার কপালে একই ভাগ্য জুটেছিল। নামকরা কোম্পানির ধান বীজের দ্বারা ৫২ বিঘা জমি চাষ করে ৮০ % ধানের শিসে দানাই বসেনি।[২৫] সুন্দরবনের লঙ্কা চাষি মৃত্যুঞ্জয় ও পূর্ব বর্ধমানের ধান চাষি নান্তু দার উচ্চ ফলনশীল বীজের মাধ্যমে বেশি উৎপাদনের আশা নিরাশায় পরিণত হওয়া - এই পর্যন্ত মিল রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ছোট চাষি বর্ষা কালে দু বিঘা জমিতে আমন ধানের চাষ করে আর খরাটির সময়ে জমির আলে কখনো উচ্ছে বা কখনো শশা চাষ করে । গত বছর লঙ্কা চাষ করে ভালো ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা আয় করে। এই উৎসাহে পরের বছর চাষ করে সর্বসাকুল্যে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অপর দিকে নান্তু দা পাকা চাষি, স্থানীয় প্রশাসন ও বীজ কোম্পানির কাছে অভিযোগ জানিয়ে ৫২ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। পরন্ত খরাটির চাষের সময় ফ্রিতে বীজও পেল। মৃত্যুঞ্জয় খরাটিতে আর চাষ করেনি। আমন ধানের কাজ শেষ হলে গ্রামে কাজ থাকলে করে না হলে পরিবার ছেড়ে বাড়ির বাইরে কাজে চলে যায়। কারণ মৃত্যুঞ্জয় ছোট চাষি ব্লকের কোন কৃষি আধিকারিক তাঁকে চেনে না। সেও জানে না বীজের কারণে চাষের ক্ষতি হলে চাষিকে কি করতে হয়।

[২৫] পৃ; ৮৯

রূপান্তরের তাগিদঃ-

এখন আমর কাছে যে প্রশ্নটিই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল তা হল স্থানীয় মানুষের কাছে নদীবাঁধের এই নিরাপত্তাই কি কৃষি উন্নয়নের অন্যতম কারণ? নাকি 'বাইরের' কোন 'শক্তি' বা স্থানীয় অঞ্চলের 'ভেতরের' নির্দিষ্ট কোন (অর্থ-রাজনৈতিক) উপাদান এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে?[২৬] উপরিউক্ত প্রশ্নের আগে ফিরে আসবো সুন্দরবনের মানুষের সাথে উদারনৈতিক অর্থব্যবস্থার সম্পর্কের বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করতে। ১৯৮০ সাল নাগাদ বিশ্ব বাজারে চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় সুন্দরবনেও ব্যপকহারে চাষাবাদ শুরু হয় (বিশেষত উচ্চ সুন্দরবনে)। বস্তুত এই সময় থেকে ক্যানিং, মিনাখা, হিঙ্গলগঞ্জ, বাসন্তী, গোসবা ব্লকগুলিতে চিংড়ির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। (দেখুন, চক্রবর্তী ২০০৮; মুখপাধ্যায় ২০১৬)। এখানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওস্যানোগ্রাফিক স্কুলের অধ্যাপক যিনি দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবনের ওপরে গবেষণা রত প্রফঃ সুগত হাজরার সাথে আমার কথোপকথনের একটি অংশ তুলে ধরবো। ভাঁর মতে 'নব্বয়ের দশক থেকে সুন্দরবনের ক্যানিং ও সংলগ্ন কিছু অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন দেখা যায়। কৃষিতে ছোট ছোট যন্ত্রের ব্যবহার, যেমন পাওয়ারটিলার, শস্যে কীটনাশক ছড়ানোর জন্য উন্নত স্প্রে মেশিনের ব্যবহার, উচ্চ ফলনশীল বীজ, লাভজনক কৃষি উৎপাদন, সাথে গ্রামের অসংগঠিত অর্থনীতির কিছুটা উন্নত করার জন্য লাভজনক ভাবে মাছ ও হাঁসমুরগি (পোল্ট্রি) পালন দেখা যেত। বর্তমানে মাছ ও হাঁসমুরগির চাষের সাথে সাথে জমিতে ধান ও সব্জি উৎপাদনও তুলনামূলক বৃদ্ধি পেয়েছে।' উক্ত বক্তব্যটির সাপেক্ষে আমি এই অঞ্চলের কয়েকজন কৃষক ও ধান ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলার চেষ্টা করি। যেমন পাথরপ্রতিমা ব্লকের একজন মাঝারি কৃষক জীবনকৃষ্ণ দাস তাঁর ৬ বিঘা চাষের জমি রয়েছে। এই কৃষি জমির মধ্যে প্রত্যেকটিতে

---

[২৬] আমি এখানে 'বাইরের' শব্দটি ব্যবহার করেছি এই ভাবে যে কোন একটি প্রথাগত কৃষি সমাজের যখন কোন প্রাকৃতিক ঘটনা বা সরকারী নতুন নীতি প্রণয়নের ফলে কৃষির উন্নয়ন হয় সেই উন্নয়নের জন্য বাইরের কোন প্রভাব বা শক্তি এখানে কাজ করে থাকতে পারে। তা নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শই হোক কিংবা কোন ব্যাবসায়িক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীই হোক। এবং এখানে 'ভেতর' এই শব্দটির মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেছি স্থানীয় অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নের জন্য তাঁদের নিজস্ব চিন্তাধারা কাজ করছিল কিনা। জমিতে উৎপাদন কম হওয়া, দারিদ্র, আর হতাশা থেকে মুক্তির জন্য স্থানীয় মানুষও হয়ত আইলার মতো একটি দুর্যোগকে ব্যবহার করেছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন ।

সমান উৎপাদন না হলেও এখন তিনি প্রত্যেক বছর চাষের মরশুমে বাজার থেকে ধান বীজ কিনে চাষ করেন বেশি উৎপাদনের আশায়। তবে সব জমিতেই উচ্চফলনশীল বীজ দিয়ে চাষ করেন না। যেসব জমি অনুর্বর ও তুলনামূলক কম উৎপাদন হয় সেই জমিতেই বেশি করে উচ্চফলনশীল ধান চাষ করেন। এর কারণ জানতে চাইলে উত্তরে তিনি বলেন ভালো জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করলে মাটির (জমির) গুণাগুণ কমে যায়। এই ভাবে গ্রামের আরও কয়েকজন ছোট বড় ও মাঝারি কৃষকের সাথে কথা বলে বোঝা গেলো এমন একজন চাষিও নেই যিনি জমিতে শুধু মাত্র স্থানীয় বীজের মাধ্যমে চাষাবাদ করতে আগ্রহী।

এবার স্থানীয় ধানের বাজারের কথাই আসা যাক। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সব থেকে বড় ধানের বাজার হল রায়দিঘি। এখানে নামখানা, পাথরপ্রতিমা, সাগর, কাকদ্বীপ, মথুরাপুর ব্লকের বেশির ভাগ ধান এই (রায়দিঘি) বাজারের মাধ্যমে বেচাকেনা হয়। এই বাজারের ধান ব্যবসায়ীর সাথে কথাপোকথনটি' ছিল এই রূপঃ আইলার দু-তিন বছরের পর থেকে প্রতি বছর ধান উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে। কখনো কখনো বাজারে ধানের পরিমাণ এতোটাই বৃদ্ধি পায় যে 'দাম কমিয়ে দিতে হয়'। এর ফলে কৃষকরা বাধ্য হয় কম দামে ধান বিক্রি করতে। ধানের দাম কমার কারণ যে শুধুই এটিই তা নয়। তাঁরা মনে করেন এর জন্য সরকারী 'কৃষাণমান্ডির' মতো নানান কৃষি বিষয়ক নীতিগুলি কেও উল্লেখ করা যায়। কারণ হিসেবে বোঝা গেলো সরকারী এই বিভিন্ন প্রকারের কৃষি বিষয়ক নীতির সুযোগ নিয়ে নতুন করে কিছু ‘প্রতারক গোষ্ঠী' ধান কেনাবেচার ক্ষেত্রে প্রভাব খাটাচ্ছে। কৃষককে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে কৃষাণ মান্ডির কার্ডের মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে ধান কিনে নেয়। এবং ধান বেচাকেনার সময়ে নতুন করে গজে ওঠা এই গোষ্ঠী গুলো বিভিন্ন ভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। সমান্তরাল ভাবে আরেকটি গল্প হল ১৫ বছর ধরে আইলার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি প্রতি মাসে ১৬ কেজি করে চাল পাচ্ছে। এবং পরেরদিকে সরকারি 'খাদ্য সুরক্ষার' চাল যোগ হওয়ায় সরকারের প্রয়োজন হয়ে পড়লো প্রতি ব্লকে একটি করে হিম ঘরের। নতুন এই 'হিম ঘরের মালিক' ও গজে ওঠা প্রতারক গোষ্ঠীর (গুলির) সাথে ধান ব্যবসায়ী ও মিল মালিকের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মিলিত এই গোষ্ঠী যৌথ ভাবে সরকারের মধ্য দিয়ে আইলা ও খাদ্য সুরক্ষা চাল ঘুর পথে পৌছে দেয় জনগণের কাছে। অর্থাৎ স্থানীয় অঞ্চলে ধান উৎপাদন ব্যবস্থায় কিছু 'নতুন প্রতিষ্ঠান’ গড়ে উঠছে। যে প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষক ও রাষ্ট্রের

সম্পর্ক কি নতুন ও ভিন্ন মাত্রা বহন করে না? তাই মনে করি সুন্দরবনের কৃষি উৎপাদন পুরনো ধাঁতে ব্যাখ্যা করলে হবে না। কারণ নতুন করে হিম ঘরের মালিক ও প্রতারক গোষ্ঠীর উত্থান স্থানীয় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করছে। শুধু তাই নয় উচ্চ ফলনশীল ধান বীজের বিভিন্ন কোম্পানির সাথে সাথে ছোট বড় সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর উত্থানও এই যুক্তিকে আরও জোরালো করে তোলে। নতুন পরিস্থিতিতে কৃষকের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কের নিরিখে পুঁজি ও পণ্যের কারবারি দের অবস্থানকে এখন আর এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আমি উল্লেখ করবো উন্নয়ন বিতর্ক' গ্রন্থে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'একুশ শতকে কিষাণ সংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধের। প্রফঃ চট্টোপাধ্যায়ের মূল বক্তব্যের বিষয়বস্তু হল এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে কৃষক সম্প্রদায়ের বিষয়টি নতুন ভাবে ভাবা উচিত। কারণ উন্নত রাষ্ট্র গুলির নাগালের বাইরে বর্তমান এশিয়া তথা তৃতীয় বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই আর অবশিষ্ট নেই। রাষ্ট্রীয় নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমন ভাবে কৌশল করা হয় যেন কৃষক শ্রেণীর কাছে সরকার এখন আর বাইরের কেউ নয়। কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তুকি ব্যবস্থা, কৃষি প্রযুক্তি, সেচ, খাদ্য, পরিবহন, ঋণ মকুব, আরও বিভিন্ন প্রকার জনকল্যাণ কামী নীতি গ্রহণ করে রাষ্ট্র মানুষের অন্দরমহলে প্রবেশ করছে। প্রফঃ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে এখানে আমি একমত পোষণ করি। আমার এম ফিল এর গবেষণার ক্ষেত্রে দেখেছি যে সুন্দরবনে আইলা ক্ষতিগ্রস্ত এমন পরিবার খুব কমই আছে যারা সরকারের কাছ থেকে কম পক্ষে তিনটি প্রকল্পের সুবিধা পায়নি। নিরপেক্ষ ভাবে দেখলে বুঝতে অসুধিরা হয় না এই প্রকল্প গুলোর বাস্তবতা আসলে জনকল্যাণ বা জনপ্রিয় রাজনীতিরই আসল রূপ। আইলা পূর্বে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলো প্রায় অচল ছিল। সেই প্রতিষ্ঠান গুলো (আইলা পরবর্তী সময় থেকে) এখন সচল হতে থাকলো। আরও কিছু নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়। গ্রাম পঞ্চায়েত, বি.ডি.ও, ব্লক কৃষি উন্নয়ন ও ব্লক ভূমি আধিকারিকের কার্যালয় গুলিতে কাজের চাপে স্থানীয় অঞ্চলের শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের 'ঠিকায়' নিয়োগ করতে দেখা গেছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র ও নাগরিকের নতুন এই সম্পর্ক স্থানীয় অঞ্চলের অর্থ-রাজনৈতিক বিষয়টিকে নতুন করে ভাবায়। আরও বেশি করে ভাবায় এই কারণে যে একবিংশ শতাব্দীর ভারতের কৃষি ব্যবস্থা সম্ভবত ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হবে। আর ঠিক এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কৃষক সমাজের সাথে ভারত রাষ্ট্রের নতুন পরিচয়টি। প্রফঃ চট্টোপাধ্যায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেন। তা হল যেহেতু কৃষিজ পণ্য ও জমির কর আধুনিক রাষ্ট্রের রাজস্বের

গুরুত্বপূর্ণ উৎস নয় তাই রাষ্ট্রের সাথে কৃষক সমাজের সরাসরি আদায়ের সম্পর্ক আর গভীর নয়, যা আগে যথেষ্টই ছিল। অর্থাৎ কৃষক সমাজের কাছ থেকে বলপূর্বক কর আদায়ের ইতিহাস সাবেকী কৃষি সমাজের ব্যাখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, যার এখন সেভাবে আরগুরুত্ব নেই। আমার মনে হয় প্রফঃ চট্টোপাধ্যায়ের এই ধারণা যথার্থ নয়। যেখানে আধুনিক রাষ্ট্র প্রত্যেকটি ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠী, লিঙ্গ, শ্রেণী গুলিকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নজরদারী চালায় সেক্ষেত্রে বৃহৎ কৃষক সমাজকে আরও সুক্ষাতিসূক্ষ কৌশলে বাষ্ট্র নীতি ও রাষ্ট্র জ্ঞানের সাথে জড়িয়ে ফেলতে চায়। আইলা পরবর্তী সুন্দরবনে দেখেছি সরকারী ভাবে ক্ষতিপূরণ বা পুনর্গঠনের নাম করে কর, জমির দলিল, পর্চা, জমির সঠিক মাপজোক ও মালিক নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলি সক্রিয় হয়ে উঠতে। কোন কৃষকের ৭ বছর তো কারো আবার ১২ বছর কারো বা ১৫ তো কারো আবার ২০ বছর ধরে কর বাকি। সরকারী নির্দেশ হল আগে বকেয়া কর মেটালে তবেই ক্ষতিপূরণ মিলবে। সুতরাং স্থানীয় অঞ্চলের কৃষক বাধ্য হল বকেয়া কর মেটাতে। এবং এখন এটাই নিয়ম যে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সদস্য, ও সরকারী বিভিন্ন কার্যালয়ের সুযোগসুবিধা পেতে হলে নিয়মিত কর প্রদানের প্রমাণ পত্র দেখাতে হয়। James Scott তাঁর লেখা গ্রন্থ Seeing Like a State এ দেখাচ্ছেন যে আধুনিক রাষ্ট্র বিভিন্ন আইন ও নীতির মাধ্যমে জমিকে নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করে দিচ্ছে। এর ফলে যৌথ চাষাবাদ, কৃষি জমির প্রতি দীর্ঘ দিনের পারিবারিক আত্মিক সম্পর্ক গুলো ভেঙ্গে গিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা। যে উৎপাদন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্র আরও গভীর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার ন্যায় কর আদায়ের জন্য (সামন্ত প্রভুদের) জুলুম না থাকলেও বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্র সুকৌশলে কৃষক সমাজকে আরও বেশি করে জড়িয়ে ফেলে, তা সে শিল্প তৈরির জন্য কৃষকের কাছ থেকে জমি নেওয়ার ক্ষেত্রে হোক, বা ২০০৫ সালের ভারত মার্কিন A.K.I (The USA-India Agricultural Knowledge Initiative 2005 15 january) চুক্তির মাধ্যমে মানসান্টো, আর্চার মিডল্যান্ড, বা ওয়ালমার্ট কোম্পানির কাছে উর্বর জমি নিজে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রেই হোক, আধুনিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। ঠিক এই ভাবে আমি বলতে চাই কোন একটি অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তরের সাথে সাথে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলো যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি পরিবর্তন হয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামোও। গ্রাম ভারতের অর্থনীতি যে কৃষি নির্ভর একথা সবারই জানা। কিন্তু সেই গ্রাম ভারতে কি পরিবর্তন ঘটছে তার নিজস্ব ছন্দে? নাকি

বাইরের কোন শক্তি এই পরিবর্তনে মূল ভূমিকা গ্রহণ করছে? কৃষি সমাজে প্রাথমিক উৎপাদক হল কৃষক। কৃষক নিজের পরিবার বা গোষ্ঠীর জন্য যে খাদ্য উৎপাদন করত তাতে এখন পরিবর্তন ঘটেছে। প্রায় প্রত্যেক কৃষক পরিবারের উৎপাদন এখন বাজার মুখি। একদিকে সরকারী উৎসাহ, উচ্চ ফলনশীল বীজের চাষ, প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি উৎপাদিত ফসল বিক্রি করার জন্য বাজারও এখন দুয়ারে এসে হাজির। আইলা পরবর্তী সুন্দরবনের কৃষি উৎপাদন এই একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামের হাটবারে বাইরের ব্যবসায়িরা পাইকারি হারে সব্জি নিয়ে আসতো (বাইরে থেকে কিনে) বিক্রি করার জন্য। এখনও বাইরের ব্যবসায়িরা আসে তবে সব্জি বিক্রি করতে নয় বরং স্থানীয় হাট থেকে সব্জি কিনে বাইরের বাজারে বিক্রি করতে। বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় যে নতুন এই পরিবেশে গ্রামেরই কিছু মানুষ পাইকারি হারে সব্জি ও ধানের ব্যবসায় হাত পাকিয়েছে। এই ছোট ছোট উপাদান গুলির পরিবর্তন আইলা পরবর্তী কৃষি রূপান্তরের নতুন চরিত্র বহন করে। যে রূপান্তরকে আমরা স্থানীয় কৃষিজ উৎপাদনের 'পণ্যে' রূপান্তর বলতে পারি কিনা সে বিতর্ক উঠতেই পারে। ভারতে বিগত কয়েক দশক ধরে গ্রামের মানুষ শহরে আসারপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই তথ্য আমরা বহু গবেষণা ও সরকারী রিপোর্টে পাই। তার অনেক কারণও রয়েছে। আমি এখানে মূলত দুটি কারণের কথা উল্লেখ করবো, প্রথমত কৃষি এখন আর লাভ দায়ক জীবিকা নয়। দ্বিতীয়ত যুবসমাজের কাছে আরও উপার্জনের আকাঙ্খা।

আইলার পরে গত ১৫-১৬ বছর ধরে আমার ক্ষেত্র সমীক্ষার ছোট ছোট প্রশ্ন ছিল এই যুব সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে বা ভিন দেশে পাড়ি দিচ্ছে। প্রথমত আমি এদেরকে দুভাগে ভাগ করেছি। এক, বড় ও মাঝারি কৃষক এবং দুই, ছোট ও কৃষি শ্রমিক পরিবার হিসেবে। আমি এখানে বড় ও মাঝারি কৃষক বলতে বোঝাতে চাই যেসব পরিবারের ৫ থেকে ১২ বিঘা পর্যন্ত চাষের জমি রয়েছে। এবং অন্য দিকে ছোট ও কৃষি শ্রমিক বলতে বোঝাতে চাই যাদের ৪ থেকে ১ বিঘা জমিও নেই। আমি প্রথমে বড় ও মাঝারি কৃষক শ্রেণীকে নিয়ে উল্লেখ করবো। এই শ্রেণীর মধ্যেই পাকাপাকি ভাবে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে বসবাস করার প্রবণতা বেশি। কারণ গ্রামে তাঁদের 'অন্ন' সংস্থান থাকলেও শিক্ষা ও শহরের জীবনই তাঁদের কাছে প্রথম পছন্দের। এর অনেক গুলি কারণ রয়েছে। অন্তত পক্ষে স্নাতক বা স্নাতক উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী চাকরি বা

নাহলেও কোম্পানির চাকরি করে জীবিকা অর্জনের প্রবণতা রয়েছে। এবং গ্রামে নিজের ভাগের জমি বিক্রি করে ও নিজের উপার্জনের অর্থে গ্রাম ছেড়ে শহরে একটি ছোট ফ্ল্যাট কেনার মতো অর্থের যোগান তাঁদের হয়েছে। অর্থাৎ মোটামোটি আত্মমর্যাদা সম্পূর্ণ ভদ্রগোছের জীবনযাপনকরার আবস্থা হয়েছে। অপরদিকে ছোট কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের এই ব্যাপারটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। মোটামুটি উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক পর্যন্ত পড়াশুনো করে বা অন্য কোন ডিপ্লোমা করে (যেমন কম্পিউটার শেখা) শহরে স্থায়ী ভাবে পাকাপাকি স্থিতু হবে এই ভাবনা তাঁদের মানায় না। কারণ পড়াশুনোর জন্য পরিবারে অর্থ সংস্থান যেমন নেই তেমনি পড়াশুনো করে সময় নষ্ট করার ‘সুযোগও’ তাঁদের নেই। সুযোগ নেই আরও এই কারণে চরম দারিদ্রের মধ্যে পড়াশুনো করেও চাকরি না পেলে জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে । দেখা যায় শহরে এই শ্রেণীর মানুষের যা উপার্জন তা নিজের খরচ ও পরিবারের জন্য ব্যায় বহন করতেই দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তাই আরও বেশি উপার্জন করে শহরে নয় বরং গ্রামেই জমি কেনা বা পাকা বাড়ি বানানো বা ছোটখাটো ব্যাবসা শুরু করার জন্য ভিন্ন কোন রাজ্য বা ভিন্ন কোন দেশে পাড়ি দেয়। গত কয়েক বছরে কৃষি জমি কেনার প্রবণতা এই শ্রেণীর মধ্যেই বেশি রয়েছে। পাথরপ্রতিমা ব্লকের মোট ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে আমি চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখেছি গত একদশকের কিছু বেশি সময়ে ৯০ টিরও বেশি পরিবার জমি কিনেছে যারা হয় ছোট কৃষক না হয় কৃষি শ্রমিক ছিল কিছুদিন আগে পর্যন্ত। আর এই জমি গুলো বিক্রি করেছে বেশির ভাগ বড় কৃষক। কয়েকজন বড় কৃষকের সাথে সাক্ষাৎকারে বোঝা গেল তাঁদের সন্তানরা কৃষি কাজে আগ্রহী নয়, চাষ করে এখন যেমন খরচ আর ওঠে না তেমনি বড় কৃষকের গ্রামে আর প্রভাবপ্রতিপত্তি নেই। তাই জমি বিক্রি করে শহরে জমি কেনা বা ব্যাংকে টাকা জমা রাখাটা তাঁদের কাছে বেশি লাভদায়ক বলে মনে করেন। তাঁদের মতে আর যেহেতু অদূরভবিষ্যতেও এখানকার কৃষির উন্নতির কোন লক্ষণ নেই তাই কৃষির উপরে এই প্রথম শ্রেণীর মানুষের ভরসা নেই বললেই চলে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃষক যারা গ্রামের ছোট কৃষক বা কৃষি শ্রমিক তাঁরা এখন শহর থেকে উপার্জন করেছেন; সম্ভবত এদেরকে প্রফঃ চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখা গ্রন্থ 'The Politics of The Governed' এ 'রাজনৈতিক সমাজ' বলেছেন। গ্রামের এই ছোট কৃষক ও কৃষি শ্রমিক যারা শহরে এসে রেল স্টেশন, ফুটপাথ, বা তথাকথিত ভদ্র সমাজের বাইরে বসবাস করে, সরকারী ইলেক্ট্রিসিটি, জল ও পৌর আইন লঙ্ঘন করে ফুটপাথ দখল করে জীবিকা উপার্জন করে। আমার

মনে হয় এই মানুষজনের শহর থেকে উপার্জন করে শহর তলি বা গ্রামে জমি কিনে বসবাস করার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। কারণ শহরে থাকলেও প্রতিনিয়ত দুরবস্থা এদেরকে গ্রাস করে। কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন, যাদবপুর রেলস্টেশনের ধারে বসবাসকারী কিছু উদবাস্তু পরিবারে ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখেছি নিরাপত্তা হীনতা ও দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার সতত আকুতির জন্য শহর তলি বা গ্রামে জমি কিনে তারা 'নাগরিক সমাজের ন্যায্য দবিদার হতে চায়'। ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখেছি এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কয়েকজন শহর লাগোয়া বারুইপুর, বিধ্যাধরপুর বা নিজেদের গ্রামেও জমি কিনেছেন। তেমনি শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় 'আর্থিক সঞ্চয়ের' দিকটিও নতুন করে ভাবাচ্ছে। গ্রামের একজন শ্রমিক, তা ধান চাষের ক্ষেত্রেই হোক বা পাকা বাড়ি তৈরির কাজেই হোক, পুরুষের ক্ষেত্রে ৫০০ থেকে ৫৫০ ও মহিলার ক্ষেত্রে ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকা পর্যন্ত মজুরী পান। যা শহরে একজন মজুরের থেকে একেবারেই কম নয়। এমনও দেখা গেছে যেখানে একজন ব্যক্তি শহরে দিনে যে অর্থ উপার্জন (অসংগঠিত ক্ষেত্রে) করছে গ্রামের উপার্জনও তার ধারে কাছে রয়েছে। গ্রামে যেটুকু কম উপার্জন এবং শহরে জীবনযাপনের জন্য দৈনিক যে ব্যায় তার তুলামূল্য হিসেব করলে এই শ্রেণীর কাছে গ্রামের জীবনও এখন খুব একটা খারাপ অবস্থায় রয়েছে বলে মনে করেনা অনেকে (যদিও এই সংখ্যার মানুষ খুব কমই দেখা গেছে তবে এই দিকটা যে দেখা যাচ্ছে তা উল্লেখ করতে হয়)। সমাজ তাত্ত্বিক দীপঙ্কর গুপ্ত, তাঁর লেখা প্রবন্ধ 'Whither the Indian village Culture and Agriculture in Rural India' তে দেখিয়েছেন যে গ্রামে বসবাসকারী মানুষ এখন কৃষির বাইরে ভিন্ন জীবিকায় ব্যাপক হারে যুক্ত হচ্ছে। ভারতে এখন প্রায় ৫০% রাজ্যে গ্রামীণ জনসংখ্যার ৪০% এরও বেশী মানুষ কৃষি বহির্ভুত জীবিকায় নিযুক্ত । এবং এই সংখ্যার ক্রমশ বৃদ্ধি ঘটছে। আরেকটা দিক হল এই শ্রেণীর কাছে আত্মমর্যাদার তাগিদ ও স্বাধীন ভাবে জীবনযাপনও গ্রামে জমি কেনার একটি দিক হতে পারে। তাছাড়া বিদ্যুতায়নের ফলে প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে টিভি, এলেক্ট্রিক পাখা, মোবাইল ফোন, রান্নার গ্যাস এই বিষয় গুলো গ্রামকে এখন অনেক পরিবর্তন করছে। বাড়ির চৌকি, গদি, আলমারি, প্লাইউডের শৌখিন জানালা ও দরজা থেকে শুরু করে ভোজ বাড়ি থেকে ছোট খাটো পারিবারিক অনুষ্ঠানে কলা পাতার পরিবর্তে প্লাস্টিকের থালা, গ্লাস, বাটি ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রামে যাতায়াত করার জন্য পুরোনো পায়ে চালানো সাইকেল ও ভ্যানের পরিবর্তে মেশিনভ্যান, টোটো, ও মোটর সাইকেল এরব্যবহার চলছে । কোন কোন গ্রামে ছোটদের ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলও গড়ে উঠেছে।

অর্থাৎ গ্রামের এই পরিবর্তন যে পুঁজির আবির্ভাব তা আজ আর অস্বীকার করার উপায় আছে কি?

দীপঙ্কর গুপ্তের যুক্তি অনুযায়ী বললে বলতে হয়, উদারীকরণের একটি সার্বিক সমান্তরাল গতি রয়েছে বলে যদি আমরা ধরে নিই তাহলে তা সুন্দর বনের জন্য তা আলাদা কিছু নয়। কিন্তু আইলার পরে এই গতি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে তার ফলে উক্ত পরিবর্তন গুলো অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন পথে যে প্রবাহিত হচ্ছে তা আমরা বর্তমান সন্দর্ভের সূচনাতে প্রস্তাব হিসাবে রেখেছি ।

উপসংহার

উপসংহার এর অর্থ, সন্দর্ভে কি উত্তর পেলাম তার বিশ্লেষণ করার সঙ্গে সঙ্গে না পাওয়া উত্তরগুলোর হিসেব কষা। উপসংহার হল নতুন কাজের খসড়ার প্রস্তাব। এই আখ্যানের দীর্ঘ পথে কিছু প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি কিছু পাইনি। সন্দর্ভটির পরিশেষে এসে বলতে হয়, গবেষণা কোনও একক ব্যাক্তির কাজ নয়। মানুষের জীবন প্রবাহ, সমাজের অভিজ্ঞতা ও এই মানুষগুলোর সাথে আমার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিথস্ক্রিয়ায় মিলে এই গবেষণা পত্রটি গড়ে উঠেছে। আমার গবেষণা পত্রটি, আইলা পূর্ব ও পরিবর্তিত অর্থ রাজনীতি ও উন্নয়নের ধারণার সামান্য এক অংশ মাত্র। সন্দর্ভ রচনা ক্ষেত্রে আমারও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমি সব দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি নি, ও সমস্ত যুক্তিকেও সঠিক বিশ্লেষণ করতে পারিনি। এই ব্যর্থতা যা সম্পূর্ণ আমার। তবে এই ব্যর্থতার মধ্যেও আমার সন্দর্ভে যা আলোচনা করার চেষ্টা করলাম তা হল এইরূপ।

রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সাথে দুর্যোগের সম্পর্ক ঠিক কোথায়, দুর্যোগ কি কেবলই ঘটনা না সমাজ তত্ত্বের গভীরে এর বিস্তার, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে দুর্যোগের প্রভাব কি ও তার প্রতিক্রিয়া কি, আবার অন্যদিকে স্থানীয় মানুষজন এর দুর্যোগ সম্বন্ধে এক ধরণের প্রাত্যহিক অনুভূতি কেমন এই প্রশ্ন গুলো ঘুরে ঘুরে এসেছে আমার এই সীমিত প্রচেষ্টায় । রাষ্ট্রীয় আইন, জাতীয় নীতি, দলীয় রাজনীতি, উন্নয়ন এইসবের সাথে দুর্যোগের সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেছি; প্রশ্ন করেছি ‘দুর্যোগ কি পুঁজির উত্থান ঘটাতে পারে? কিংবা দুর্যোগের ফলাফল কি সব ক্ষেত্রেই একই ভূমিকা পালন করে? নাকি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র বহন করে? ছোট ছোট এই প্রশ্নগুলোই আমার সমগ্র সন্দর্ভের মূল পাথেয় ছিল।

যেহেতু সন্দর্ভের মৌলিক জিজ্ঞাসা, পুঁজির উত্থানের ক্ষেত্রে দুর্যোগের ভূমিকা কি, তাই দুর্যোগ শুধুমাত্র একটি ভৌত বা শরীরী ঘটনা হিসাবে এখানে গৌণ চরিত্র বহন করে; তুলনায় (দুর্যোগের) ভূমিকা বা ফলাফলই এখানে মুখ্য বিষয়। এই কারণে দুর্যোগ সম্পর্কে বিষদে ব্যাখায় না গিয়ে সংখিপ্তাকারে আলোচনার চেষ্টা করেছি। এই ক্ষেত্রে দুর্যোগকে যেভাবে দেখেছি, যা ‘এমন একটি পরিস্থিতি বা ঘটনা যা স্থানীয় ব্যবস্থা বা পরিকাঠামোকে ছাপিয়ে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক

সহযোগিতার প্রয়োজন তৈরি করে । এটি এমন একটি অপ্রাত্যাশিত ও আকস্মিক ঘটনা যা মানুষের মানসিক দুর্ভোগ, ব্যাপক ক্ষতি, ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পুনর্গঠনের নামে যে উন্নয়নের যুক্তি আমরা দেখি তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব, প্রভাব বিস্তার কারী দলীয় রাজনীতির, এবং রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলোর ক্ষমতা প্রয়োগের এক হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় ।

এরই প্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করেছি উন্নয়ন কি । আইলা পরবর্তী সময়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের জীবনে কতোটা সক্ষমতা বেড়েছে? এবং এই উন্নয়নের সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের ধারণা কি? এই বিষয়ে জ্যাঁ দ্রেজ ও অমর্ত্য সেনের উন্নয়ন তত্ত্ব, কল্যাণ সান্যালের পুঁজিবাদী অর্থনীতির উত্থান ও উন্নত বিশ্বের উন্নয়নের বিভিন্ন মডেলের সমালোচনাধর্মী আলোচনার পাঠ্য নিয়েছি। Farguson এর উন্নয়নের ধারণার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেছি কিভাবে উন্নত বিশ্ব উন্নয়নের নামে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন শীল দেশগুলোকে অধীনতায় রাখে। কিভাবে উন্নয়নের মডেল চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং এই উন্নয়নের নামে কিভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলোর অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণ, রাজনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। এবং Naomi Kleine এর পুঁজি ও দুর্যোগের মিথস্ক্রিয়ায় কিভাবে পুঁজিবাদের উত্থান ঘটছে তা বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করেছি সুন্দরবনের দুর্যোগ পরবর্তী উন্নয়নের ধরণ/বয়ানকে।

অর্থাৎ আইলা পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের উন্নয়নের যে যুক্তি প্রদান করা হচ্ছে তার দ্বারা স্থানীয় মানুষ কতটা সংপৃক্ত হয়েছে তা আমরা অনুধাবন করেছি। Klein যেমন মনে করেন যে উন্নয়ন নয় বরং দুর্যোগকে একটি ধাক্কা হিসেবে ব্যবহার করে পুঁজিবাদী অর্থনীতি মুনাফা বৃদ্ধির কৌশল তৈরী করে । যেমন Mike Davis তৃতীয় বিশ্বের উৎপত্তির কারণ হিসেবে বলছেন যে কিভাবে উন্নত বিশ্ব ‘জলবায়ু দুর্ঘটনাকে’ একটি দুর্যোগ হিসেবে পরিচালিত করে এবং সেই দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলে উন্নত বিশ্বের উন্নয়নের মডেলকে চাপিয়ে দিয়ে, তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিকে শোষণ করে। এবং যার ফলে উন্নয়নশীল দেশ গুলো অনুন্নত তকমা পেয়ে তৃতীয় বিশ্বের পরিচিতি লাভ করেছে। Camelia Dewan ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে সুন্দরবনের নদীবাঁধের রাজনীতি নিয়ে এক তাত্ত্বিক প্রবন্ধে বলেন যে, কিভাবে ব্রিটিশরা নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলে শস্য উৎপাদন ও রাজস্বের জন্য খাল, ডোবা, নদী নালাকে বাঁধ দিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে বন্যার পরিবেশ

সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন যে যেই অঞ্চলগুলো এক সময়ে নদীর নাব্যতার কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের সক্রিয় কেন্দ্র ছিল, ব্রিটিশরা সেই বাণিজ্যিক আভিজাত্যকে না বুঝতে পেরে তাদের নিজস্ব প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের মাধ্যমে একটি পুঁজিবাদী কাঠামো তৈরি করেছে।

আইলা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। পুনর্গঠনের জন্য সরকার ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে। স্থানীয় অঞ্চলের কৃষক এখন লবণাক্ত জল ও মৃত্তিকা সহনকারী এবং বেশি উৎপাদনের আশায় বিভিন্ন (কৃষিজ) বহুজাতিক কোম্পানির বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবহার করছে। এই বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর নানান প্রকার কৃষিজ দ্রব্যের সাথে স্থানীয় কৃষক পরিচিত হওয়ার ফলে, কৃষক শ্রেণীর মধ্যেও উৎপাদন সম্পর্কে নতুন উৎসাহ দেখা দিয়েছে । কোম্পানির বিভিন্ন প্রকার এজেন্সি, যেমন স্থানীয় কৃষি রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতা ও খুব সামান্য বেতনে নিয়োগ করা স্থানীয় কিছু কর্মী যাদেরকে কোম্পানি সরাসরি নিয়োগ করে তাদের প্রসার ঘটেছে। এই এজেন্সি গুলো কৃষকের সাথে দৈনিক যোগাযোগ বজায় রাখে। নতুন নতুন বীজ, সার ও কীটনাশকের দ্বারা উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে কৃষকের নিজস্ব প্রচলিত জ্ঞানের পরিবর্তন হতে থাকে। এই ভাবে ধীরে ধীরে স্থানীয় অঞ্চলের কৃষক শ্রেণীর মধ্যে তাদের পুরনো কৃষি সংস্কৃতির বদল হয়।

দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত নদী বাঁধ মেরামতকে কেন্দ্র করে সরকার ও স্থানীয় মানুষ উভয় পক্ষ এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কারণ ক্ষতিগ্রস্ত নদী বাঁধ মেরামতের জন্য ব্যাপক পরিমাণ জমির প্রয়োজন ছিল। সরকার সিদ্ধান্ত নেয় স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করে বাঁধ মেরামতের প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ শুরু হলে কতগুলো মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এবং এই মৌলিক প্রশ্নগুলো রাষ্ট্র ও স্থানীয় পরিবারগুলোর কাছে যেমন ‘নতুন ও ভিন্ন’ অভিজ্ঞতা, তেমনি সুন্দরবনের বসতি, প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থা ও এই সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের সাথে স্থানীয় মানুষের সম্পর্ক, এই রূপ নানান জটিল সমস্যার উৎসও বটে। প্রথমত এই ক্ষেত্রে যে অনিবার্য প্রশ্ন গুলো উঠে আসে তা হল সরকার “ক্ষতিপূরণ” কাকে দেবে এবং কিভাবে দেবে? জমির মালিক কে? ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখেছি (বিশেষ করে নিম্ন সুন্দরবনে) এই ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে সুন্দরবনের প্রত্যেক (বড়, মাঝারি ও ছোট কৃষক যাদের নামে কিছু জমি

আছে) পরিবার নতুন করে তাঁদের জমির সঠিক 'নথিভুক্তি' (জমির রেজিস্ট্রি) করণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করেছে। কারণ ক্ষতিপূরণের প্রথম 'শর্ত' ছিল পরিবারগুলোকে নির্দিষ্ট জমির জন্য নির্দিষ্ট পর্চা ও দলিল দেখাতে হবে ও বকেয়া খাজনা পূরণ করতে হবে। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের স্থানীয় পরিবারগুলোর মধ্যে জমির নির্দিষ্ট নথিভুক্তিকরণ, খাজনা প্রদান ও জমি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আইন কানুন সম্পর্কে নতুন আশংকা ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। অর্থাৎ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উন্নয়নের যুক্তিতে নতুন করে রাষ্ট্রের উপস্থিতির ফলে স্থানীয় অঞ্চলের 'প্রচলিত জ্ঞানের' সাথে রাষ্ট্রীয় 'বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের' দ্বন্দ্বতৈরি করে এক 'নতুন ভাষ্য'। আর এই ভাষ্য তৈরি করে সুন্দরবন সম্পর্কে নতুন 'পরিচিতি'।

ব্লকের কৃষি উৎপাদনে যেসব পরিবর্তন গুলো হলঃ-

আমার ক্ষেত্র সমীক্ষার চারটি মৌজার মধ্যে মূল ভূমির দুটি মৌজার (দিগম্বর পুর ও পার্বতী পুর) ক্ষেত্রে কৃষি পরিবর্তন বেশি দেখা যায় নি। যতটা পরিবর্তন হয়েছে ব্লকের উপকূলীয় দুটি মৌজার (কৃষ্ণদাসপুর গবিন্দপুর মৌজা) ক্ষেত্রে। যেমন মূলভূমির মৌজাগুলোর ক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে গরুর নাঙলের ব্যবহার এখানে কমে গেলেও আনুমানিক শতকরা ১০ টি কৃষি পরিবারে এখনো দেখা যায়। কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা এখানে তুলনায় কম। কারণ এই দুটো মৌজা থেকে অভিবাসনের তথ্য কম পাওয়া গেছে। এখানে জমিতেই শীতকালে সব্জি চাষের প্রচলন রয়েছে। তবে উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার এই মৌজাগুলোতে আগে থেকেই রয়েছে। কারণ এই দুটো মৌজায় মোট তিনটি শ্যালো মেশিনের মাধ্যমে কৃষিতে জল সেচ দেওয়া হত। এই মৌজাগুলোতে আইলার পর থেকে শীতকালীন জমিতে ডাল শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় ব্লকের মূল ভূমির এই দুটো মৌজায় কৃষক পরিবারগুলো তুলনায় স্বচ্ছল।

অপর দিকে ব্লকের উপকূলীয় মৌজাগুলোর কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন চোখে পড়ে। কৃষি উৎপাদনের প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে গরুর নাঙল এই দুটো মৌজার একটি কৃষক পরিবারেও দেখা যায়নি। আইলা পরবর্তী এই দুটো মৌজায় কৃষির উপকরণের ক্ষেত্রে বর্তমানে পাওর টিলার

ও ট্রাক্টরের মাধ্যমে জমিতে নাঙল দেওয়া হয়। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সাবেকী পদ্ধতির পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন আইলার আগে কৃষক জমির উর্বরতার জন্য বাড়ির পচে যাওয়া খড়, ছাই, গোবর ইত্যাদির ব্যবহারের পরিবর্তে এখন একদিনেই হাল করে ঐ দিনেই বাজারের ডি.এ.পি, ইউরিয়া সার এক সাথে মিশিয়ে তা জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে ধান গাছ রোপণ করা দেয়।

এই মৌজাগুলোতে কৃষির উৎপাদন ক্ষেত্রে উচ্চফলনশীল বীজ, সার, কীটনাশকের ব্যবহার অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আইলার আগে গড়ে ১০০ জন কৃষকের মধ্যে ১৫ থেকে ২০ জন উচ্চফলনশীল বীজের মাধ্যমে চাষ করত। তাও বছরে মোট যে বীজ ব্যবহার হত তার খুবই কম অংশে। বর্তমানে কৃষক পরিবার বিগত বছরের শস্যবীজ সংরক্ষণ করে পরের বছর ফসল ফলাবে, স্থানীয় অঞ্চলে কৃষকের এই ভাবনা বর্তমানে অতীত। বর্তমানে প্রত্যেকটি কৃষক পরিবার বাজার থেকে বীজ কিনে শস্য উৎপাদন করছে। অর্থাৎ আইলার আগে পর্যন্ত স্থানীয় কৃষকদের উচ্চফলনশীল বীজ সম্পর্কে যে অনীহা ছিল, এখন তা আর নেই। কারণ কৃষি উৎপাদন এখন বাণিজ্যিক রূপ নিয়েছে। এক সময়ে এই কৃষক শ্রেণীর ধারণা ছিল, বাজার থেকে কেনা বীজে 'অনেক ক্ষতি হয়', এই বীজের শস্যে গুণ নেই, ভাত নরম হয়ে যায়, ফেন ঝরে না, পোকা ধরে। তাছাড়া পরিবারের এই খাদ্য শস্য ব্যবহার করলে রোগে ধরে যাবে তার পর খরচও বেশি। বর্তমানে কৃষক আর এই কথা গুলো বলে না। এখন বাজারের চাহিদানুযায়ি চকচকে, পরিপূর্ণ, শস্যের চাহিদা । যার কারণে শস্যের অধিক উৎপাদনের আশায় মাত্রারিক্ত সার ও কীটনাশকের ব্যবহার হচ্ছে । আইলার আগে এখানে কৃষক বিঘা প্রতি ইউরিয়া ব্যবহার করত ৩ থেকে ৫ কেজি। বর্তমান যা ৮ থেকে ১৪ কেজি পর্যন্ত ব্যবহার করছে।

আইলা দুর্যোগের ফলে স্থানীয় অঞ্চলের মানুষ ব্যাপক অভিবাসনের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে শ্রমিকের অভাব দেখা যায়। যার ফলে কৃষি শ্রমিকের চাহিদার কারণে শ্রমমুল্য অনেকটাি বৃদ্ধি পায়। এই ক্ষেত্রে পাশাপাশি ব্লকের যেমন সাগর, নামখানা, রায় দিঘির শ্রমমুল্য যথাক্রমে ৪০০-৪৫০ (দু বেলা খাওয়ার দিয়ে), ৪২০-৪৮০, ৪০০-৪৮০। আর পাথরপ্রাতিমার বর্তমান শ্রমমুল্য, ৫০০-৫৫০ (পুরুষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে) ও ৪৩০-৪৫০ (মহিলা শ্রমিকের ক্ষেত্রে)।

আইলার ফলে স্থানীয় অঞ্চলে অকৃষি জীবিকা কমে যাওয়ায় এই অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। তাহল পরিযায়ী কৃষি শ্রমিকের অভাব। বর্তমানে স্থানীয় অঞ্চলের কর্মঠ

মানুষ বাড়ির বাইরে গিয়ে সেখানেই স্থিতু হচ্ছে, যদিও কয়েকটি প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে আইলার সময়ে বাড়ি ছেড়ে যাওয়া মানুষগুলো মহামারির সময়ে গ্রামে ফিরে এসেছে। তা হয়ত কিছুটা সত্য হলেও পূর্ণ সত্য নয়। কারণ তাঁদের পুনরায় বাড়ির বাইরে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রের কৃষি শ্রমিকের ৬ মাস বাড়িতে থাকা ও ৬ মাস বাড়ির বাইরে কালযাপন, কৃষি উৎপাদনের এই সামগ্রিক চিত্র পরিবর্তন হচ্ছে।

সর্বোপরি কৃষি এখন বাণিজ্যিক উৎপাদনে পরিণত হয়েছে। অধিক লাভের আশায় ব্যাপক উচ্চফলনশীল বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মোট উৎপাদন এখন প্রায় দ্বিগুণের থেকেও বেড়েছে। আইলার আগে একবিঘা জমিতে গড়ে ধান উৎপাদন হত ৩-৮ মন (৪০ কেজি করে এক মন ধরে) পর্যন্ত। বর্তমানে যা গড়ে ১০ -২২ মন পর্যন্ত বেড়েছে। তেমনি খরচ বেড়েছে বহুগুণ। আগে খরচ হত গড়ে এক বিঘা জমিতে ২ থেকে ৪ হাজার টাকা। বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৫-৬ থেকে ৮-৯ হাজার টাকা।

এই পরিবর্তনের সাথে স্থানীয় অঞ্চলের ভূমির ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। যা আমি গবেষণা পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আমি অধ্যায় গুলোতে আলোকপাত করেছি, আইলা প্রকল্পের নদীর বাঁধ মেরামতের জন্য সরকারকে জমি অধিগ্রহণ করতে হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায় স্থানীয় অঞ্চলের পরিবারগুলোর কৃষি জমির প্রায় ৬৫-৭০% জমির সঠিক নথী ছিলনা। বর্তমানে এখন প্রায় প্রতি পরিবার উকিল-মহরি, ভূমি দপ্তরের মাধ্যমে জমির সঠিক পর্চা, দলিল ইত্যাদি সংক্রান্ত জটিলতা সমাধান করার চেষ্টা করছে। যার ফলে স্থানীয় অঞ্চলে ভূমি ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন এসেছে। পারস্পারিক জমির সীমানা বরাবর শক্তপোক্ত আল দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারি সঠিক আইন মেনে জমির বিনিময় করাও আর একটি প্রবণতা। এইসব কারণগুলোর জন্য জমির বাজার মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি তৃতীয় অধ্যায়ে বোঝার চেষ্টা করেছি আইলা পরবর্তী পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের চালচিত্র।

আইলা পূর্ব পুনর্গঠনের প্রশ্নে সুন্দরবনে কিছুক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নতি হয়েছে তা বিশেষ করে নদী বাঁধের ক্ষেত্রে বলা যায়। আগের তুলনায় এখন বাঁধ কিছুটা উঁচু, চওড়া ও শক্তপোক্ত হয়েছে। এর ফলে সুন্দরবন বাসীর জীবন ও জীবীকার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও নিরাপত্তা জুগিয়েছে। তাছাড়া গ্রামের ভেতরে রাস্তা গুলোর অবকাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে। এই চিত্রের পাশাপাশি

উন্নয়নের কালো অধ্যায়ের দিকটিও সমান্তরাল ভাবে রয়েছে। নদী বাঁধের মেরামতের জন্য, ‘আইলা প্রকল্প’ নামে সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছিল তা সার্বিক ভাবে ব্যর্থ একটি প্রকল্প। আমি তৃতীয় অধ্যায়ে তা বিস্তারিত ভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে উন্নত বিশ্বের উন্নয়নের যে মডেল এবং তার ফলে যে রাজনৈতিক আধিপত্য ও অর্থনৈতিক শোষণ চলে, তার পরিবর্তে উন্নয়নশীল দেশ গুলোর উন্নয়নের নিজস্ব মডেল ব্যবহার করার কথা ভাবা প্রয়োজন । যেখানে স্থানীয় ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের বিনিময়ের মাধ্যমে উন্নয়ন মডেল পরিচালিত হবে। এবং আমি মনে করি সুন্দরবনের কৃষিকে অর্থকরী প্রয়াস হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সুন্দরবনের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানানসই উন্নয়ন মডেল তৈরি করা যেতে পারে। এর জন্য সুন্দরবনের ছোটখাট নদি নালার সংস্কার করে পরিবাশ-বান্ধব যান চলাচল বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এবং সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম গুলোকে কেন্দ্র করে কয়েকটি খাল তৈরি করা যেতে পারে। যার সাহায্যে উক্ত অঞ্চলের কৃষক ও মৎস্য চাষিরা দৈনিক শহরে এসে তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলোকে বিক্রি করতে পারে। আমার মতে তাহলে সুন্দর বনের অর্থনীতিতে স্থানীয় মানুষ নিজেরাই ি নিজেদের দ্বারা স্বনির্ভর হতে পারে বলে মনে করি। এছাড়াও প্রচলিত উন্নয়ন মডেলের পরিবর্তে ‘উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণের’ নিয়ে পরিকল্পনা করা যেতে পারে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ‘ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের’ মাধ্যমে যদি ‘স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন’ পরিচালনা করা যায়, তাহলে এই আশাও করতে পারি উন্নয়নের পশ্চিমা মডেলের পরিবর্তে ভারত তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলোর ক্ষেত্রে যদি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ন্যায় ‘স্থানীয় বিকেন্দ্রি-কৃত উন্নয়ন’ সম্পর্কে ভাবা যায় তাহলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষমতা-লিপ্সু রাজনীতির প্রভাব কিছুটা হলেও কমবে বলে আশা করি।

তথ্যপঞ্জী

Aangri, Abdelhaq, et al. "Predicting Shoreline Change for the Agadir and Taghazout Coasts (Morocco)." Journal of Coastal Research, vol. 38, no. 5, 2022, pp. 937–950.

Abel, Martin E. “Agriculture in India in the 1970s.” Economic and Political Weekly, vol. 5, no. 13, 28 Mar. 1970, pp. A5, A7–A9, A11–A14.

Adams, Kevin M., et al. Climate Change, Trade, and Global Food Security: A Global Assessment of Transboundary Climate Risks in Agricultural Commodity Flows. Stockholm Environment Institute, 2021.

Adams, Kevin M., Magnus Benzie, Simon Croft, and Sebastian Sadowski. Climate Change, Trade, and Global Food Security: A Global Assessment of Transboundary Climate Risks in Agricultural Commodity Flows. Stockholm Environment Institute, 2021.

Aditya, Mukherjee, and Mridula Mukherjee. “Imperialism and Growth of Indian Capitalism in Twentieth Century.” Economic and Political Weekly, vol. 23, no. 11, 12 Mar. 1988, pp. 531–546.

Adve, Nagraj. “The IPCC’s ‘Summary for Policymakers’: A Comment.” Economic and Political Weekly, vol. 49, no. 2, 11 Jan. 2014, pp. 12–14.

Agarwal, Bina. “Rethinking Agricultural Production Collectivities.” Economic and Political Weekly, vol. 45, no. 9, 27 Feb.–5 Mar. 2010, pp. 64–78.

Bandyopadhyay, Sunando. Sundarban: A Review of Evolution & Geomorphology. Final Draft, World Bank & IWA Sundarban Joint Narrative, Department of Geography, University of Calcutta, 25 June 2025.

Aneeja, G. “Women on and off Farms: Building Links.” Economic and Political Weekly, vol. 36, no. 2, 13–19 Jan. 2001, pp. 103–104.

Arnold, David. “An Imperial Disaster: The Bengal Cyclone of 1876.” Environment and History, vol. 9, no. 2, May 2003, pp. 187–204.

Arnold, David. An Imperial Disaster: The Bengal Cyclone of 1876. Unpublished manuscript.

Bagchi, Emon. “Development of Basic Infrastructure: An Analysis of South 24 Parganas District in West Bengal, India.” Bulletin of Geography. Socio–Economic Series, no. 36, 2017, pp. 33–60.

Balakrishnan, Pulapre. “The Recovery of India: Economic Growth in the Nehru Era.” Economic and Political Weekly, vol. 42, no. 45/46, 10–23 Nov. 2007, pp. 52–66.

Banaji, Jairus. "For a Theory of Colonial Modes of Production." Economic and Political Weekly, vol. 7, no. 52, 23 Dec. 1972, pp. 2498–2502.

Bandyopadhyay, D. “Can Sundarbans Be Saved?” Economic and Political Weekly, vol. 35, no. 45, 4–10 Nov. 2000, pp. 3925–28.

Bandyopadhyay, Sunando. Sundarban: A Review of Evolution & Geomorphology. World Bank Group / IWA Sundarban Joint Narrative, Final Draft, Department of Geography, University of Calcutta.

Barraclough, Solon L. “Agricultural Policy and Land Reform.” Journal of Political Economy, vol. 78, no. 4, part 2, July–Aug. 1970, pp. 906–947. The University of Chicago Press,

Basu, Pranab Kanti. “Political Economy of Land Grab.” Economic and Political Weekly, vol. 42, no. 14, 7–13 Apr. 2007, pp. 1281–1287.

Bell, Clive. “Reforming Property Rights in Land and Tenancy.” The World Bank Research Observer, vol. 5, no. 2, July 1990, pp. 143–166.

Bhalla, G. S. “Peasant Movement and Agrarian Change in India.” Social Scientist, vol. 11, no. 8, Aug. 1983, pp. 39–57.

Bhalla, G. S., and Gurmail Singh. "Recent Developments in Indian Agriculture: A State Level Analysis." Economic and Political Weekly, vol. 32, no. 13, 29 Mar.–4 Apr. 1997, pp. A2–A18.

Bhalla, G. S., and Gurmail Singh. “Economic Liberalisation and Indian Agriculture: A Statewise Analysis.” Economic and Political Weekly, vol. 44, no. 52, 26 Dec. 2009–1 Jan. 2010, pp. 34–44.

Bhatta, Ramachandra. “Conserving Coastal Resources: Stakeholders vs Policy-Makers.” Economic and Political Weekly, vol. 39, no. 6, 7–13 Feb. 2004, pp. 529–532.

Bhattacharyya, Dwaipayan. “Of Control and Factions: The Changing ‘Party-Society’ in Rural West Bengal.” Economic and Political Weekly, vol. 44, no. 9, 28 Feb.–6 Mar. 2009, pp. 59–69.

Bhattacharyya, Dwaipayan. Government as Practice: Democratic Left in a Transforming India. Cambridge University Press, 2016.

Bhowmick, Utsab, et al. “Revitalising Agriculture in South 24 Parganas: Strategies for Sustainable Farming and Direct Sales.” Uluberia Government Polytechnic, 2023.

Binswanger-Mkhize, Hans P. “The Stunted Structural Transformation of the Indian Economy: Agriculture, Manufacturing and the Rural Non-Farm Sector.” Economic and Political Weekly, vol. 48, no. 26/27, 29 June–6 July 2013, pp. 5–13.

Biswas, Manohar Mouli. “Why Dalits in West Bengal Are on Protest.” Round Table India, 21 Dec. 2010.

Blair, Harry W. "Local Government and Rural Development in the Bengal Sundarbans: An Inquiry in Managing Common Property Resources." Agriculture and Human Values, vol. 7, no. 2, Spring 1990, pp. 40–51.

Bosello, Francesco, and Enrica De Cian. Climate Change, Sea Level Rise, and Coastal Disasters: A Review of Modeling Practices. Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), 2013.

Bureau of Applied Economics and Statistics, Government of West Bengal. District Statistical Handbook: South 24 Parganas 2009. Govt. of West Bengal, 2012.

Bureau of Applied Economics and Statistics, Government of West Bengal. Districtwise Estimates of Yield Rate and Production of Nineteen Major Crops of West Bengal during 2010–11 to 2012–13. Dept. of Statistics and Programme Implementation, 2015.

Cagliarini, Adam, and Anthony Rush. “Economic Development and Agriculture in India.” Reserve Bank of Australia Bulletin, June Quarter 2011, pp. 15–22.

Chand, Ramesh, Pramod Joshi, and Shyam Khadka, editors. Indian Agriculture Towards 2030: Pathways for Enhancing Farmers’ Income, Nutritional Security and Sustainable Food and Farm Systems. Springer, 2022.

Chand, Ramesh, S. S. Raju, and L. M. Pandey. “Growth Crisis in Agriculture: Severity and Options at National and State Levels.” Economic and Political Weekly, vol. 42, no. 26, 30 Jun.–6 Jul. 2007, pp. 2528–2533.

Chatterjee, Partha. “Democracy and Economic Transformation in India.” Economic and Political Weekly, vol. 43, no. 16, 19–25 Apr. 2008, pp. 53–62.

Chattopadhyay, Suhas. “Operation Barga: A Comment.” Economic and Political Weekly, vol. 14, no. 49, 8 Dec. 1979, pp. 2022–2024.

Chaudhuri, Binay Bhushan. Growth of Commercial Agriculture in Bengal—1859–1885.

Chauhan, Preeti, and Paramjeet Singh. “Nonadanga Slum-Dwellers Attacked.” Economic and Political Weekly, vol. 47, no. 16, 21 Apr. 2012, p. 4.

Cheville, Norman F. Pioneer Scientists and the Great Animal Plagues. Purdue University Press, 2021.

Chowdhooree, Imon, and Shams Mansoor Ghani. External Interventions for Disaster Risk Reduction: Impacts on Local Communities. Springer Singapore, 2020.

Cooper, Frederick. From Slaves to Squatters: Plantation Labor and Agriculture in Zanzibar and Coastal Kenya, 1890–1925. Yale University Press, 1999.

D.N. “Political Economy of the Nehru Era.” Economic and Political Weekly, vol. 23, no. 45/47, Nov. 1988, pp. 2459–2462.

Das, A., D. Basu, and R. Goswami. “Targeting Extension Intervention for Promotion of Sunflower Productivity in Coastal Saline Zone of West Bengal.” Journal of Crop and Weed, vol. 5, no. 1, 2009, pp. 115–119.

Das, Debarshi. "A Relook at the Bengal Famine." Economic and Political Weekly, vol. 43, no. 31, 2–8 Aug. 2008, pp. 59–64.

Das, Kumar. “Social Mobilisation for Rehabilitation: Relief Work in Cyclone-Affected Orissa.” Economic and Political Weekly, vol. 37, no. 48, 30 Nov.–6 Dec. 2002, pp. 4784–4788.

Dasgupta, Biplab. “India’s Green Revolution.” Economic and Political Weekly, vol. 12, no. 6/8, Feb. 1977, pp. 241–260.

Department of Agriculture & Farmers Welfare. Annual Report 2021–22. Government of India, 2022.

Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India. Economics of Cropping System. Directorate of Economics and Statistics, 2008.

Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Government of India. All India Report on Agriculture Census 2015–16. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, 2020.

Department of Environment and Geology, Government of West Bengal. District Survey Report: South 24 Parganas. 2017.

Dhara, Satyajit, and Ashis Kr. Paul. “Status of Agriculture: A Case Study at Patharpratima Block of South 24 Parganas District.” International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, vol. 3, no. 2, Feb. 2016, pp. 238–245.

Dhara, Satyajit, and Dr. Ashis Kr. Paul. “Status of Agriculture: A Case Study at Patharpratima Block of South 24 Parganas District.” International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, vol. 3, no. 2, Feb. 2016.

District Census Handbook: South Twenty-Four Parganas. Series-20, Part XII-B, Census of India, Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011.

District Human Development Report: South 24 Parganas. Development and Planning Department, Government of West Bengal, 2009.

Dore, R. P. “Beyond the Land Reform: Japan's Agricultural Prospect.” Pacific Affairs, vol. 36, no. 3, Autumn 1963, pp. 265–276.

Dutta, Shubhamoy, editor. Politics, Power and Poverty: Twenty Years of Peasant Politics in Bengal. Institute of Development Studies Kolkata, 2002.

Evans, Sterling. “The 'Age of Agricultural Ignorance': Trends and Concerns for Agriculture Knee-Deep into the Twenty-First Century.” Agricultural History, vol. 93, no. 1, Winter 2019, pp. 4–34. Agricultural History Society.

Food and Agriculture Organization (FAO). The Impact of Natural Hazards and Disasters on Agriculture and Food Security and Nutrition: A Call for Action to Build Resilient Livelihoods. May 2015.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO Report 2021–22. FAO, 2022.

Gajjar, Sumetee. Nature-Based Solutions to Climate Change in Coastal Cities. South African Institute of International Affairs, 2020.

Ghosh, Soumen, and Biswaranjan Mistri. “Coastal Agriculture and Its Challenges: A Case Study in Gosaba Island, Sundarban, India.” Space and Culture, India, vol. 8, no. 2, 2020, pp. 140–154.

Gidwani, Vinay. Capital, Interrupted: Agrarian Development and the Politics of Work in India. University of Minnesota Press, 2008.

Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. Annual Report 2022–23. Department of Agriculture & Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi.

Government of India, Ministry of Statistics & Programme Implementation. All India Report on Improvement of Crop Statistics (ICS) 2018–19. National Statistical Office, Field Operations Division, Agriculture Statistics Headquarters, Faridabad, 2019.

Government of India. Agrarian Distress in Sundarbans. Rajya Sabha Unstarred Question No. 2574, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, 25 Mar. 2022.

Government of India. Agricultural Statistics at a Glance - 2021. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Directorate of Economics and Statistics, 2021.

Government of India. Agriculture Contingency Plan for District: South 24-Parganas, West Bengal. ICAR & CRIDA, 31 Dec. 2011.

Government of India. Economic Survey 2023–24. Ministry of Finance, 22 July 2024.

Guha, Ranajit, editor. A Subaltern Studies Reader, 1986–1995. University of Minnesota Press, 1997. Based on file: Ranajit Guha - A Subaltern Studies Reader (1997).

Guha, Ranajit. A Rule of Property for Bengal: An Essay on the Idea of Permanent Settlement. Duke University Press, 1996. Originally published 1963.

Guhathakurta, Meghna, and Willem van Schendel, editors. The Bangladesh Reader: History, Culture, Politics. Duke University Press, 2013.

Gulati, Ashok, and A. N. Sharma. "Subsidising Agriculture: A Cross Country View." Economic and Political Weekly, vol. 27, no. 39, 26 Sept. 1992, pp. A106–A116.

Gulati, Ashok, and Anil Sharma. "Subsidy Syndrome in Indian Agriculture." Economic and Political Weekly, vol. 30, no. 39, 30 Sept. 1995, pp. A93–A102.

Gupta, Akhil, and James Ferguson, editors. Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science. University of California Press, 1997.

Gupta, Akhilesh, and H. Pathak, editors. Climate Change and Agriculture in India. Department of Science and Technology, Government of India, Jan. 2016.

Gupta, Subhadip, and Gargi Sarkar. "Climate Change and Economic Adaptability of Indian Sunderban." International Journal of Science and Research (IJSR), vol. 3, no. 10, Oct. 2014, pp. 105–112.

Gupta, Subhadip, and Gargi Sarkar. "Climate Change and Economic Adaptability of Indian Sunderban." International Journal of Science and Research (IJSR).

Handbook of the District Census: 24-Parganas, 1951. Census of India, Government of India, 1954. Compiled by Asok Mitra.

Harriss-White, Barbara. “West Bengal’s Rural Commercial Capital.” International Critical Thought, vol. 3, no. 1, 2013, pp. 20–42.

Hasan, Ali. “The Famine of 1943 in Vikrampur Dacca.” Bangladesh Historical Studies, vol. 5, no. 2, 1987, pp. 113–132.

Hasan, Md Kamrul, and Lalit Kumar. “Changes in Coastal Farming Systems in a Changing Climate in Bangladesh.” Regional Environmental Change, vol. 22, 2022, article no. 113.

Hazra, Sugata, et al. "Sustainability of Coastal Agriculture under Climate Change in the Indian Sundarbans." Sustainability, vol. 11, no. 7200, 2019.

Hunter, W. W. A Revenue History of the Sundarbans. Government of India Press, year not specified.

ICAR – Central Coastal Agricultural Research Institute. Coastal Agricultural Resource Inventory. ICAR-CCARI, Old Goa, Goa, India, 2021.

If this is the correct article: Hazra, Sugata, et al. "Sustainability of Coastal Agriculture under Climate Change in the Indian Sundarbans." Sustainability, vol. 11, no. 7200, 2019.

Institute for Defence Studies & Analyses and Observer Research Foundation. Vision for the Sundarban Region. World Bank Document, 2017.

International Institute for Population Sciences (IIPS), and ICF. National Family Health Survey (NFHS)-5, State and District Fact Sheets: West Bengal. IIPS, 2020.

Irshad, S. Mohammed, and Jacquleen Joseph. “An Invisible Disaster: Endosulfan Tragedy of Kerala.” Economic and Political Weekly, vol. 50, no. 11, 14 Mar. 2015, pp. 61–65.

Islam, Md. Saiful. Operation Borga. Unpublished manuscript.“The Coming Crisis in West Bengal.” Economic and Political Weekly, vol. 44, no. 9, 28 Feb.–6 Mar. 2009, pp. 42–45.

Jha, Rajiv. “The Analytics of the Agriculture-Industry Relationship in a Closed Economy: A Case Study of India.” Economic and Political Weekly, vol. 45, no. 17, 24–30 Apr. 2010, pp. 94–98.

Jodhka, Surinder S. “Agrarian Changes in the Times of (Neo-liberal) ‘Crises’: Revisiting Attached Labour in Haryana.” Economic and Political Weekly, vol. 47, no. 26/27, 30 June–7 July 2012, pp. 5–11, 13.

Kapur, Anu. “Insensitive India: Attitudes towards Disaster Prevention and Management.” Economic and Political Weekly, vol. 40, no. 42, 15–21 Oct. 2005, pp. 4551–4560.

Kapur, Devesh, et al. “Climate Change: India’s Options.” Economic and Political Weekly, vol. 44, no. 31, 1–7 Aug. 2009, pp. 34–42.

Kim, Inhan. “Security Trumps Ideology: Comparison of Land Reforms in Japan and South Korea during the U.S. Military Occupation.” The Journal of American-East Asian Relations, vol. 23, no. 2, 2016, pp. 121–143.

Klein, Naomi. “The Rise of Disaster Capitalism.” The Nation, 14 Apr. 2005.

Klein, Naomi. Formation of Disaster Capitalism. Bengali adaptation/translation. Unpublished Omvedt, Gail. “Capitalist Agriculture and Rural India.” Understanding Indian Society: Past and Present, edited by B. S. Baviskar and Tulsi Patel, Orient Blackswan, 2011, pp. 175–190.

Klein, Naomi. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. Allen Lane / Penguin Books, 2007.

Kumar, K. S. Kavi, and Jyoti Parikh. “Socio-economic Impacts of Climate Change on Indian Agriculture.” International Review of Environmental Strategies, vol. 2, no. 2, 2001, pp. 277–93.

Kumar, K. S. Kavi, et al. “Economics of Climate Change Adaptation in India.” Economic and Political Weekly, vol. 45, no. 18, 1–7 May 2010, pp. 25, 27–29.

Kumar, K. S. Kavi. “Climate Change Studies in Indian Agriculture.” Economic and Political Weekly, vol. 42, no. 45/46, 10–23 Nov. 2007, pp. 13, 15–18.

Kumar, Srikant. “The Regional Development and Planning in Sundarbans: A Comprehensive Analysis of South 24 Pargana’s District; West Bengal, India.” International Journal of Science and Research (IJSR), vol. 12, no. 12, Dec. 2023, pp. 1673–1685.

Kumareswaran, T., et al. “Export Scenario of Indian Agriculture: A Review.” Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, vol. 7, no. 6, 2018, pp. 2733–2736.

Ladejinsky, Wolf. “How Green Is the Indian Green Revolution?” Economic and Political Weekly, vol. 8, no. 52, 29 Dec. 1973, pp. A133–A144.

Lahiri-Dutt, Kuntala, and Gopa Samanta. Dancing with the River: People and Life on the Chars of South Asia. Yale University Press, 2013.

Lahiri-Dutt, Kuntala, and Itishree Pattnaik. “Women-Headed Households in Agriculture: Report from West Bengal, India.” Ecology, Economy and Society – the INSEE Journal, vol. 5, no. 1, Jan. 2022, pp. 223–229.

Li, Tania Murray. Land’s End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier. Duke University Press, 2014.

Lim, Goh Beng. “Production and Marketing Constraints Limiting Smallholder Dairying in Bangladesh.” Asian Journal of Agriculture and Development, vol. 1, no. 1, 2004, pp. 1–18.

Maitra, S., et al. Agriculture and Agroforestry in Sundarban. Chapter 6, Shodhganga Repository, 2000.

Mall, R. K., et al. “Impact of Climate Change on Indian Agriculture: A Review.” Climatic Change, vol. 82, 2007, Springer, pp. 225–251.

Mall, R. K., et al. “Impact of Climate Change on Indian Agriculture: A Review.” Climatic Change, vol. 78, 2007, pp. 445–478.

Mandal, Abhishek, and Subhasis Mandal. “Financial Feasibility and Constraints of Betel Vine Cultivation in Coastal Areas of Sundarbans, West Bengal.” Journal of the Indian Society of Coastal Agricultural Research, vol. 34, no. 1, 2016, pp. 148–155.

Mandal, S., et al. Homestead Production Systems in Sundarbans Region of West Bengal, India: Current Status and Opportunities. Central Soil Salinity Research Institute, 2014.

Mandal, Subhasis, et al. “Agricultural Marketing Efficiency of Major Vegetables Crops in Coastal Districts of West Bengal – Current Status and Way Forward.” Journal of the Indian Society of Coastal Agricultural Research, vol. 29, no. 1, 2011, pp. 93–98.

Mandal, Subhasis, et al. “Crop-Fish Integration through Land Shaping Models for Enhancing Farm Income under Eastern Coastal Region of India.” Agricultural Economics Research Review, vol. 28 (Conf. No.), 2015, pp. 47–54.

Mandal, Subhasis, et al. “Land Shaping Models for Enhancing Agricultural Productivity in Salt Affected Coastal Areas of West Bengal – An Economic Analysis.” Indian Journal of Agricultural Economics, vol. 68, no. 3, July–Sept. 2013, pp. 390–406.

Mishra, Deepak K., and Pradeep Nayak, editors. Land and Livelihoods in Neoliberal India. Palgrave Macmillan, 2020.

Mishra, Dinesh Kumar. “Living with Floods: People’s Perspective.” Economic and Political Weekly, vol. 36, no. 29, 21–27 July 2001, pp. 2756–2761.

Mitra, Asok. District Handbook: 24-Parganas. Government Printing, West Bengal Government Press, Alipore, 1954.

Mueller, Valerie, and Agnes Quisumbing. Short- and Long-Term Effects of the 1998 Bangladesh Flood on Rural Wages. IFPRI Discussion Paper 00956, International Food Policy Research Institute, Mar. 2010.

Mukhopadhyay, Amites. “In Aila-Struck Sundarbans.” Economic and Political Weekly, vol. 46, no. 40, 1–7 Oct. 2011, pp. 21–24.

Mukhopadhyay, Aparajita. “After Cyclone Aila: Politics of Climate Change in Sundarbans.” Title and publication details incomplete (unpublished or partial).

NABARD Consultancy Services (NABCONS). State Agriculture Plan for West Bengal. NABARD West Bengal Regional Office,2009.

NABARD District Profile – South 24 Parganas. National Bank for Agriculture and Rural Development, Presidency Division, West Bengal.

NABARD Potential Linked Credit Plan 2020–21: South 24 Parganas. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), 2020.

NABARD. PLP 2020–21 – South 24 Parganas. National Bank for Agriculture and Rural Development, 2020.

Naha, Alik. "Geostrategic Significance of the Bay of Bengal in India’s Maritime Security Discourse." The Journal of Territorial and Maritime Studies, vol. 9, no. 2, Summer/Fall 2022, pp. 47–64.

NASA Earth Observatory. “Tropical Storm Aila Strikes Southern Bangladesh and Eastern India.” NASA Earth Observatory, 27 May 2009. NASA MODIS Rapid Response Team.

NASA Report on Cyclone Aila. NASA Earth Observatory, Goddard Space Flight Centre, 27 May 2009.

National Statistical Office (NSO). Crop Estimation Survey on Principal Crops: Consolidated Results 2016–17. Ministry of Statistics and Programme Implementation, Govt. of India, 2018

Nayyar, Deepak, and Abhijit Sen. “International Trade and the Agricultural Sector in India.” Economic and Political Weekly, vol. 29, no. 20, 14 May 1994, pp. 1187–1203. JSTOR.

Nayyar, Deepak. “Economic Liberalisation in India: Analytics, Experience and Lessons.” Vipra, vol. 3, no. 1, Jan.–June 2007, pp. 1–20.

Nene, Y. L. Glimpses of the Agricultural Heritage of India. Asian Agri-History Foundation, z-lib.org.

Ohdedar, Birsha. “Law, Colonial-Capitalist Floods, and the Production of Injustices in Eastern India: Insights for Climate Adaptation.” Transnational Environmental Law, vol. 13, no. 2, May 2024, pp. 264–285. Cambridge University Press.

Omvedt, Gail. “Capitalist Agriculture and Rural Classes in India.” Economic and Political Weekly, vol. 16, no. 52, 26 Dec. 1981, pp. A140–A143, A145–A159.

Oskarsson, Patrik. “Adivasi Land Rights and Dispossession.” Landlock: Paralysing Dispute over Minerals on Adivasi Land in India, ANU Press.

Pallewatta, Nirmalie. "Impacts of Climate Change on Coastal Ecosystems in the Indian Ocean Region." Coastal Zones and Climate Change, Stimson Centre, 2010.

Parikh, Kirit, Shikha Jha, and P. V. Srinivasan. “Economic Reforms and Agricultural Policy.” Economic and Political Weekly, vol. 28, no. 29/30, 17–24 July 1993, pp. 1497–1500. JSTOR.

Patel, Ramran. “Landlessness and Inequality: A Case of Irrigated and Non-Irrigated Regions.” Journal of Rural Studies, vol. 9, no. 1, 2021, pp. 62–82. DOI: 10.11726/232077202380.

Patnaik, Utsa, editor. The Agrarian Question in Marx and His Successors. vol. 1, Left Word Books, 2007.

Patnaik, Utsa. "Capitalist Agriculture in India: A Note." Economic and Political Weekly, vol. 6, no. 39, 25 Sept. 1971, pp. A123–A124, A126–A130.

Ponce, Roberto, et al. Climate Change, Water Scarcity in Agriculture and the Economy-Wide Impacts in a CGE Framework. Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), 2016. JSTOR.

Raghbendra Jha, ANU Press, 2021.

Rajeev, Meenakshi, and Sharmistha Deb. “Institutional and Non-Institutional Credit in Agriculture: Case Study of Hugli District of West Bengal.” Economic and Political Weekly, vol. 33, no. 47/48, 21 Nov.–4 Dec. 1998, pp. 2997–3002.

Ram Ranjan, Potal. “Landlessness and Inequality: A Case of Unintended Exclusion and the Dilemma of Irrigated Agriculture.” Journal of Land and Rural Studies, vol. 9, no. 1, 2021, pp. 62–82. SAGE Publications.

Rao, Sihang, Liu Xingshuo, and Sheng Yu. “China’s Agricultural Trade: A Global Comparative Advantage Perspective.” China’s Challenges in Moving towards a High-Income Economy, edited by Ligang Song and Yixiao Zhou, ANU Press, 2021, pp. 37–58.

Rao, Sihang, Liu Xingshuo, and Sheng Yu. “China’s Agricultural Trade: A Global Comparative Advantage Perspective.” China’s Challenges in Moving Towards a High-Income Economy, edited by Ligang Song and Yixiao Zhou, ANU Press, 2021.

Rathod, Balu L., and Jagdish B. Saphkale. "Coastal Agriculture System in Maharashtra." International Journal of Scientific & Engineering Research, vol. 6, no. 9, Sept. 2015, pp. 1556–1558.

Rathod, Balu L., and Jagdish B. Sapkale. “Status of Agriculture in Coastal Villages of Ratnagiri, Maharashtra.” International Journal of Scientific & Engineering Research, vol. 6, no. 9, Sept. 2015, pp. 1556–1562.

Roy, Dayabati. “Disaster, Appropriation, and Displacement in the Indian Sundarbans.” Disasters, vol. 49, no. 2, 2025. ODI Global.

Roy, Debesh. “Agriculture Marketing in India: Perspectives on Reforms and Doubling Farmers’ Income.” Journal of Marketing Development and Competitiveness, vol. 16, no. 3, 2022, pp. 107–117.

Saha, Dipankar. Diversified Agriculture in Sundarbans. ResearchGate, Creative Research Group, May 2015.

Saha, R. R., et al. “Cropping System Intensification under Rice Based System for Increasing Crop Productivity in Salt-Affected Coastal Zones of Bangladesh.” Journal of the Indian Society of Coastal Agricultural Research, vol. 37, no. 2, 2019, pp. 72–81.

Saito, Osamu, et al., editors. Managing Socio-Ecological Production Landscapes and Seascapes for Sustainable Communities in Asia: Mapping and Navigating Stakeholders, Policy and Action. Springer, 2020.

Samanta, Arabinda. “Cyclone Hazards and Community Response in Coastal West Bengal: An Anthropo-Historical Perspective.” Economic and Political Weekly, vol. 32, no. 38, 20–26 Sept. 1997, pp. 2424–2428.

Sarkar, Abhirup. “Development and Displacement: Land Acquisition in West Bengal.” Economic and Political Weekly, vol. 42, no. 16, 21–27 Apr. 2007, pp. 1435–1442.

Sathe, Dhanmanjiri. “Political Economy of Land and Development in India.” Economic and Political Weekly, vol. 46, no. 29, 16–22 July 2011, pp. 151–55.

Scaria, Suma. “Changes in Land Relations: The Political Economy of Land Reforms in a Kerala Village.” Economic and Political Weekly, vol. 45, no. 26/27, 26 June–9 July 2010, pp. 191–98.

Sen, Amartya. Poverty and Famine: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford University Press, 1981.

Sen, Amrita, and Sarmistha Pattanaik. “Community-Based Natural Resource Management in the Sundarbans: Implications of Customary Rights, Law and Practices.” Economic and Political Weekly, vol. 52, no. 29, 22 July 2017, pp. 93–104.

Sen, Amrita. “Exclusionary Conservation in the Sundarbans: Who Pays the Price?” Economic and Political Weekly, vol.. 51, no. 53, 31 Dec. 2016, pp. 25–28.

Shaw, Rajib, and Juha I. Uitto, editors. Sustainable Development and Disaster Risk Reduction. Springer Japan, 2016.

Sheng, Yu, Shan Y., and Huang J. K. Analysing the Determinants Underlying Exports of Major Agricultural Commodities from African Countries to China. CCAP Working Paper & Bill and Melinda Gates Foundation Report, Beijing and Washington, DC, 2020.

Siddiqui, Kalim. “Agricultural Exports, Poverty and Ecological Crisis: Case Study of Central American Countries.” Economic and Political Weekly, vol. 33, no. 39, 26 Sept.–2 Oct. 1998, pp. A128–A136.

Singh, Sukhpal. “New Markets for Smallholders in India: Exclusion, Policy and Mechanisms.” Economic and Political Weekly, vol. 47, no. 52, 29 Dec. 2012, pp. 95–105.

South 24 Parganas Human Development Report 2009. Development and Planning Department, Government of West Bengal, 2009.

Statistical Abstract, West Bengal: 1997–1998. Bureau of Applied Economics and Statistics, Government of West Bengal, 1999.

Statistical Abstract, West Bengal: 2015. Bureau of Applied Economics and Statistics, Government of West Bengal, 2016.

Sundarban Affairs Department, Government of West Bengal. “Sundarban Affair Data.” n.d.

Suri, K. C. “Political Economy of Agrarian Distress.” Economic and Political Weekly, vol. 41, no. 16, 22–28 Apr. 2006, pp. 1523–1529.

Sustainability of Coastal Agriculture under Climate Change. [Author(s) and institution not fully available from preview], likely a scholarly article in Sustainability, vol. 11, no. 7200, 2019.

Swaminathan, M. S. “Science and Shaping Our Agricultural Future.” Twenty K.R. Narayanan Orations: Essays by Eminent Persons on the Rapidly Transforming Indian Economy, edited by Carter, Michael R. “Resource Allocation and Use Under Collective Rights and Labour Management in Peruvian Coastal Agriculture.” The Economic Journal, vol. 94, no. 376, Dec. 1984, pp. 826–846. Oxford University Press.

Tanne, Sirpa, Mahadev Joshiuddin, and Dayabati Roy. “After Cyclone Aila: The Politics of Climate Change in the Sundarbans.” Contemporary South Asia, vol. 31, no. 2, 2023, pp. 222–235. Taylor & Francis Online.

Tharamangalam, Joseph. Agrarian Class Conflict: The Political Mobilization of Agricultural Labourers in Kuttanad, South India. University of British Columbia Press, 1981.

The Nation. “The Rise of Disaster Capitalism.” The Nation, 14 Apr. 2005.

Thorner, Alice. "Semi-Feudalism or Capitalism? Contemporary Debate on Classes and Modes of Production in India." Economic and Political Weekly, vol. 17, no. 49, 4 Dec. 1982, pp. 1961–68.

Tuğal, Cihan. “Fight or acquiesce? Religion and Political Process in Turkey.” Theory and Society, vol. 33, no. 1, 2004, pp. 73–92.

Unni, Jeemol. “Non-Agricultural Employment and Poverty in Rural India: A Review of Evidence.” Economic and Political Weekly, vol. 33, no. 13, 26 Mar.–3 Apr. 1998, pp. A36–A44.

Unspecified Author. Sundarban in a Global Perspective: Long-Term Adaptation and Development. Discussion Paper, 2017.

Upadhya, Carol Boyack. "The Farmer-Capitalists of Coastal Andhra Pradesh." Economic and Political Weekly, vol. 23, no. 27, July 1988, pp. 1376–1382.

Vakulabharanam, Vamsi, et al. “Understanding the Andhra Crop Holiday Movement.” Economic and Political Weekly, vol. 46, no. 50, 10 Dec. 2011, pp. 13–16.

Vyas, V. S. “Our Agrarian Future: A Medium-Term Perspective on Asian Agriculture.” Economic and Political Weekly, vol. 37, no. 50, 14–20 Dec. 2002, pp. 5017–5021, 5023–5032.

Wallerstein, Immanuel. The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. University of California Press, 2011.

Whitehead, Judy. “John Locke and the Governance of India’s Landscape: The Category of Wasteland in Colonial Revenue and Forest Legislation.” Economic and Political Weekly, vol. 45, no. 50, 11 Dec. 2010.

Wilkes, Andreas, and Lanying Zhang. Stepping Stones Towards Sustainable Agriculture in China: An Overview of Challenges, Policies and Responses. International Institute for Environment and Development, 2016.

World Bank. The Influence of Power in Village Institution. South Asia Water Initiative, Jan. 2020.

ঘোষ, অলোককুমার। “দেশান্তরের রাজনীতি: দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি।” *অভিক্ষেপ*, ২০২৪।

চক্রবর্তী, অমিতাভ। বাংলার কৃষক কালে কালোত্তরে। প্রথম প্রকাশ, ২৯ জানুয়ারি ২০১৪।

চন্দ্র, বিপন, মৃদুলা মুখার্জি, ও আদিত্য মুখার্জি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০। অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী, আনন্দ, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০০৬, পঞ্চম মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৭।

তানিগুচি, শিনকিচি, মাসাহিকো তোগাওয়া, ও তেৎসুইয়া নাকাতানি। গ্রামবাংলা: ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতি। ২০০৭।

দত্ত, ভবতোষ, প্রধান সম্পাদক, ও অশোক রুদ্র, সহকারী সম্পাদক। অর্থনীতি গ্রন্থমালা ২: ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি। অশোক রুদ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ মার্চ ১৯৮৫, ষষ্ঠ মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল। ভূমি ও ভূমিসংস্কার: সেকাল একাল। দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭।

বর্ধন, প্রণব। বাংলার জমি ও বাংলার কৃষক। ভূমিকা ও কথোপকথন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ। ২০১৬।

ভট্টাচার্য, স্বাতী, ও অশোক সরকার। ফসলের রাজনীতি: বাংলার চাষির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অনুষ্টুপ, ডিসেম্বর ২০২১।

রায়, অরবিন্দ, অনুবাদক। অমর্ত্য সেন: উন্নয়ন, উন্নয়ন স্ব-ক্ষমতা। প্রথম আনন্দ, জুন ২০০৪।

শূর, চিরঞ্জীব, সংকলক। মিশেল ফুকো। আলোচনা চক্র, প্রথম সংস্করণ অগাস্ট ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৭।

সান্যাল, কল্যাণ। সাত সতেরো: প্রবন্ধ সংকলন। অনুষ্টুপ।

হোসেন, পারভেজ। মিশেল ফুকো: পাঠ ও বিবেচনা। প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

“অপারেশন বর্গা যে ক্ষতি করেছে।” আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ জুন ২০১৪, https://www.anandabazar.com/editorial/%E0%A6%85%E0%A6%AA-%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%97-%E0%A6%AF-%E0%A6%95-%E0%A6%B7%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%9B-1.45451.

Basu, J. "Aila Prompts Exodus." Down to Earth, 15 July 2009, https://www.downtoearth.org.in/environment/aila-prompts-exodus-3572.

Express News Service. "Central Task Force to Assess Aila Damage." The Indian Express, 16 June 2009.

Jalais, Annu, and Amites Mukhopadhyay. "Of Pandemics and Storms in the Sundarbans." American Ethnologist, https://americanethnologist.org/online-content/collections/intersecting-crises/of-pandemics-and-storms-in-the-sundarbans/.

পরিশিষ্ট

২০০৯ সালে আইলার পর রায়তি জমির ওপরে গড়ে ওঠা চর। গোবিন্দপুর পাথরপ্রতিমা ব্লক।

ইয়াস ঝড়ে ভাঙা নদী বাঁধ। সাগর ব্লক কচুবেড়িয়া মৌজা ২০২১ সাল ২১ মে চিত্রটি সংগ্রহ করা হয়েছে সৌমেন ঘোষের কাছ থেকে।

ইয়াস ঝড়ে ভাঙা নদী বাঁধ। গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় বাঁধ মেরামত করার চিত্র। সাগররুক কচু বেড়িয়া মৌজা ২০২১ সাল ২১ মে

আম্ফান ঝড়ে বন্যা কবলিত মানুষ। পাথরপ্রতিমা ব্লক সখের বাজার মৌজা। ২০২০ সাল ২১ মে।

ইয়াস ঝড়ের বন্যা কবলিত মানুষ -এর চিত্র ২০২১ সাল ২০ মে পাথারপ্রতিমা ব্লক গোবর্ধন পুর মৌজা।

আম্ফান ঝড়ে বন্যা চিত্র। পাথরপ্রতিমা ব্লক দক্ষিণ ব্রজবল্লভ পুর। ২০২০ সাল ২২ মে। এই চিত্রটি স্থানীয় বাসিন্দা সুশান্ত ঘড়ই এর কাছ থেকে থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে

আম্ফান ঝড়ে বন্যা কবলিত পরিবার। পাথরপ্রতিমা রামগঙ্গা মৌজা। ২০২০ সাল ২১ মে।

ইয়াশ ঝড়ে প্লাবিত গ্রাম। পাথরপ্রতিমা ব্লক, বনশ্যামনগর ২০২১ সাল ২৪ মে।